এশিয়ার বন্ধন-মুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

স্বনামধন্য মননশীল সাহিত্যিক

ও

আদর্শনিষ্ঠ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অন্তিম দশা দেখা দিয়াছে এবং পৃথিবীতে নূতন নূতন বহু স্বাধীন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তিলাভ বর্তমান শতকের ইতিহাসে সোভিয়েট বিপ্লবের মতই যুগান্তকারী ঘটনা। ইচ্ছা ছিল, এই সমস্ত ঘটনা ও আন্তর্জাতিক জগৎ সম্পর্কে পর পর কয়েকটি গ্রন্থে আলোচনা করিব।

এই পরিকল্পনারই প্রথম গ্রন্থ ছিল 'এশিয়ার বন্ধনমুক্তি'।
এই পুস্তক প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল। শেষ বিভ্রাট ঘটিল চীন-ভারত যুদ্ধ এবং 'যুগান্তরে'র সঙ্গে আমার মর্মান্তিক সম্পর্কচ্ছেদের জন্য। এই সমস্ত অভাবনীয় ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফলে, এই পুস্তক প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল।

এশিয়া মহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কেবল এই শতকের যুগান্তকারী ঘটনা নয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক কাহিনীও বটে। এই পুস্তকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘটিল এবং কিভাবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি পাইল, তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পতনের উপর ভিত্তি করিয়াই এই পুস্তক লেখা। অর্থাৎ এশিয়ার নূতন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, এবং একটি মাত্র নাতিদীর্ঘ পুস্তকে তাহা সম্ভবও নহে। তবে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কি ভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই আলোচনা করা হইয়াছে। মোটামুটি স্বাধীন এশিয়ার সংঘাত ও সমস্যার একটি সামগ্রিক রেখাচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু এই পুস্তকে 'এশিয়া' বলিতে আমরা দৈনন্দিন সংবাদপত্রে প্রচলিত যে রাজনৈতিক এশিয়া এবং এশিয়ার যে মানসচিত্র তৈয়ার হইয়াছে প্রধানতঃ বৃটেন ও পরে আমেরিকার জন্য, সেই এশিয়ার বন্ধনমুক্তি লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ চীন, জাপান, পূর্ব-এশিয়া, দক্ষিণ-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—প্রধানতঃ এই সুবৃহৎ রাজনৈতিক অঞ্চলই আমাদের নিকট এশিয়া রূপে পরিচিত। কিন্তু ভূগোলের হিসাবে এশিয়া মহাদেশ বলিতে

সোভিয়েট-সাইবেরিয়া, আন্তর্মঙ্গোলিয়া ও বহির্মঙ্গোলিয়া, মধ্য-এশিয়া এবং পশ্চিম-এশিয়া বা মধ্য-প্রাচ্য বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনমুক্ত এশিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক এশিয়া মহাদেশের এই সমস্ত অংশ ধরা হয় নাই।

এশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের পতন সম্পর্কে নানা উপলক্ষে আমার কিছু কিছু প্রবন্ধ ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত এবং প্রয়োজন বোধে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাকে সেই সময়কার অবস্থা অনুসারেই বিচার করিতে হইবে ; আজিকার পরিবর্তিত অবস্থায় নহে।

বিশেষভাবে চীন-ভারত সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। সুতরাং সেই সময়কার অবস্থা ও ঘটনাবলী সেই সময়ের আলোকেই বিচার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে চীন-ভারত বিরোধ ঘটিল এবং শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ যুদ্ধে পরিণত হইল। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের জন্য আজ যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেই অবস্থার মাপকাঠিতে পুস্তকে বর্ণিত সমগ্র চীন-ভারত সম্পর্ককে বিচার করিলে ভুল করা হইবে। কারণ, আগেকার ইতিহাস আগেকার সম্পর্ক ও ধারণা হইতে বিচার করা হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরম্পর্য রক্ষার জন্য এই সম্পর্কের উঠানামা আলোচনা করা হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, এই আকস্মিক চীন-ভারত যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ফলে, এই বইয়ের পরিকল্পনার মধ্যে চীন-ভারত যুদ্ধের কোন স্থান ছিল না। কারণ, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের গ্রাস হইতে এশিয়ার মুক্তি-লাভই ছিল এই পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সুতরাং চীন-ভারত যুদ্ধের জন্য এই পুস্তকের মূল সুর কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এজন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'এশিয়ার ভবিষ্যৎ' নামক অধ্যায়টি এই পুস্তকের গোড়াকার পরিকল্পনায় শেষ অধ্যায় রূপে বিবেচিত ছিল। এবং উহা ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চীন অকস্মাৎ ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া বসে। এবং এশিয়ার চলমান ইতিহাসের পক্ষে এই আক্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়াকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা যায় না। ফলে,পুস্তকের আসল পরিকল্পনার বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও চীন-ভারত সংঘাত লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ এখনও অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত বলিয়া কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় নাই।

এশিয়ার সমসাময়িক এবং চলমান ইতিহাস লইয়া এই পুস্তক লেখা হইয়াছে। অতএব সমসাময়িক ঘটনাবলীর গতি ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য অধিকাংশ প্রবন্ধের শেষেই রচনার তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদিও নানা অবস্থা বৈগুণ্যের মধ্যে এই পুস্তক রচিত, তথাপি আশা করি বর্তমান স্বাধীন এশিয়ার রাজনৈতিক রেখাচিত্র উপলব্ধি করিতে এই পুস্তক সচেতন বাঙ্গালী পাঠককে অন্ততঃ কিছুটা সাহায্য করিবে। বন্ধুবর এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু তাগিদ না দিলে এই পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত কিনা, সন্দেহ। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা	সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা	১
প্রথম অধ্যায়	বন্ধনমুক্তির রূপরেখা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	২৯
তৃতীয় অধ্যায়	পূর্ব এশিয়ার সংঘাত	৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	চীন-ভারত সম্পর্ক	৮৫
পঞ্চম অধ্যায়	পাকিস্থান, নেপাল ও ভারত	১৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	এশিয়ার ভবিষ্যৎ	১৫৯
উপসংহার	ইতিহাসের ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণ	১৮২

প্রস্তাবনা ঃ সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা

বিংশ শতকের মধ্যভাগে পৃথিবীর বুক হইতে যেন দুঃস্বপ্নের কালো রাত্রি শেষ হইয়া গেল এবং দুর্গত মানুষ নতুন উষার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইল। কারণ, এই সময়ের (১৯৪৫-১৯৬০) মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পতন ঘটিল এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিবে, এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মার্ক্সীয় মতে ধনতন্ত্রবাদের চরম বিকাশ হইতেই সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও প্রসার। পৃথিবীব্যাপী বাজার দখল, অবাধ বাণিজ্য এবং পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদের প্রসার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকেও যেন আদিগন্ত ছড়াইয়া দিয়াছিল। এই সাম্রাজ্যবাদের সেরা শক্তি ছিল বৃটেন, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল ভারতবর্ষ। সুতরাং ১৯৪৭ সালে বৃটিশ রাজমুকুট হইতে সেই মধ্যমণি খসিয়া পড়ায় কেবল ভারত-সম্রাটের গরিমাই ম্লান হইয়া গেল না, এশিয়ার সর্ব্বত্র ঔপনিবেশিক কণ্ঠহার ছিন্ন হইয়া গেল এবং রাজনৈতিক পৃথিবী এক নতুন চেহারা নিয়া দেখা দিল।

যদি বিংশ শতকের রাজনৈতিক পৃথিবীর পুরাতন ও নতুন মানচিত্র আঁকা যাইত, তবে, সম্ভবত এক বিচিত্র দৃশ্যের আমরা সম্মুখীন হইতাম। কারণ, ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কিম্বা সোজা কথায় প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিপুঞ্জ এই পৃথিবীর দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, এমন কি জলাশয়গুলি পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে, তখন ইহাদের প্রত্যেকে অতি বৃহৎ ভূমি গ্রাসের দ্বারা অতি-স্ফীতোদর অজগরের রূপ ধারণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষের অধ্যুষিত এই বৃহৎ বসুন্ধরা মুষ্টিমেয় পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের যেন হাতের মুঠায় চলিয়া গেল। ফলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি ঘটিল। ১৯১৪ সালের ভৌগোলিক চিত্রে দেখা যায় যে, বৃটেনের স্বদেশ বা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিমাণ বা আয়তন বাড়িয়া গেল ১১২ গুণ। এভাবে ফ্রান্সের স্বদেশ অপেক্ষা বৈদেশিক অধিকার বা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বাড়িয়া গেল ২১ গুণ। অপর সকলের পিছনে বা বিলম্বে আসিয়াও জার্ম্মানীর বৈদেশিক জমিদারি বাড়িয়া গেল প্রায় ৬ গুণ। আর ইহাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তি, যেমন—বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, স্পেন, ইতালী,

পর্তুগাল এবং ডেনমার্ক, ইহারাও তাদের নিজেদের দেশের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ভূমি দখল করিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ইহাদের প্রত্যেকে নিজেদের স্বদেশ অপেক্ষা ৮ গুণ বৃহৎ সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইল

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে বা ১৯১৪ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ গোটা পৃথিবীর মোট ভূমিগত আয়তনের অর্দ্ধেকেরও অনেক বেশী কিম্বা শতকরা ৫৬ ভাগ দখল করিয়া লইল এবং সারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী, কিম্বা শতকরা ৩৪.৩ ভাগ নিজেদের আয়ত্তে আনিল। অর্থাৎ পৃথিবীর ৫৬ কোটি ৮৭ লক্ষ মানুষ ১৯১৪ সালের মধ্যে পাশ্চাত্য শক্তি গোষ্ঠির হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিতে বাধ্য হইল। সেদিনের পৃথিবীতে ৬টি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যেমন—বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জারের রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান—মাত্র এই কয়টিতে মিলিয়া পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক (কিম্বা ৪৮.৫ ভাগ) গ্রাস করিয়াছিল। সুতরাং পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতেছেন এই সাম্রাজ্যবাদী রাহুর গ্রাস কত ভয়ঙ্কর ছিল। সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনশীল ডোমিনিয়নগুলি,—যেমন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও 'ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা' সমস্তই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইংলণ্ডের কাছে বাঁধা ছিল। আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, সাম্রাজ্যবাদী এই প্রভাব কেবল বৃটেনের কলোনী ও ডোমিনিয়নগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, কাগজেপত্রে যে সমস্ত দেশ বাহ্যতঃ স্বাধীন ছিল, যেমন—পারস্য, চীন ও তুরস্ক ইত্যাদি সেগুলিও ছোটবড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এগুলিকে অর্দ্ধ-উপনিবেশ বলিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না।*

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের প্রথম পর্য্যায় হইল উপনিবেশ বিস্তারের যুগ। এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এবং বৃটিশ ধনপতিগণ কর্ত্তৃক স্বদেশের কৃষকদের শোষণের ফলেই সাম্রাজ্যবাদের এই প্রাথমিক সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই ক্রমবিকাশ সম্পর্কে 'আন্তর্জাতিক' মাসিক পত্রের (পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের মুখপত্র) ১৯৬২, জুলাই মাসের সংখ্যায় যে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হইয়াছে, তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যাইতেছে :

"মার্কস্ বলছেন,

আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের মূলোচ্ছেদ করে তাদের দাসে পরিণত করে খনিতে আটকান, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বিজয়

*International Affairs, Mascow, No. 5, 1962, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।

ও লুণ্ঠন সুরু, আফ্রিকাকে কৃষ্ণকায় শিকারের চারণ ভূমিতে পরিণত করার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অরুণোদয় সূচিত হয়।...

উষ্ণ গৃহের মত উপনিবেশবাদ ব্যবসা ও বাণিজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে পরিপক্কতা দান করেছে। নগ্ন লুণ্ঠন, বশীকরণ এবং হত্যার দ্বারা ইউরোপের বাহিরে আহৃত সম্পদ মাতৃভূমিতে আনীত হয়েছে এবং মূলধনে পরিণত হয়েছে।' (Capital I, Ch. XXXI)

দ্বিতীয় পর্য্যায় হল শিল্পগত মূলধনের আত্মপ্রকাশের যুগ। উনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। সপ্তম দশক পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্বের স্থিতি। এ পর্বে পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যমণি বৃটেন। বহির্বিশ্বে কাঁচামাল খরিদ করে স্বদেশে এনে, স্বদেশীয় মূলধন ও শ্রমে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে আবার বাইরে বাঁধা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন।"

এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উপনিবেশবাদের আবার দ্বিমুখী বিকাশ ঘটিল। একদিকে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ হইতে আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ এবং সেখানে বৃটিশদের বসতি স্থাপন ও সহযোগী শিল্পকেন্দ্র হিসাবে তাদের নূতন অত্মপ্রকাশ। অপরদিকে ভারত, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকান উপনিবেশগুলিতে, যেখানে বৃটিশরা মুখ্যতঃ বিদেশী শাসক হিসাবেই রহিয়া গেল, খাজনা আদায় ও লুণ্ঠনের পুরাতন পদ্ধতি চালু রহিল। তথাপি এক নতুন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। তাদের প্রধান কাজ হইল বৃটেনের কল-কারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং তার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করা অর্থাৎ উপনিবেশগুলির নিজস্ব শিল্প নষ্ট হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের চেহারাটি মার্কস্ অতি সুন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন :

"ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের দুটি পর্ব। একটি ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টি তার পরবর্ত্তী কাল। প্রথম পর্বে ভারতে কোম্পানীর ধ্বংস-কারী ভূমিকার চেহারা প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন ও বিলাতে অর্থ প্রেরণ। দুই, ইতিপূর্বে দেশীয় শাসন ব্যবস্থায় যে সরকারী তত্ত্বাবধানে সেচ ও উন্নয়ন কাজ হত, তার অবহেলা। তিন, বিলাতী ভূমিসম্পর্ক এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি প্রবর্ত্তন। চার, ইউরোপে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানীর উপর প্রত্যক্ষ নিষেধ ও ভারী শুল্ক চাপান।

ভারতীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত বিপর্য্যয় অবশ্য হল ১৮১৩ সালে, যখন বিলাতী

শিল্পদ্রব্যের 'আক্রমণ' ঘটল। ফলে ১৭৮০ সালে ও ১৮৫০ সালের মধ্যে ভারতে বৃটিশ রপ্তানী বেড়েছে ৩,৮৬, ১৫২ পাউণ্ড হতে ৮০,২৪০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ সমগ্র বৃটিশ রপ্তানীর ৩২ ভাগের এক ভাগ থেকে এক অষ্টমাংশ। ১৮৫০ সালে ভারতের বাজারে বিলাতে প্রস্তুত বস্ত্রের এক চতুর্থাংশ বিক্রয় হত। সেই উৎপাদনে বৃটেনের এক অষ্টমাংশ লোক নিযুক্ত ছিল ও বৃটেনের জাতীয় আয়ের এক দ্বাদশাংশ এ থেকে উপার্জিত হত।

মার্ক্স্' এর মতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয় ১৭০২ সালে। তারপর—ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার—সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর সঙ্গে পার্লামেণ্ট ও বৃটেনের জাতীয় পুঁজিপতিদের সংঘর্ষ বাধে। স্মরণ রাখা দরকার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালিকানার চরিত্র মুখ্যতঃ বেনিয়া, শিল্পগত নয়। কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্ট হস্তক্ষেপ করতে চায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য :

প্রথম, ভারতীয় তুলা ও সিল্ক বস্ত্রের আমদানীর ফলে ক্ষুদ্র বৃটিশ উৎপাদকরা ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের লেন-দেনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার লোপ করা। ১৮১৩ সালে কোম্পানীগুলি চীন ব্যতীত ভারতে বাণিজ্যের সর্ত্তাধীন অধিকার পেল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সব সর্ত্ত উঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর পক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল বাণিজ্যিক অধিকার লোপ পেল এবং ভারতের মাটিতে সাধারণ নাগরিকের প্রবেশ রোধ করার ক্ষমতাও তার নষ্ট হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কোম্পানীর বাণিজ্যের বিরাট চারিত্রিক পরিবর্তন হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বৃটেনের লাভের প্রধান মাধ্যম ছিল বাণিজ্যিক মুনাফা নয়, প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন ও শোষণ। ১৮১৩ সালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল তিনগুণেরও বেশী। এ ছাড়া ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত ভারত প্রধানতঃ রপ্তানীকারক দেশ ছিল। এবার ভারত একটি আমদানীকারক দেশে পরিণত হল।

ভারতে বিলাতী পুঁজিবাদী শাসনের অনিবার্য্য নিয়মে ধীর গতিতে বৃটিশ পুঁজির নিয়োগ শুরু হল। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তার পথে প্রধান বাধা হওয়ায় বৃটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে পড়ে। তারা দাবী করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল ক্ষমতার অবসান। ১৮৫৩ সালে পার্লামেণ্টের শাসনে তাই প্রশ্ন ওঠে কোম্পানীকে টিকিয়ে রাখা বা না রাখার।

১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলে ভারতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের নতুন চেহারা দেখা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপরোক্ত চেহারা সত্বেও এ কথা সত্য যে, উপনিবেশগুলি শোষণের ব্যাপারে বুর্জোয়ারা একতাবদ্ধ ও কুণ্ঠাহীন। ভারতের তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়ে এ দেশের বস্ত্র উৎপাদনকে পঙ্গু করে দেওয়ার কাহিনী সুবিদিত। চীনে আফিং বিক্রয়ের 'পবিত্র' বাণিজ্যিক অধিকারের দাবীতে বৃটেন ১৮৪০ সালে চীন আক্রমণ করে এবং পরাস্ত চীন হংকংকে বৃটেনের 'বৈধ' উপনিবেশ হিসাবে বৃটেনের হাতে তুলে দেয়। ১৮৩৯এ এডেন, ১৮৪০এ নিউজিল্যাণ্ড, ১৮৪৩এ নেটাল ও সিন্ধুদেশ, ১৮৪৫ ও ১৮৪৮ এর যুদ্ধে পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালে ব্রহ্মদেশ জয় করে ইংরেজ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হয়।

তবু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অনিবার্য নিয়মেই পশ্চাৎপদ বিজিত দেশগুলিরও ধীর এবং বিলম্বিত পুঁজিবাদী বিকাশ হয়। উদাহরণ স্বরূপ মার্কস্ রেলপথের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্যই তুলা এবং কৃষিজ দ্রব্য ক্রয়ের জন্যই রেলপথের প্রসার হয়েছিল ভারতে। কিন্তু তার ফলে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী এবং লৌহ ও কয়লার উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। ফলে যন্ত্রপাতির বিকাশ ঘটেছে।

ফলতঃ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভরতে উপনিবেশবাদের বিস্তার ব্যাখ্যায় মার্কস্ তিনটি সূত্র দিয়াছেন। প্রথম, ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসকারী ভূমিকা ও প্রচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার অবিলুপ্তি। কৃসি ও কুটিরশিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামগুলির বিপর্য্যয়। দ্বিতীয়, নবপর্য্যায়ে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির যুগে নতুন সমাজের পত্তন। তৃতীয়, ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক রূপান্তর ও নতুন সমাজের জন্ম।......"

পুঁজিবাদের আধুনিক ও চূড়ান্ত পর্বটির শুরু উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে।

"উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে বৃটেন প্রথমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও পরে জার্মানীর কাছে তার শিল্পগত প্রাধান্য হারায়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৃটেনের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন, আমেরিকার ১২ লক্ষ ও জার্মানীর ৭ লক্ষ টন। ১৯০০ সালের ভিতর মার্কিণ ইস্পাতের পরিমাণ ১ কোটি ২ লক্ষ টনে ও জার্মান ইস্পাতের পরিমাণ ৬৪ লক্ষ টনে পৌছায়। ১৯১৩ সালে মার্কিণ ইস্পাত উৎপন্ন হয় ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টন, জার্মান ইস্পাত ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টন এবং ব্রিটিশ ইস্পাত ৭৭ লক্ষ টন।

"তবুও ব্রিটেন শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

১৮৮০-৮৪ সাল থেকে ১৯০০-০৪ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ শিল্পদ্রব্য রপ্তানী বৃদ্ধি পায় ৮% জার্মান ৪০% ও মার্কিণ ২৩০%।

"কিন্তু মূলধন রপ্তানী ও উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে বৃটেন প্রথম যাচ্ছিল।"

"১৮৮৪ ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৃটেন নতুন ৩৭ লক্ষ বর্গমাইল অঞ্চল উপনিবেশে পরিণত করে। ১৯১৫ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন দাঁড়াল ১ কোটি ২৭ লক্ষ বর্গমাইল যার ভিতর খাস বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের আয়তন মাত্র ১ লক্ষ ২১ হাজার বর্গমাইল বা মোট সাম্রাজ্যের এক শতাংশেরও কম। স্বায়ত্ত-শাসিত ডোমিনিয়নগুলি ছিল ৭০ লক্ষ বর্গমাইল। উপনিবেশ ও রক্ষিত রাজ্য-গুলি ৫৬ লক্ষ বর্গমাইল, অর্থাৎ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ৪৬ গুণ। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধিকাংশই দখল হয়েছে ১৮৮৪ সালের পরে।...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষিত ও নির্ভরশীল রাজ্যগুলিসহ পৃথিবীর একচতুর্থাংশ ভূমি ও মানুষকে গ্রাস করে।

"১৮৫০ সাল থেকে ১৮৮০ সালের ভিতর বর্হিদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ মূলধন পাঁচগুণ বেড়ে যায় (কুড়ি কোটি হতে একশত কোটি পাউণ্ড)। ১৯০৫' এর ভিতর দ্বিগুণ বেড়ে তা হয় তুইশত কোটি পাউণ্ড। ১৯১৩'র ভিতর তা আবার দ্বিগুণ বেড়ে চারশত কোটিতে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের শেষে, ১৮৯৯ সালে Sir Robert Giffen বহির্বাণিজ্যের মুনাফার পরিমাপ করেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং বিদেশে লগ্নী হতে মোট আয়ের পরিমাপ করেন ৯ কোটি পাউণ্ড। ১৯১২'র ভিতর বিদেশে লগ্নী হতে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯২৯'এর ভিতর ২৫ কোটি পাউণ্ড।" (R. P. Dutt—The crisis of Britain and the British empire, পৃঃ ৫২—৫৩)

লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাম্রাজ্যবাদ'এ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের এই কলাকৌশল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। ধনতন্ত্রের তুইটি পর্যায় ভাগ করে তিনি বলেন, "প্রচীন ধনতন্ত্রের যুগে, যখন মুক্ত প্রতিযোগিতা চালু ছিল, তখন তার বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রব্য রপ্তানী। ধনতন্ত্রের শেষ যুগে যখন একচেটিয়া পুঁজি শাসন করে, তার বৈশিষ্ট্য হলো, মূলধন রপ্তানী।"

প্রথম মহাযুদ্ধের ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীয় শোষণের ব্যাপকতা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতেঃ

"১৯৫০ সালে Bank of England'এর সার্ভে অনুসারে ১৯৩৮ সালে বহির্দেশে বৃটিশ লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

বিদেশে সামগ্রিক বৃটিশ লগ্নী—১৯৬ কোটি পাউণ্ড, উপনিবেশ ও

ডোমিনিয়নগুলিতে লগ্নী ১১১'১ কোটি পাউণ্ড ও সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশ-গুলিতে লগ্নী ৮৪'৯ কোটি পাউণ্ড।

১৯২৯ সালের ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ পার্লামেণ্টে বাজেট বক্তৃতায় স্যার উইনষ্টোন চার্চ্চিল বলেন, "প্রতি বছর বিদেশে সামরিক ও বেসামরিক বৃটিশ কর্মচারীদের চাকুরী থেকে আমাদের আয় হয় ৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ড; এছাড়া বিদেশে লগ্নী থেকে আমাদের বাঁধা আয় বাৎসরিক প্রায় ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।"*

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষ ও এশিয়া মহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ও গভীরতা কত দূর ছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রও অনেক ছিল যাদের কোন উপনিবেশ ছিল না। এই ধরণের রাষ্ট্রগোষ্ঠী অবার দুই প্রকারের ছিল। প্রথমতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু কার্য্যতঃ বৈদেশিক অর্থ-নীতি ও রাজনীতির একান্ত প্রভাবাধীন, যেমন—আফগানিস্থান, নেপাল, শ্যাম ইত্যাদি কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মোট আয়তন ছিল ২২'৯ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার কিম্বা পৃথিবীর ভূমিভাগের শতকরা ১৭'১ ভাগ, ইহাদের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ কিম্বা সেদিনের পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭'১ ভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির কোন উপনিবেশ নাই। তারা স্বাধীন ও ধনতন্ত্রবাদী, যেমন—সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে পৃথিবীর যে চেহারা দেওয়া গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তার কিছু পরিবর্ত্তিত রূপ পাওয়া যাইবে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯১৪ সালে পৃথিবীতে কোন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯৩৮ সালের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ান পিপল্‌স্ রিপাব্লিক সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পৃথিবীর আয়তনের শতকরা ১৭'৩ ভাগ দখল করিল এবং পরাজিত জার্মানী ও প্রাক্তন জারের রাশিয়া উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যচ্যুত হইল। সেই সময় পরাধীন রাজ্যের সংখ্যা কিছু কমিল বটে, কিন্তু তথাপি পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশই ছিল ঔপনিবেশিক জমিদারি।

কিন্তু ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং উহার গতিপথে ১৯৬১ সাল

---

* এই উদ্ধৃত অংশের লেখক হইতেছেন শ্রীশিবাণী কিঙ্কর চৌবে। তাঁর কাছে বর্ত্তমান গ্রন্থকার ঋণী রহিল।

পর্য্যন্ত ১৫০ কোটি মানুষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল, যার মধ্যে ৭০ কোটি মানুষ সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকে গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৬১ সালের পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ২৫.৯ ভাগ বা এক-চতুর্থাংশ এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কিম্বা শতকরা ৩৫.৫ ভাগ মানুষ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্গত হইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীতে যে সমস্ত উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ আছে, সেগুলির মোট আয়তন শতকরা ৭.৯ ভাগ এবং পরাধীন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা ২.২ ভাগ মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অন্ততঃ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পতন ঘটিয়াছে এবং ইহার ঐতিহাসিক প্রারম্ভ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও এশিয়ার বন্ধনমুক্তি হইতে। পরবর্ত্তী আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবনা বা সাম্রাজ্য বাদের রূপরেখা স্মরণে রাখা বাঞ্ছনীয়।*

---

* বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম ছিল বলিয়া এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আজও বৃটিশ উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্যগুলির সংখ্যা একেবারে নগণ্য নহে। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদত্ত হিসাবে কমনওয়েলথ মন্ত্রী-দপ্তর কর্ত্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, কমনওয়েলথের স্বাধীন জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যা ৭০ কোটি। কিন্তু আফ্রিকায়, দূরপ্রাচ্যে, ক্যারিবীয়ান্ সমুদ্রে, ভূমধ্য সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরে, অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এবং ভারত মহাসাগরে এখনও যে সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশ, দ্বীপপুঞ্জ ও আশ্রিত রাজ্য রহিয়াছে, তার মোট সংখ্যা ৪৩ এবং মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। —লেখক।

প্রথম অধ্যায়

বন্ধনমুক্তির রূপরেখা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিংশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মুক্তিলাভ। অর্থাৎ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান এবং এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা অর্জ্জন। এশিয়া মহাদেশের এই স্বাধীনতার সঙ্গে অধুনাতম 'অন্ধকার আফ্রিকার' রাজনৈতিক চৈতন্য ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনও এই শতাব্দীর অন্যতম এবং কাহারও কাহারও মতে বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা। কারণ, আফ্রিকা মহাদেশের বাকী সমস্ত কৃষ্ণকায় জাতিগোষ্ঠি যখন পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে এবং সেই সঙ্গে মার্কিণ অর্থনীতির কবলমুক্ত দক্ষিণ আমেরিকা যখন পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় হাত বাড়াইয়া দিবে, তখন কার্যতঃ গোটা দুনিয়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার চরম মৃত্যু ঘটিবে কিম্বা সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইবে। কিন্তু তার পথে আজও অনেক বাধা আছে এবং আশা করা যায় এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সেই সমস্ত বিঘ্ন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে এবং নতুন রাজনৈতিক পৃথিবী সম্পূর্ণতর রূপ লইয়া দেখা দিবে।

বর্ত্তমান ১৯৬২ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা যদি ৩০০ কোটি হইয়া থাকে, তবে, উহার অর্দ্ধেকেরও বেশী অর্থাৎ ১৬০ কোটি মানুষ এশিয়া মহাদেশে বাস করে। এই বিরাটসংখ্যক মানুষের পরাধীনতা ও বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই ইতিহাসের এক গভীর এবং তাৎপর্য্যব্যঞ্জক ঘটনা। কেননা, সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রাচীন এশিয়া মহাদেশের নতুন মুক্তির সঙ্গে জড়িত। বলা বাহুল্য যে, এই মুক্তি সুরু হইয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতম ধাক্কায়—১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে (১৫ই) ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের নবজন্ম লাভের সঙ্গে ইহার সুরু। তারপর ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর মহাচীন (যার লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়—৬৪ কোটি) নতুন মুক্তির মধ্যে নব কলেবর ধারণ করে। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ইন্দোনেশীয়া

(লোকসংখ্যা ৯ কোটি) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করে—এক মাত্র পশ্চিম ইরিয়ানের ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে। অপরদিকে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহল দ্বীপ (প্রাচীন লঙ্কা) বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তরূপে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় বিভিন্ন শক্তির মধ্যে আপোষ আলোচনার ফলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ইন্দোচীনের সাড়ে সাত বছর ব্যাপী রক্তাক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটে এবং যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে ভিয়েৎনাম বিভক্ত হইয়া যায় এবং কার্যতঃ ইন্দোচীনে চারিটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে—উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস এবং কাম্বোডিয়া। (অবশ্য লাওস লইয়া কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী সংঘাত চলিয়াছিল—১৯৬২ জুন পর্যন্ত।)

এই প্রসঙ্গে ফিলিপাইন এবং জাপানের কথাও উল্লেখ করিতে হইবে এশীয় রাষ্ট্র হিসাবে এবং পাঠকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো একথা জানিয়া বিস্ময়বোধ করিবেন যে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়াতে ভারতবর্ষই প্রথম বৃটিশ ঔপনিবেশিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, তথাপি তারও আগে প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কবল হইতে ত্রাণ লাভ করে ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৬ সালে। ১৯৩৪ সালে আমেরিকা ফিলিপাইনকে স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, ১২ বছর পর তাহা বাস্তবে রূপধারণ করে—আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখনও ফিলিপাইনে প্রচুর। অবশ্য এশিয়া মহাদেশে একমাত্র জাপানই ছিল সত্যকার সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে প্রাচীন রাজবংশ এখনও রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগষ্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে (৬ই এবং ৯ই আগষ্ট) এটম বোমার প্রলয়ঙ্কর আঘাতে জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল এবং তারপর মার্কিণ জেনারেল ম্যাক-আর্থারের শাসন চলিয়াছিল দীর্ঘকাল। ১৯৫১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর স্যানফ্রান্সিস্কোতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতির সঙ্গে শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরের দ্বারা জাপান পুনরায় সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা অর্জ্জন করে—যদিও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সেই স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ সর্তকণ্টকিত রহিয়াছে। এশিয়া মহাদেশে সর্ব্বশেষ যে দেশটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তার নাম মালয় উপদ্বীপ। বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যরূপে মালয় ফেডারেশন স্বাধীনতা অর্জ্জন করে ১৯৫৭ সালের ৩১শে আগষ্ট। আমাদের হিমালয় প্রতিবেশী নেপাল যদিও বরাবরই কাগজেকলমে স্বাধীন রাষ্ট্র

ছিল (অবশ্য বৃটিশ ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায়) তথাপি নেপালের রাজা রাণাদের (যাঁরা বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রী হইতেন) একচ্ছত্র শাসন হইতে একশত বছর পর ত্রাণলাভ করেন ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাপক প্রজা বিদ্রোহের ফলে। তখন হইতে স্বাধীন নেপাল নবরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। নেপালের পার্শ্ববর্ত্তী তিব্বত যুগযুগান্তর ধরিয়া লামাদের শাসিত (প্রধান—দলাই লামা) স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু লামা-শাসনের এই স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইল ১৯৫১ সালের ২৩শে মে চীনা 'মুক্তি ফৌজের' সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা। কিন্তু ১৯৫৯ সালে লামা এবং খাম্পা উপজাতীয় লোকেরা বিদ্রোহ করায় পিকিং গবর্ণমেণ্ট তিব্বতকে পুরাপুরি দখল করিয়া লয়। এক্ষণে উহা মহাচীনের 'তিব্বতী অঞ্চল' নামে পরিচিত। এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে কোরিয়া উপদ্বীপটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে উত্তরে ও দক্ষিণে সোভিয়েট এবং মার্কিণ প্রভাবিত অঞ্চলরূপে বিভক্ত ছিল। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন মার্কিণ প্রভাবিত গোষ্ঠির প্ররোচনায় দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুলাই—ভারতবর্ষ কর্তৃক যুদ্ধবন্দী বিনিময় ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি সংক্রান্ত আপোষ প্রস্তাবের ফলে। অবশ্য চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এখনও কোন মিলন ঘটে নাই।......

পশ্চিম এশিয়া কিংবা ইংরাজীতে যাহাকে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়, ভৌগোলিক দিক হইতে তাহাও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই বিরাট অঞ্চলেরও বহু রূপান্তর হইয়াছে। এখানে কয়েকটি নতুন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে, যেমন—১৯৪৬ সালে জর্ডান, (১৯৫৫ সালে জর্ডান পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করিয়াছে) ১৯৪৮ সালে ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েল এবং ১৯৬০ সালের ১৬ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত দ্বীপ সাইপ্রাস (প্রাক্তন ব্রিটিশ ঘাঁটি) স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ অর্জ্জনের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার মর্য্যাদায় আসীন হইয়াছে।

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে এশিয়া মহাদেশের মুক্তি লাভের এই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র আমাদের মনে রাখা দরকার ইদানীং কালের ঘাত-সংঘাতগুলি বুঝিবার জন্য। যদিও সাম্রাজ্যবাদ মরিয়াছে, তথাপি উহার

ভূত এখনও পশ্চিমী শক্তিদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে। এই 'ভৌতিক তাণ্ডব' হইতে ভারতবর্ষ মুক্তি পাইল ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির পুনরুদ্ধারের দ্বারা। কিন্তু তার আগে ভারত সরকার পর্তুগালের সালাজারের গবর্ণমেণ্টের নিকট বহু আবেদন জানাইয়াছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় পর্তুগীজ উপনিবেশ ত্যাগ করিবার জন্য। কিন্তু ত্যাগ করা দূরের কথা, তাঁরা ঘোষণা করিলেন যে, গোয়া পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ন্যাটোর সামরিক গোষ্ঠির সদস্যরূপে পর্তুগাল ভারতবর্ষকে যুদ্ধের হুমকিও দিল। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির (বিশেষভাবে গোয়া) মুক্তিদান সংক্রান্ত প্রস্তাবটিও পর্তুগাল কর্তৃক অগ্রাহ্য হইল। অধিকন্তু গোয়ার অভ্যন্তরে অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং ভারত সীমান্তে বার বার হামলা ঘটিল। ১৭ই নভেম্বর এবং ২৪শে নভেম্বর (১৯৬১) অঞ্জাদেব দ্বীপ (ভারতের উপকূল হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে) হইতে পর্তুগীজরা পর পর দুইটি ভারতীয় জাহাজের উপর গুলী চালাইল। ফলে, একজন গুরুতর আহত এবং একজন নিহত হইল। তখন ভারত সরকার ৫ই ডিসেম্বর তারিখ গোয়া সীমান্ত অভিমুখে সৈন্য চলাচলের হুকুম দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তারপরেও পর্তুগীজরা ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন ও হামলা করিতে লাগিল। অবশেষে ভারত সরকার নিতান্ত অনিচ্ছায় সামরিক অভিযানে বাধ্য হইলেন। এখানে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণে আনা যাউক 'যুগান্তরের' সম্পাদকীয় রচনা হইতে :

গোয়ার মুক্তি

স্বাধীন ভারতের নূতন ইতিহাস রচিত হইল। দীর্ঘ ১৪ বছরের প্রতীক্ষা ও ধৈর্যের পর ভারতবর্ষ সত্য সত্যই অস্ত্রধারণ করিল এবং সুদীর্ঘ সাড়ে চারিশত বছরের ঔপনিবেশিক অসম্মানের অবসান ঘটাইয়া গোয়ার মুক্তিবিধান করিল। সালাজার গভর্ণমেণ্টের গোয়ার্তুমি গোয়ায় উপযুক্ত জবাব পাইয়াছে এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন ভারতের এই সশস্ত্র আঘাত পশ্চিম উপকূল হইতে বহুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত প্রবেশ করিবে এবং এঙ্গোলার হতভাগ্য আফ্রিকানগণ মুক্তি লাভের নূতন প্রেরণা পাইবেন। গোয়া, দমন ও দিউর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকতা ও পরশাসনের শেষ কলঙ্কিত চিহ্ন লুপ্ত হইল। এজন্য গোয়া-মুক্তির আন্দোলনকারীগণকে এবং ভারত-সরকারকে সর্বাগ্রে অভিনন্দন !

প্রধানমন্ত্রী নেহরু ব্যক্তিগতভাবে শান্তিবাদী এবং যুদ্ধের বিরোধী। ভারত সরকার নীতিগতভাবে উপনিবেশ ও সামরিকতা বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীর অতি উচ্চ অহিংসনীতি এবং ভারতবর্ষের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও শান্তি-নীতির প্রয়োগ এতদিন পর্যন্ত ভারত সরকারকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বলপ্রয়োগ হইতে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু গোয়ার প্রশ্নে ভারত সরকার (পণ্ডিত নেহরুর ভাষায়) ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছিয়াছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৪ বছর ধরিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ভারত সরকার পর্তুগালের নিকট বহু প্রকার আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বহু ভাবে পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের নৈতিকতার দিকে তাকাইয়া নেহেরু সরকার কোন বল প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, ১৯৫৫ সালের গোয়া-মুক্তির গণ-সত্যাগ্রহ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (যেমন—বিশ্বশান্তি আন্দোলন, আফ্রিকা-এশিয়া সংহতি আন্দোলন, জাপানের এটম্ বোমা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি) গোয়া এবং এশিয়া-আফ্রিকার বাকী উপনিবেশগুলির বার বার মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। সালাজার সরকারের হৃদয় ও বিবেকের নিকট বহু দিক হইতে আবেদন গিয়াছে। কিন্তু পর্তুগালের মন টলে নাই, বিবেক-বুদ্ধি বিচলিত হয় নাই, বরং নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিক জমিদারির জন্য দম্ভ প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যখন ইংরাজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আপোষ-মীমাংসার দ্বারা তাঁদের সাম্রাজ্য-শাসনের অবসান ঘটাইয়াছেন, যখন ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতা ইন্দোনেশিয়া হইতে অপসৃত এবং আফ্রিকার বৃহত্তম অংশ পরশাসনমুক্ত, তখনও পর্তুগালের চৈতন্য হয় নাই, 'দেওয়ালের লিখন' অনুধাবন করে নাই। অথচ বৃটেন ও ফ্রান্স, এমন কি হল্যাণ্ডের তুলনায় পর্তুগাল অতি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। কিন্তু ক্ষুদ্রের দম্ভ আকাশস্পর্শী হইয়াছিল। গোয়াতে নিষ্ঠুর ও হিংস্র দমননীতি ও অত্যাচার ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হইতেছিল। আর আফ্রিকার এঙ্গোলাতে এই পর্তুগীজ দস্যুতা বর্বরতার চরম করিয়া ছাড়িয়াছে। পাইকারি হারে গণহত্যার দ্বারা ফ্যাসিষ্ট ক্রূরতার নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।সুতরাং মানবতাবিরোধী, স্বাধীনতাহরণকারী এবং পরস্বাপহারী এই বর্বর পর্তুগীজ সরকারকে ক্ষমা করা যায় না। এই ঔপনিবেশিক জলদস্যুদের দৃষ্টি ও আচরণ এখনও ষোড়শ শতাব্দীর পররাজ্য গ্রাসের মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং আপোষ-মীমাংসা ও

শান্তিপূর্ণ আলোচনার কোন অবসর ছিল না। বাধ্য হইয়া এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই নেহরু গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত গোয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করিয়াছেন।

কিন্তু স্মরণে রাখিতে হইবে আমাদের সৈন্যেরা কোন বিদেশ জয় করিতে যায় নাই, আমাদের সামরিক শক্তি কোন পররাজ্য অক্রমণে নিযুক্ত হয় নাই। আইনের ভাষায় ইহা আগ্রাসন বা পররাজ্য আক্রমণ নহে। ইহা নিজ দেশের মুক্তিবিধান। অর্থাৎ গোয়া দমন ও দিউ ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেমন কাশ্মীর। সেই অবিচ্ছেদ্য অংশ পরের হস্তগত ছিল। আজ আমাদের সৈন্যবাহিনী আমাদের নিজস্ব ভূমি উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এই 'হিংসা' এবং সশস্ত্র বলপ্রয়োগ পবিত্র এবং রাষ্ট্রধর্মের অন্তর্গত। পর্তুগীজ সরকারই এই অবস্থা এবং এই পরিণতির জন্য দায়ী। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ উপনিবেশের মোট আয়তন ১৩৪৪ বর্গমাইল। তার মধ্যে গোয়া ১৩০৯, দমন ২১ এবং দিউ ১৪ বর্গমাইল। সমগ্র জনসংখ্যা ৬,৩৭,৫৯১ এবং ইহার মধ্যে ৪২ হাজার লোক ১৯৫৪ সালেই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল দাদরা ও নগর হাভেলির মুক্তির দ্বারা। আজ পর্তুগাল ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে গলাধাক্কা খাইয়া অগাধ সমুদ্রে ছিটকাইয়া পড়িল।

কিন্তু পর্তুগাল কিসের জোর এবং কাহাদের জোরে ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া পড়িতে অস্বীকৃত ছিল? পর্তুগালের এক নং বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বৃটেন। বৃটেন বরাবর গোয়ার মুক্তি অভিযানে বাধা দিয়াছে, এমন কি ভারত সরকারকে এই বলিয়া পর্যন্ত ভয় দেখাইয়াছে যে, ইহার ফল ভয়ানক হইবে! আফ্রিকার কঙ্গো ও কাতাঙ্গা এবং ভারতবর্ষের গোয়া-দমন-দিউ সম্পর্কে ম্যাকমিলান সরকারের এই দুষ্ট নীতি আমরা স্মরণে রাখিব। তাঁরা পর্তুগীজ বর্বরতাকে আড়ালে সমর্থন করিতেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা জীয়াইয়া রাখিতেছেন এবং যখন ভারত সরকার গত ১৪ বছর ধরিয়া পর্তুগালের নিকট অপেক্ষমান ছিলেন গোয়ার শান্তিপূর্ণ মুক্তির জন্য, তখন বৃটিশ রক্ষণশীল পার্টির এই ভণ্ডের দল সালাজার গভর্ণমেণ্টের উপর বিন্দুমাত্র চাপ দেন নাই। চোরে চোরে যেমন মাসতুত ভাই, তেমনি আফ্রিকায় পারস্পরিক ঔপনিবেশিক সম্পর্কের জন্য বৃটেনের ম্যাকমিলান সরকার সালাজারের গুণ্ডা সরকারের বন্ধু সাজিয়াছেন। আমরা প্রকাশ্যে ধিক্কার দেই বর্তমান বৃটিশ সরকারের এই নির্লজ্জতার জন্য। কিন্তু আমরা জানি গোয়ার প্রশ্নে সহৃদয় চিত্তে এবং খোলাখুলিভাবে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র

সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রেজনেভ্ (বর্তমানে ভারতের অতিথি) প্রকাশ্যেই গোয়ামুক্তির অভিযান সমর্থন করিয়াছেন। এজন্য রাশিয়া ও তাঁর গভর্ণমেণ্টের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছি।

ভারত রাষ্ট্র তার নৈতিক ও মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করিয়াছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত হানিয়াছে। এই অস্ত্র জয়ী হউক। আমাদের নওজোয়ানরা ভারত রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে। এতদিন পরে রাষ্ট্রধর্ম ও ক্ষাত্রধর্মের মধ্যে মিলন ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের পৌরুষ জাগ্রত হউক এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হউক!

১৯. ১২. ৬১.

৩৬ ঘণ্টার নাটক!

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ হার্মাদদের সাড়ে চারিশত বছরের দুশমনি রাজত্ব মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া গেল। ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার মধ্যরাত হইতে ভারতীয় বাহিনী গোয়াতে প্রবেশ স্বরু করে এবং ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে গোয়া, দমন, দিউর মুক্তি ঘটে। দুই হাজার শ্বেতকায় সৈন্যসহ পর্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ ভারতীয় অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জে এন চৌধুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তারপর গোয়ার গভর্ণর-জেনারেলের বাসভবন হইতে পর্তুগীজ পতাকা নামাইয়া আনা হয় এবং অশোক-চক্র-লাঞ্ছিত ভারতের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক অভিবাদনসহ উত্তোলন করা হয়। এভাবে প্রায় বিদ্যুৎগতিতে পর্তুগীজ উপনিবেশের পতন ঘটে এবং ৩৬ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাকে একাঙ্ক নাটক বলিয়াও অভিহিত করা যায় কিম্বা এই মিলিটারী অপারেশনকে 'মিলিটারী অপেরা' বলিলেও ক্ষতি নাই! কারণ, পর্তুগাল যেভাবে তর্জন-গর্জন করিতেছিল, তাতে তারা যে বিনাযুদ্ধে প্রায় সুবোধ ও সুশীল বালকের মত আত্মসমর্পণ করিবে, এতটা আশা করা যায় নাই। কিন্তু আপাততঃ এই নাটক একাঙ্কিকা বলিয়া মনে হইলেও সমুদ্র পারবর্তী দেশগুলিতে ইহার গর্ভাঙ্ক বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এবং সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার যবনিকা পড়িতে দীর্ঘ সময় লাগিবে। কারণ, সমুদ্রপারে ইহার অভিনয়-মঞ্চে 'হীরোর' চেয়ে 'ভিলেইন্'-এর (দুশমন) সংখ্যা বেশী জুটিয়াছে।. সাম্রাজ্যবাদী এই দুশমনের ('ভিলেইন্') দল রাষ্ট্রসঙ্ঘের

সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভারতবর্ষকে পররাজ্য আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করে এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে যে. অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও শত্রুতার অবসান ঘটানো হউক, ভারতীয় সৈন্যরা তাদের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়া যাউক এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার পন্থা অবলম্বন করা হউক। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবের কিম্বা পর্তুগালের পক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু সোভিয়েট্ রাশিয়া, সিংহল, লাইবেরিয়া ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ইহার বিরোধিতা করে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভিটো প্রয়োগ করে। ফলে, প্রস্তাবটি বানচাল হইয়া যায়।

কিন্তু এই নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। বৃটেন চিরকাল সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র। তাদের ধূর্ততা ও কূটনৈতিক চতুরতা সর্বজনবিদিত। ভারতবর্ষ মাত্র সেদিনও তাদের পদানত ছিল। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ অস্ত্র ধারণ করিয়া একটি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় শক্তিকে ভারতের মাটি হইতে উচ্ছেদ করিবে—মিঃ ম্যাকমিলান ও তাঁর দলবল সম্ভবতঃ কালা আদমিদের এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে রাজী নন। আমরা ম্যাকমিলান এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের উত্তমরূপে চিনি এবং জানি কিভাবে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস লুঠতরাজ, দস্যুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা, কিম্বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? সিকিউরিটি কাউন্সিলে আমরা মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ষ্টিভেনসনের বক্তৃতা পড়িয়া হতবাক্ হইয়াছি। এই ভদ্রলোক একদা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী ছিলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন বলিয়া আমরা জানিতাম। কিন্তু এবার তাঁর বক্তৃতা পড়িয়া মনে হইল হয় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা ওয়াশিংটনের লাইব্রেরীতে গিয়া তাঁর আরও কিছু পড়াশুনা করা উচিত। কারণ, প্রথমতঃ তিনি ভারতের গোয়া-মুক্তির অভিযানকে সেই সমস্ত পররাজ্য আক্রমণকারী শক্তির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যারা লীগ অব্ নেশন্সের (বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ) পতন ঘটাইয়াছিল। মিঃ ষ্টিভেনসনের এই তুলনার অর্থ হইল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মাণী, ইতালী ও জাপান ইত্যাদি যেভাবে জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ধ্বংস ঘটাইয়াছিল বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণের দ্বারা, ভারতের 'গোয়া আক্রমণ'ও সেই পর্য্যায়ভূক্ত। কিন্তু ভদ্রলোক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জার্মাণী, জাপানও ইতালী অপরের সার্বভৌম স্বাধীন রাজ্যগুলি আক্রমণ ও গ্রাস করিয়াছিল, নিজেদের দেশ উদ্ধারের যুদ্ধ তারা করে নাই। সুতরাং মিঃ ষ্টিভেনসনের এই

প্রকার তুলনা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, কোন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের কি আপন মুক্তি সাধনের জন্য ইম্পিরিয়াল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ করার অধিকার নাই? ইহার জবাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর্থনে মিঃ ষ্টিভেনসন বলেন যে, না, এমন কোন অধিকার পরাধীন জাতিসমূহের নাই! মার্কিণ প্রতিনিধির এই জবাব শুনিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাজ্জব বনিবে। যদি পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ বা বিদ্রোহের অধিকার না থাকে, তা'হলে মিঃ ষ্টিভেনসনকে প্রশ্ন করা যায় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি আজও বৃটেনের উপনিবেশ মাত্র? আমেরিকা কেন বিদ্রোহ এবং কেন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল বৃটেনের বিরুদ্ধে এবং কেনই বা সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণায় আমেরিকার বিখ্যাত নেতাগণ স্বাক্ষর দিয়াছিলেন? কেন জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ, রক্তপাত ও বলপ্রয়োগের পথে গিয়াছিলেন মুক্তির জন্য? তার চেয়ে ১৮৫ বছর ধরিয়া অমেরিকা কেন বৃটেনের সঙ্গে এই "বিরোধের" শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় অপেক্ষা করিল না? যদি ইংরাজের উপনিবেশরূপে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় আজও কেনেডি ও ষ্টিভেনসন সাহেব অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, তবে অহিংসার মার্কিণী মহিমার দ্বারা তাঁরা গান্ধীজীকেও হার মানাইতে পারিতেন! কিন্তু ষ্টিভেনসনের চেয়ে তাঁর পূর্বপুরুষেরা মহৎ মানুষ, বীর পুরুষ ও স্বাধীনতাকামী সৎ মানুষ ছিলেন। আজিকার অধঃপতিত মার্কিণ কূটনীতিকদের মত ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিঙ্কলন প্রভৃতি মহান্ নেতারা ইউরোপীয় উপনিবেশ-বাদী জুয়াচোরদের সাঙাৎ ছিলেন না, এজন্য তাঁরা আমেরিকার ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত ও আদর্শস্থানীয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মানবমুক্তির কাহিনী যুদ্ধের ইতিহাসের একটি সুবৃহৎ অধ্যায় জুড়িয়া আছে এবং স্বদেশ রক্ষা ও উদ্ধারের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধরূপে সর্বদেশে কীর্তিত হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, মিঃ ষ্টিভেনসন গোয়াকে ভারতবর্ষের ভূমি বলিয়াই মনে করেন না, তাঁর মতে উহা পর্তুগালের অন্তর্গত এবং যেহেতু পর্তুগাল স্বাধীন রাষ্ট্র, সেই হেতু তার দেশ আক্রমণ করা বে-আইনী! আশ্চর্য মস্তিষ্ক এবং ততোধিক আশ্চর্য যুক্তি বটে!

পর্তুগালের প্রতিনিধির যুক্তি আরও চমৎকার। তিনি সিকিউরিটি কাউন্সিলে বলিয়াছেন যে, পূর্বপাকিস্থান যেমন পাকিস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, গোয়াও তেমন পর্তুগালের অংশ। (ঢাকাবাসী, প্লীজ, নোট্! তোমাদের অবস্থা গোয়ার মত। অবশ্য এক হিসাবে ইহা সত্য। কারণ, পূর্ব

পাকিস্থান পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশ তুল্য!) পর্তুগীজ প্রতিনিধিকে আমরা সার্কাসের ভাঁড় বা ক্লাউন বলিয়া মনে করি; সুতরাং তাঁর মূর্খতা লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছু নাই। কিন্তু বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স, যাঁরা পশ্চিমী পাণ্ডিত্য ও সভ্যতার মাথার মণিরূপে পরিচিত, তাঁদের আবোল-তাবোল উক্তিকে যদি যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে, শিকাগো শহরের গ্যাংষ্টারদের গুণ্ডামীকেও একটা সৎকার্য বলিয়া মানিতে হইবে। সুতরাং ইঁহাদের বক্তৃতা লইয়া অধিক মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। তবে, এই নাটকের এখানেই শেষ হইতেছে না। কারণ, ইন্দোনেশিয়া হইতে ডাঃ সুকর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম ইরিয়ানকে ওলন্দাজ শাসন হইতে উদ্ধার করা হইবে এবং এজন্য সৈন্যবাহিনীর সমাবেশের জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আমরা বলিব—"সাবাস সুকর্ণ! ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করো, পশ্চিম ইরিয়ানকে উদ্ধার করো, সমগ্র ভারতবর্ষ তোমাকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানাইবে!"

এই নাটকের আর একটি শিক্ষণীয় দিক আছে এবং তাহা এই যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং তাদের দলভুক্ত শক্তিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধী। সুতরাং এশিয়া ও আফ্রিকাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির (সোভিয়েট রাশিয়া, নয়াচীন, পূর্ব-জার্মাণ রাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই গোয়ার মুক্তিতে ভারতবর্ষকে সমর্থন জানাইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবার মত) সহযোগিতায় আত্মরক্ষা এবং শান্তি ও স্বাধীনতা নির্বিঘ্ন করিতে হইবে। ২১. ১২. ৬১.

কে শত্রু, আর কে মিত্র?

বিংশ শতকের দুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে যখন পৃথিবীর মানচিত্র প্রায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল, যখন বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল, যখন পরাধীন দেশগুলি একে একে পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং যখন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ সরকারীভাবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করিল, তখনও কাঁহারা উপনিবেশবাদ জীয়াইয়া রাখিতে চাহেন এবং কাঁহারাই বা উহার মৃত্যু কামনা করেন, সেই তথ্য এবার ভারতীয় পর্তুগীজ উপনিবেশের মুক্তিতে পরিষ্কার হইয়া গেল। পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা ও উপনিবেশ-সমূহের মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন বরাবর নিরঙ্কুশ সমর্থন জানাইয়া আসিয়াছে। এবারও তার সমর্থন বার বার উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে,

পশ্চিমী শক্তিগুলি এই উপনিবেশবাদ শুধু রক্ষা করিতেই চাহিতেছেন না, যাঁরা উপনিবেশগুলিকে উদ্ধার করিতে চাহেন, তাঁদের সর্বপ্রকারে বাধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁদের 'পররাজ্য আক্রমণকারী' বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। এই অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ ভারত উপমহাদেশে পর্তুগীজ ছিটমহলগুলির মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর উদ্দেশে যে অভিনন্দনবাণী পাঠাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ-যোগ্য। মিঃ ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন, সোভিয়েট জনসাধারণ ভারতের এই কার্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং মিত্ররাষ্ট্র ভারতের স্বাধীনতার সংহতি সাধন চেষ্টার সাফল্যও কামনা করে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ঔপনিবেশিক চিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ন্যাটো-গোষ্ঠির সমর্থনপুষ্ট এই ঔপনিবেশিকতাবাদীরা জনসাধারণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় জণগণের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বদা ভীতি প্রদর্শন করিতেছিল। ঔপনিবেশিক চিহ্নগুলির বিলোপসাধনে ভারত সরকারের এই সুদৃঢ় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মিঃ ক্রুশ্চেভ তাঁর তারবার্তায় জানাইয়াছেন।

কেবল প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ নহেন, ভারত ভ্রমণরত সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি মিঃ ব্রেজনেফ্‌ কলিকাতা মহানগরীর সম্বর্ধনার জবাবে যে অপূর্ব ভাষণ দিয়াছেন এবং যেভাবে বাঙ্গলায় "সোনার বাঙ্গলা" ও "নমস্কার" শব্দ দুটি উচ্চারণ করিয়া অগণিত জনতার চিত্তহরণ করিয়াছে‌ন, তাহা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকিবে। বাঙ্গলায় রূপান্তরিত তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে "মুক্তি আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র" এবং "ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকেন্দ্র" কলিকাতা মহানগরীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"ঔপনিবেশিক শাসনের অকাল প্রবক্তার দল যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসের চাকা বিপরীত দিকে তাঁরা ঘোরাতে পারবেন না। উপনিবেশবাদের আয়ু ফুরিয়েছে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্লজ্জ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চিরতরে নির্মূল করে দেবে।" এই বক্তৃতার উপসংহারে রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেফ্‌ বলেন, "শান্তি ও জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর অপূর্ব কুসুমগুলি সহস্র দলে বিকশিত হয়ে উঠুক!" আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর এই অভিনন্দনবার্তা এবং উপনিবেশ সম্পর্কে তাঁদের এই সুস্থ মনোভাবের প্রতি পশ্চিমী জগতের এবং বিশেষভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন

ও ফ্রান্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র ভারতবর্ষে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় এত জনপ্রিয় এবং কেন তাঁরা ভিন্ন সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত জনতার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন, তার প্রমাণ মিলিবে এই সমস্ত ঘটনায়। মিঃ ম্যাকমিলান, মিঃ কেনেডি এবং মিঃ স্থ গল্‌ যখন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন এশিয়া-আফ্রিকার রাজনৈতিক সচেতন জনগণ তাঁদের মুখের কথা বিশ্বাস করেন না। কারণ, তাঁদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বুলি একটা বৃহৎ ধাপ্পা মাত্র। যদি একথা সত্য না হইত, তবে ইদানীংকালের সুয়েজ খাল, কাতাঙ্গা ও গোয়া লইয়া তাঁরা ঔপনিবেশিক জুয়াখেলায় মাতিতেন না। তাঁরা কি আজ পর্যন্ত পর্তুগালকে চাপ দিয়াছেন এঙ্গোলা (আফ্রিকা) এবং গোয়ার (এশিয়া) অবিলম্বে মুক্তি বিধানের জন্য? অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের গৃহীত প্রস্তাবে উপনিবেশগুলির পরাধীনতার অবসান দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাব যখন হাতেকলমে কার্যকরী করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রকাশ্যে বা গোপনে বাধা দিতেছেন। তথাপি ম্যাকমিলান-কেনেডি-স্থ গলের দল এতটুকু লজ্জা বোধ করেন না। একদিকে উপনিবেশ ও পরাধীনতা জীয়াইয়া রাখা এবং অন্যদিকে "ফ্রী ওয়ার্ল্ডে'র" বিজ্ঞাপন প্রচার করা—আজিকার আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ 'ভাবের ঘরে এই চুরি' আর বরদাস্ত করিতে রাজী নহেন। তাঁরা কি সোভিয়েট ইউনিয়নের মত মুক্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করিতে পারেন যে, পৃথিবীর যেখানে যেখানে আজও যে সমস্ত উপনিবেশ আছে, সেগুলির অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক, অন্যথা বলপূর্বক এই ঔপনিবেশিক দাসত্বের উচ্ছেদ ঘটানো হইলে তাহা সানন্দে সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে?—কিন্তু আমরা জানি বৃটিশ, মার্কিণ, ফরাসী, বেলজিয়ান্‌ ও ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টসমূহ এই পবিত্র ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে পারিবেন না। কারণ, এতকাল আফ্রিকার ও এশিয়ার সস্তা মজুর, ঐশ্বর্য ও কাঁচামাল ভাঙ্গাইয়া যে বিপুল সম্পদ তাঁরা আহরণ করিয়াছেন, তার মূল উৎসগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে তাঁরা কোন দিন চান না। ইতিহাসের অনিবার্য গতিতে যাহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তার ভিতর হইতেও কিছু হাতড়াইয়া রাখা যায় কিনা, এবং বাকী উপনিবেশগুলিকেও কিভাবে হাতের মুঠিতে রাখা যায়, এই চিন্তা ও চেষ্টা রহিয়াছে পশ্চিমী শক্তিবর্গের। সুতরাং গোয়ার মুক্তির জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের উপর খাপ্পা হইয়াছেন এবং বর্বর পর্তুগীজ সরকার প্রতিশোধ লওয়ায় জন্য আফ্রিকার ৩০ হাজার ভারতীয়কে বন্দী করিয়াছেন এবং তাঁদের

সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য, গৃহ ও সম্পত্তি আটক করিয়াছেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তো আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের (ভারত সরকারের কার্যের জন্য যাঁরা আদৌ দায়ী নন) এই নির্যাতনে টু শব্দটি করিতেছেন না। তাহলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কিভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার সহানুভূতি এবং সমর্থন পাইবেন ?

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তো কোন ভূমিগত উপনিবেশ নাই, তা'হলে তাঁরা গোয়ার জন্য মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন কেন ?—ইহার কারণ একটু দূর গভীরে লুক্কায়িত। পৃথিবীর উপনিবেশগুলির মালিক হইতেছে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং এই শক্তিবর্গ ধনতন্ত্রবাদের উপর দণ্ডায়মান বলিয়া সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদ যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তা'তে একদিন খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনিক মহল বিপন্ন হইবেন। ইতিহাসের ঝোঁক ও গতি সেই দিকে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান এই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকে একদিন সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বারা প্রতিরোধ করার দরকার হইতে পারে। তার জন্যই সামরিক প্রস্তুতি এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ পরীক্ষা চলিতেছে। কল্পিত কমিউনিজম নিধনের এই যজ্ঞে প্রধানতম সহায় হইতেছে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এবং তাঁদের তাঁবেদারের দল—যেমন, পাকিস্থান, জাপান, পশ্চিম জার্মাণী প্রভৃতি। লক্ষ্য করিবার এই যে, ইহারা সকলেই গোয়া-মুক্তির বিরোধী! এই পশ্চিমী শক্তিবর্গের যেখানে যত উপনিবেশ আজও রহিয়াছে এবং তাহা ছিটমহলের মত ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও সেগুলিকে কুক্ষিগত রাখা দরকার। কারণ, একদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাঁচা মাল ও সম্পদ আহরণের মূল উৎসগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে (অন্যথা এই শক্তিগুলি দুর্বল হইয়া পড়িবে, যেমন হইয়াছে আজিকার বৃটেন) এবং অন্যদিকে ভবিষ্যৎ কোন যুদ্ধের জন্য এই সমস্ত উপনিবেশকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ রাখিতে হইবে। আজ যদি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে গোয়ার মত উৎকৃষ্ট বন্দর পর্তুগালের দখলে থাকিত, তবে, এশিয়ার কোন ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ন্যাটো শক্তিবর্গ অনায়াসে তাহা সামরিক প্রয়োজনে কাজে লাগাইতে পারিত। কিন্তু নেহরুর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট উপনিবেশবাদীদের এই মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন। সুতরাং ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী ক্রুদ্ধ হইবেন না ? যদি পাকিস্থানের মত ভারতবর্ষকে নেহরু সরকার মার্কিণ উপনিবেশে পরিণত করিতেন, তা'হলে কেনেডি-ম্যাকমিলান-দ্য গল, এমন কি সালাজারের মত মহাপুরুষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুখের কাছে সোনার পেয়ালায় সুরা তুলিয়া ধরিয়া বলিতেন—"আহা, ভারতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

কী অপূর্ব অহিংসা ও আধ্যাত্মিক শ্রীমণ্ডিত! ছাখো, ফ্রী ওয়ার্ল্ডের এই ফ্রী কলোনী কেমন আশ্চর্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার তীর্থস্থান!" প্রকৃতপক্ষে নেহরু সরকারের উপর অহিংসা ও গান্ধী-নীতির নাম করিয়া এই ধরণের একটা চাপা ভরসা তাঁরা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ নেহরু হঠাৎ বিগড়াইয়া গেলেন এবং পশ্চিমী বাড়া ভাতে ছাই দিলেন!

একথা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া গেল যে, আজও যাঁরা উপনিবেশ ও পর-শাসন বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁরা এশিয়া-আফ্রিকার বন্ধু নন, বরং তাঁরা মানবতা, গণতন্ত্র এবং শান্তির শত্রু! ২৩. ১২. ৬১.

পিছনের ইতিহাসঃ

সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ভারতবর্ষ ও এশিয়া মহাদেশ আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতের পর্তুগীজ পকেটের মত এই ধরণের কিছু কিছু ঔপনিবেশিক পকেট এখনও এশিয়ার বিশাল মানচিত্রে কালির ফোঁটার মত এদিক-ওদিক ছড়াইয়া আছে—যেমন, ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম ইরিয়ান (ওলন্দাজ) হংকং (বৃটিশ) ও হংকংয়ের নিকটবর্তী ম্যাকাও দ্বীপ (পর্তুগীজ) এডেন, উত্তর বোর্নিও ইত্যাদি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় অভিযাত্রী আবিষ্কারক ও রাজ্যলোভীর দল পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন হইতে এশিয়ার বন্ধনের সূত্রপাত। গোয়ার মুক্তি সেই অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত। সুতরাং পিছনের ইতিহাস কিছুটা স্মরণ করা যাউক।......

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে পৌছিয়াছিলেন। তখন হইতে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে যে নূতন সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল, তার রাজনৈতিক আধিপত্যের দিন শেষ হইল ইদানীং কালে। অর্থাৎ ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমনের পর হইতে পুরা সাড়ে চারশ' বছর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশে তথা গোটা পৃথিবীতে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের যে এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক যুগ দেখা দিয়াছিল, ভারতের স্বাধীনতা ও নয়াচীনের বৈপ্লবিক জয়যাত্রার পথে তার অন্তিম পর্ব রচিত হইল। (কারণ, এই দুইটি দেশই একত্রে একটি মহাদেশের চেয়েও বড় এবং মোট লোকসংখ্যা ১০০ কোটির বেশী! ভারত ও মহাচীন যতদিন পদানত ছিল, ততদিন কার্যতঃ গোটা এশিয়াই পদানত ছিল।) সাড়ে চারশ' বছর সময় নিশ্চয়ই সামান্য

নহে। কেবল বহু রাজ্যের উত্থান-পতনের দিক হইতেই নহে, বহু রাষ্ট্রীক ও সামাজিক পরিবর্তন, বহু প্রকার যুগান্তকারী চিন্তার আমদানী, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হিংসা ও উৎপীড়ন এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে এই শতাব্দীগুলির কাহিনী অবর্ণনীয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ গিয়াছে শ্রমশিল্পের বৈপ্লবিক আরম্ভে ও ফরাসী বিপ্লবের গর্ভজাত বুর্জোয়া সমাজের নতুন অভ্যুত্থানে এবং উনিশ শতক গিয়াছে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও যন্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব প্রসারে। বিশ শতকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ শিকড় গাড়িয়া বসিল এবং উহারই পরিণতিতে ডাকিয়া আনিয়াছে ধনতন্ত্রের সংঘর্ষসঞ্জাত মহাযুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক পতন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বোধহয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হইতেছে একদিকে সোভিয়েট বিপ্লব ও অন্যদিকে এশিয়ার বন্ধনমুক্তি। কিন্তু এই বন্ধনের সুরু হইয়াছিল ১৪৯৮ সালের ২৭শে মে যখন ভাস্কো-ডি-গামার কালিকট বন্দরে অবতরণের দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী ইয়োরোপের সমুদ্রপথ খুলিয়া গেল। পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরাজ, এই শক্তিগুলি প্রাচীন এশিয়া মহাদেশের তীরে তীরে পালখাটানো জাহাজ লইয়া ভীড় করিল। এই অভিযানেরই শেষ পর্বে আসিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জারের রাশিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ডে নৌবলপ্রধান বৃটেনই প্রায় অপ্রতিদ্বন্দী অধিনায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিশ শতকে অর্ধভাগ (১৯৫০) পূর্ণ হইবার আগেই বৃটেনসহ সমস্ত ইয়োরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল। নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এই বিরাট পর্ব অনুসন্ধান করিলে এক বিস্ময়কর এবং সময়ে সময়ে হতবুদ্ধিকর অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সার্দ্ধ চারি শতাব্দী ধরিয়া এশিয়া মহাদেশের বহু রাজ্যে বহু প্রকার ঘটনা এবং অবস্থার সমাবেশ হইয়া থাকিলেও তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষকদের নিকট সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রীক ও সামাজিক পরিণতির মধ্যে একটি বিচিত্র যোগসূত্র ও ঐক্য খুঁজিয়া পাইবে। সুপণ্ডিত সর্দার পানিকর তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে এই মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পূর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম সামুদ্রিক-বল-প্রধান রাষ্ট্রশক্তি এশিয়ার ভূমিবল-প্রধান রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়ার জাতিগুলির অর্থনৈতিক জীবনধারা ছিল প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের উপর এক বিচিত্র "বাণিজ্যিক অর্থনীতি" (যার ভিত্তি আন্তর্জাতিক ব্যবসার উপর) চাপাইয়া দেওয়া হইল। তৃতীয়তঃ, ইয়োরোপের যে জাতিগুলির হাতে 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর'

চাবিকাঠি ছিল, তারাই রাজনৈতিক শাসন ও কর্তৃত্ব বিস্তার করিল এশিয়ার জনগণের উপর। সমুদ্রপথের অভিযান হইতে এই নূতন বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের যাত্রা সুরু এবং ভাস্কো-ডি-গামার পর হইতে অতলান্তিক, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর যেন ইয়োরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্গত হইল। আশ্চর্য এই, যে সামান্য মশলার ব্যবসায় হইতে পূর্ব-পশ্চিম 'মার্কেটে'র সৃষ্টি তারই উঠানামার পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপ ও এশিয়ার ইতিহাসে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতি মশলার সঙ্গে পাল্লা দিয়াছিল প্রাচ্যখণ্ডের অন্যান্য পণ্যদ্রব্য—যেমন মহাচীন ও ভারতবর্ষের রেশম ও কার্পাস শিল্প, মূল্যবান প্রস্তর ও সৌখীন বিলাসদ্রব্য এবং নব আবিষ্কৃত বারুদ তৈয়ারির উপযোগী পদার্থ। এই বিপুল বৈদেশিক বাণিজ্য যেন এক নতুন যুগের সূচনা করিল, যার ফলে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের ঐশ্বর্য্য ও লোভ এশিয়ার জাতিগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত এক রাষ্ট্রিক দুর্বিপাকের মধ্যে লইয়া গেল। বৃটিশ বণিকদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষের কৃষিসমাজ ও শ্রেষ্ঠী জীবনের যেমন পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল, অষ্টাদশ শতক হইতে তেমন পরিবর্তন চীন মহাদেশেও ঘটিতে লাগিল। দেশের আভ্যন্তরীণ ভূভাগে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ছিল কেন্দ্রীভূত, লক্ষ্য করিবার এই যে, সেই শক্তি স্থানান্তরিত হইল উপকূল-ভাগে। এবং উপকূলভাগে আগত বিদেশী বণিকবৃন্দের সহযোগিতায় এমন এক নূতন স্বদেশী বণিকশ্রেণী দেখা দিল যাদের স্বার্থ ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে জড়াইয়া গেল। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম তীর হইতে সুরু করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের চৈনিক তীর পর্যন্ত এই যে অভিনব অবস্থার উদ্ভব হইল, ইহার ফলে এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রজীবনে আসিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট প্রাচ্য দেশগুলির নতি স্বীকার। অবশ্য সাড়ে চারশ' বছর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন পরাধীনতার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ ছিলাম, একথা সত্য নহে। তথাপি প্রায় দুই শ' বছরই ছিল ইয়োরোপীয় সামরিক ও রাজনৈতিক শাসনের দুঃসহ যুগ। এই দুঃসহ যুগের মধ্যে এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মের দিক হইতেও পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে চীন ও ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সংগে খৃষ্টান মিশনারীদের অভিযানও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ প্রাচ্য দেশের বিপুল সমাজজীবনের ভিত্তিমূলে যে সংস্কৃতি ছিল বহু প্রাচীন, ধর্মের দিক হইতে তারও

উপর আঘাত হানা হইল। তবে এই আঘাত চীনের চেয়ে ভারতবর্ষই বেশী সামলাইয়া নিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন ইয়োরোপের কথা বলিতেছি তখন মনে রাখা দরকার যে, জারের রাশিয়া ও আমেরিকাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। ১৮৪৮ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে পৌছিল। ক্যালিফোর্ণিয়ার তীর পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই বিস্তৃতির পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই হাওয়াই, গুয়াম্ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইয়া আমেরিকা চীনের উপকূলভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইল। ইহারই অন্যতম পরিণতিস্বরূপ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি জাপানের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়া গেল। চীনের ভূভাগে বাণিজ্যিক আধিপত্য ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মার্কিণ নৌ-বলের প্রভুত্ব, এই দুই দিক হইতেই ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে পার্ল হারবারের উপর অতর্কিত জাপানী আক্রমণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উনিশ শতক গিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রভুত্ব বিস্তারের যুগে জারের রাশিয়াও অলস বসিয়া রহিল না। বিংশ শতকের শেষার্ধে জারের রাশিয়া পূর্বদিকে মাঞ্চুরিয়া ও ব্লাডিভোষ্টক বন্দর এবং দক্ষিণ দিকে মধ্য এশিয়ার খিবা, বোখারা ইত্যাদি মুসলিম রাজ্যগুলি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত পৌছিল। রুশ আতঙ্ক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরেজ বড়লাট ও লণ্ডনের ইম্পিরীয়েল জেনারেল ষ্টাফকে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার ইয়োরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে রাশিয়ার একটি মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ভৌগোলিক বিচারে পশ্চিম ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ একান্তভাবেই বহু সহস্র মাইল দূরবর্তী সামুদ্রিক-বল-প্রধান শক্তি মাত্র। কিন্তু রাশিয়া ভূগোলের দিক হইতে যেমন এশিয়ার রাজ্যগুলির একান্ত প্রতিবেশী, তেমনি ইয়োরোপীয় অংশ বাদ দিলে রাশিয়া মূলতঃ 'এশিয়াটিক' শক্তিবর্গের অন্তর্গত। এশিয়ার তিনটি বৃহত্তম শক্তি চীন, ভারতবর্ষ ও জাপান সীমান্তের নৈকট্যের দিক হইতে রাশিয়ার প্রতিবেশী। সুতরাং ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত যে রুশ আতঙ্ক বৃটিশ কর্তাদের ছিল, আজ সোভিয়েট কম্যুনিজমের আত্মপ্রসারের আশঙ্কায় সেই পুরানো সন্দেহই নতুন আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু অন্য প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ভৌগোলিক বিচারেই রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে অস্বীকার করা কঠিন। অপর পক্ষে মতবাদের সংঘাত, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যিক বিস্তার এবং আধুনিক কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিশেষভাবে বিমানপথের দ্রুত প্রসার এবং ডলার সাম্রাজ্যের জন্য আমেরিকার প্রভাবও

উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দেখা যাইতেছে এশিয়া মহাদেশের উপর (এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া বা মধ্য প্রাচ্যের কথাও একান্তরূপে মনে রাখিতে হইবে। ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদী আরব, মিশর ইত্যাদি সর্বত্র পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর আধিপত্য ছিল।) ইয়োরো-মার্কিণ শক্তিগুলি সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। যতদিন 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর' দূরত্ব ও পাল খাটানো জাহাজের বিঘ্নগুলি প্রবল ছিল, ততদিন এশিয়ার জনগণের উপর শাসন-শোষণ এত ক্রূর ও নিষ্ঠুর ছিল না। কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে সুয়েজ খালের খনন ও উদ্বোধন হইবার পর পূর্ব ও পশ্চিমের সামুদ্রিক পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল। আর 'ছয় মাসে' উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইল না। তারপর আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির ফলে ইয়োরোপ যেন এশিয়ার বুকের উপর আরও বেশী চাপিয়া বসিল। এশিয়ার অর্থনীতি হইতে সংস্কৃতি পর্যন্ত সমস্তই যেন ইয়োরোপীয় প্রভাবের উগ্রতায় আচ্ছন্ন হইবার জো হইল। কিন্তু ১৯৫০ সালের মধ্যে এই ইয়োরো-মার্কিণ বন্ধন এশিয়া মহাদেশে শিথিল এবং অধিকাংশ স্থানে সম্পূর্ণ খসিয়া গেল।

সমগ্রভাবে বিচার করিলে মানুষের ইতিহাসের ওঠানামা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর মনে হইবে। সাড়ে চার শ' বছর আগে পশ্চিম এশিয়ায় বা মধ্য-প্রাচ্যে মুসলিম আধিপত্য এড়াইয়া নূতন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মহাচীন ও জাপান পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ শৃঙ্খল-মুক্ত এশিয়ার রাজনৈতিক শক্তির উৎস এই অঞ্চলগুলিতেই পাওয়া যাইবে। এবং যে সমুদ্রপথ দিয়া ইয়োরোপীয় বণিকেরা তরবারী হাতে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই আবার তাদের পিছু হটিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রশিষ্যরূপে জাপান মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ফলে আজও সগৌরবে আবার সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও নয়াচীন একত্রে এক বিপুল শক্তির মর্মকেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। আজ এই শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় গোটা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেদিন জাপানের শক্তি ইহার সঙ্গে যুক্ত হইবে, সেদিন এই শক্তি দুনিয়ায় অপ্রতিরোধ্য হইবে।

তিন বছর আগে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিন লিখিয়াছে:

"In the last five years it has been Asians, and not Ameri-

cans and Europeans, who have been deciding the great issues of South-East Asia and the Far East. It will be Asians who will make the decisions of to-morrow. The West·· can no longer command." (New Times, Moscow, ৪নং সংখ্যা ১৯৫৬)। বিখ্যাত মার্কিণ পত্রিকার এই স্বীকৃতি ইতিহাসের একটি গভীর তাৎপর্য বহন করিয়া আনিতেছে। কেননা, এতকাল লণ্ডন-প্যারিস-ওয়াশিংটন—এই তিনের ডিক্টেটরী প্রায় পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিত—যাদের বিরুদ্ধে আবার হাল আমলে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল রোম-বার্লিন-টোকিও অ্যাক্সিস্। কিন্তু আজ ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়াছে। আজ এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলি আন্তর্জাতিক জগতে নতুন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি আরব ও আফ্রিকান জাতিগুলির সঙ্গে একত্রে যে জোট-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতেছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসায় তার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছে। বিশেষভাবে কোরিয়া ও ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি ও অন্যান্য সমস্যায় ভারতবর্ষ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পরাধীনতার যুগে এশিয়ার কোন দেশের পক্ষেই (একমাত্র জাপান ছাড়া) এমন স্বতন্ত্র ভূমিকা কল্পনা করা যাইত না।

নতুন এশিয়াতে দিল্লী-পিকিং-মস্কো যে নতুন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ সেটা কেবল ইয়োরো-মার্কিণ ডিক্টেটরীর বিরুদ্ধেই নতুন অভ্যুত্থান নয়, আসলে শান্তি ও সংগঠনের পথ ধরিয়া নতুন সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী রচনার ইহা এক ঐতিহাসিক চেষ্টা। অন্ততঃ এশিয়ার দরিদ্র ও নির্যাতিত জনগণের দিক হইতে বলা যায় যে, এখনো কোন কোন দেশের সরকারী শাসক মহলে যত বিরূপতা, বিরুদ্ধতা ও বিদ্বেষই থাকুক না কেন, এশিয়ার মানুষ একটি নতুন সমাজব্যবস্থা ও জীবনের নতুন মূল্য রূপায়ণ চাহিতেছে। বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি লাভই একমাত্র শেষ কথা নয়—এই যুক্তির পিছনে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে আইডিয়া কার্যকরী ছিল এবং যে নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাত গত ৩৫ বছরের অধিককাল পৃথিবীর নানা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এশিয়ার জনসমাজ সেই প্রভাবকে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে চাহে। কিন্তু রক্তপাত ও ডিক্টেটরীর পথ ধরিয়াই পরিবর্তন ঘটিবে, এমন অনিবার্যতা আজ অনেক চিন্তাশীল মানুষ স্বীকার করেন না। অর্থাৎ যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে দেখা দিয়াছে এবং গণ-মানসলোকে যে

গতিবেগের সঞ্চার হইয়াছে, উহা ধ্বংসের পথ এড়াইয়া শান্তিপূর্ণ সংগঠনের পথেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু এখানে একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণেরও প্রয়োজন আছে। এই শান্তিপূর্ণ সংগঠন ও মৈত্রীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা আসিতেছে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ফরমোজা, সিঙ্গাপুর এডেন, বাহেরিণ ও সাইপ্রাস—এই ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাবিত ঘাঁটিগুলি হইতে, মোটামুটি যে সমুদ্রপথ গত চার শতাব্দীর অধিককাল পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের করায়ত্ত ছিল। সিয়াটো চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ও পাক-মার্কিণ সামরিক সাহায্য চুক্তি, এগুলি যেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জমান ইয়োরো-মার্কিণ শক্তিবর্গের শেষ আত্মরক্ষার চেষ্টার মত। যদিও এগুলির পিছনে রহিয়াছে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশীয়বাসীদের উত্তেজিত করিবার চক্রান্ত এবং এটম ও হাইড্রোজেন বোমার প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরীক্ষার দ্বারা স্নায়ুযুদ্ধের ব্যাপক অবতারণা করার কৌশল, তথাপি এই সমস্ত চেষ্টা তৃণখণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিবার মতই করুণ দৃশ্যব্যঞ্জক। বিংশ শতকের শেষার্ধের ইতিহাসে বন্ধনমুক্ত এশিয়ার অগ্রগতি প্রতিদিন অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিবে এবং আগামী একবিংশ শতাব্দীর মানুষ নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী এশিয়া ভবিষ্যৎ মানবজাতির বৃহত্তর মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছে।

—জুলাই, ১৯৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

এশিয়া মহাদেশের প্রকাণ্ড মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে, যেখানে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর একসঙ্গে মিলিয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেন উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ হইতে অনেকগুলি সরু মোটা এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো বটের ঝুরি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে কিম্বা এই দুই মহাসমুদ্রের মিলিত এলাকায় যেন ছোট বড় অনেকগুলি পাথর কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে! সাধারণতঃ এই অঞ্চলটাই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া নামে পরিচিত। একদা এখানকার দ্বীপপুঞ্জ 'বৃহত্তর ভারত' নামেও অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীং রাজনৈতিক ভূগোলে এই অঞ্চলের সীমানা সুরু হইয়াছে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে একেবারে পূব দিকে ফিলিপাইন পর্যন্ত এবং উপরের দিকে চীন-ভিয়েৎমিন সীমান্ত হইতে নীচের দিকে একেবারে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের কাছাকাছি নিউগিনি দ্বীপ পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ সর্দার পানিক্কর সর্ব্বপ্রথম এই বিরাট এলাকার নামকরণ করেন 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া'। কারণ, সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাস ও সাধারণ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এগুলির পরস্পরের মধ্যে মিল আছে। সেই সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধের শেষে এই অঞ্চলে প্রভূত জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হইবে এবং বৃটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদেরও সেখানে অবসান হইবে। তখন হইতে রাজনৈতিক ভূগোলে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া নামেই পরিচিত এবং এই দেশগুলি হইতেছে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ইহার সমগ্র জনসংখ্যা অন্ততঃ ৩০ কোটি এবং চাউল, চিনি, কুইনাইন, সেগুনকাঠ, রবার, টিন, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, পেট্রোল, অরণ্য এবং অন্যান্য বহু খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। এই অঞ্চলের সংগে ইদানীং ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, নেপাল ও সিংহলকে যোগ দিয়া একত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াও বলা হইয়া থাকে। কোন কোন বিদেশী লেখক দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে ইয়োরোপের বল্‌কান অঞ্চলের সংগে তুলনা দিয়াছেন এবং ইহাকে

'এশিয়ার বল্‌কান' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপের বল্‌কান অঞ্চল একদা 'ইয়োরোপের বারুদাগার' নামে পরিচিত ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থাও মাঝে মাঝে সেই বারুদাগারের লক্ষণ দেখাইতেছে।

মুস্লিম এবং ইয়োরোপীয় শক্তির অভ্যুদয়ের আগে এই দেশ ও দ্বীপ-গুলিতে বিশেষভাবে হিন্দুভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে চীন সাম্রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চলে চীনের শাসন ও রাজনৈতিক প্রভাবও প্রসারিত হইয়াছিল—বিশেষভাবে ইন্দোচীনের আন্নাম। আজও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বহুস্থানে প্রাচীন মন্দিরগাত্রে, স্মৃতি-স্তম্ভে, সামাজিক আচরণে, সংগীতে, নৃত্যকলায়, পৌরাণিক কাহিনীতে, এমনকি নামকরণে পর্যন্ত হিন্দু ভারতের প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে, এই এলাকাগুলিতে আজ পর্যন্ত বহু ধর্ম্মমতের প্রভাব ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে, যেমন—হিন্দু, বৌদ্ধ, কন্‌ফুসিয়ান, খ্রীষ্টান ও মুস্লিম। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্যের মত এখানকার সমাজজীবনও কম বিচিত্র নহে।

সমুদ্রপথে ইয়োরোপীয় অভিযান ও বাণিজ্য বিস্তৃতির যুগে শেষ পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ দেখা দিল, বলা বাহুল্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাসও তারই অন্তর্গত। ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হইল, মালয়ের সুলতানেরা ইংরেজের আশ্রিতরূপে পরাধীনতা বরণ করিল, ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ উপনিবেশিকতার গ্রাসে পড়িল, ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয়দের উপনিবেশ ছিল, তাহা ১৯০১ সালে হাত বদল করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে গেল। অর্থাৎ ইউরো-মার্কিণ শক্তিপুঞ্জ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে, উপদ্বীপে, তীরভূমিতে ও ভূভাগে এবং জলপথে যেন অক্টোপাশের মত অজস্র বাহু বিস্তার করিল। একমাত্র দূরবর্ত্তী জাপান এবং নিকটবর্ত্তী শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) এই রাহুর গ্রাস হইতে রেহাই পাইল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এখানে সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিলেও এখনও বহু জটিলতা রহিয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সেই জটিল গ্রন্থিগুলি তিক্ত সংঘর্ষ ও তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি করিতেছে। এই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (সহকর্ম্মী-রূপে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুও বটেন) আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক-রূপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নতুন ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন এবং

ভারতবর্ষের মুক্তির আশ্চর্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। টোকিও হইতে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুন এবং রেঙ্গুন হইতে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের ইম্ফল পর্যন্ত (এবং সেই সঙ্গে আন্দামান দ্বীপেও) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেই বিস্ময়কর অভিযানের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। যদি সুভাষচন্দ্র বসু আজও জীবিত থাকিতেন, তবে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাসে হয়তো আরও চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিত। হিন্দু-মুস্লিম-শিখ-খ্রীষ্টানের মিলিত অভিযানের (সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে) ফলে স্বাধীনতা লাভের জন্য হয়তো ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার প্রয়োজন হইত না এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাসে 'পাকিস্তান' নামক এক আজব সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হইত না। কিন্তু সে কথা যাউক।

* *
*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতার সর্ত্তস্বরূপ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা দাবী করা হইয়াছিল (দুই দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দই এই দাবী তুলিয়াছিলেন) এবং সেই দাবী পরলোকগত মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন বৃটেনের দাম্ভিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল কিঞ্চিৎ শ্লেষের সুরে ঘোষণা করিয়াছিলেন —"বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবা'র লালবাতি জ্বালাইবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হই নাই।" কিন্তু চার্চ্চিলের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর জীবিতকালেই যুদ্ধশেষের অনতিবিলম্বে 'সাম্রাজ্যের কারবারে 'লালবাতি' জ্বলিয়া গেল। কেবল ভারতবর্ষ নহে, ব্রহ্মদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল।

পটভূমিকার রেখাচিত্র ঃ

অবশ্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ এশিয়ার কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কোন রাজ্যকেই স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেন নাই। বরং একশ' হইতে দেড়শ' বছর ধরিয়া তাঁরা এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যকে ছলে বলে কৌশলে এবং কৌশল ব্যর্থ হইলে অসম্ভব দমননীতির নিষ্ঠুরতার দ্বারা দাবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা আর একটি দুষ্ট কৌশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতেছে 'divide and rule' নামে কুখ্যাত নীতি। অর্থাৎ

মেজরিটি ও মাইনরিটির বা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং দেশীয় রাজা ও নবাব-বাদশা বনাম প্রজাপুঞ্জ, আর 'লয়ালিস্ট' বা অনুগত এবং দেশপ্রেমিক—এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভেদবিভেদ সৃষ্টি, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, বঞ্চনা ও অনুগ্রহ বিতরণ কিম্বা দাবী ও আব্দার পালন বা প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি নানাভাবে "ডিভাইড্ এণ্ড রুল" নীতি অনুসৃত হইয়াছে। "ভাগ করো ও শাসন কায়েম রাখো"—এশিয়াতে পশ্চিমী শাসক-বর্গের এই নীতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ, যার ফলে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতা এই উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইল। মেজরিটি ও মাইনরিটির মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ ছড়াইবার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন —ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, ফিলিপাইনে ও ইন্দোচীনে বহু বিদ্রোহ, অশান্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব গিয়াছে। আজও এই সমস্ত অঞ্চলে পরিপূর্ণ জাতীয় ঐক্য এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। অবশ্য মেজরিটি-মাইনরিটির প্রশ্ন ছাড়া রাজনৈতিক মতবাদের দ্বন্দ্ব এবং পরাধীনতাসঞ্জাত জাতীয় চরিত্রের নানা দৌর্ব্বল্য ও ইহার পিছনে রহিয়াছে।

তথাপি এশিয়ার জাতীয় আন্দোলনগুলি আদর্শগতভাবে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করিতেই চাহিয়াছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এই সমস্ত জাতীয় আন্দোলন ভারতবর্ষ, মিশর (জগলুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টি) ও প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী চীনের (কুওমিণ্টাং আন্দোলন) মত এত ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর না হইলেও বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশে ও ইন্দোচীনে এই আন্দোলন কম শক্তিশালী ছিল না। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই সমস্ত আন্দোলনই প্রধানতঃ উপরের তলার শিক্ষিত বুর্জ্জোয়া শ্রেণী প্রবর্তন করিয়াছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত বুদ্ধিজীবিগণ সংবাদ-পত্রে, সাহিত্যে, বক্তৃতামঞ্চে, কাব্যে, নাটকে, সংগীতে এবং অন্যান্য নানা-ভাবে প্রচার ও পুষ্ট করিয়াছেন। ভারতবর্ষেব এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য এই দিক দিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্বত্র ভারতবর্ষের মত শক্তিশালী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখা দেন নাই কিম্বা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে ধরণের দক্ষ ভারতীয় অফিসারবৃন্দ দেখা দিয়াছিলেন কিম্বা আইনশাস্ত্রে ও চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতবর্ষের যে কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায় কিম্বা ইন্দোচীনে তার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। এদিক দিয়া ভারতে বৃটিশ শাসনের

সঙ্গে ফরাসী বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসনের মূলগত পার্থক্য ছিল। অবশ্য এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসীরা ইন্দোচীনে উত্তম ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল। রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, বন্দর, হাসপাতাল, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ইন্দোচীনের প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা ইত্যাদিতে ফরাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা ইন্দোচীনের জনজীবনকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারা যায় নাই। কারণ, শাসন ও শোষণের মূল চাবিকাঠি ছিল ফরাসীদের হাতে এবং ফরাসীরাই শাসনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ফলে, 'Self Government' এর বদলে 'Good Government'ও কার্যকরী হইল না এবং কিছুকাল পরে ফরাসীরা এই "গুড্ গভর্ণমেণ্টে"র আশা ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতাকামীদের দমন করার দিকে মন দিল। জাপানের এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণেরাই ইন্দোচীনে জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই আন্দোলন হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ফরাসীরা ইন্দোচীনের সঙ্গে 'শাসনের সহযোগিতা' বা অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করিতে চাহিল এবং এই দিক দিয়া ফরাসীরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জ্জন করিলেও ইন্দোচীনের জাতীয় কিম্বা পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন আগের মতই অব্যাহত রহিল। এমন কি, ভিতরের অবস্থা যখন আন্দোলনকারীদের নিকট অসহনীয় হইয়াছে, তখন তাঁরা বাহির হইতে—প্যারিস, ব্যাঙ্কক, হংকং, ক্যাণ্টন ও টোকিও হইতে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন।

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একাধিপত্যের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কার্য্যতঃ বাহিরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন কি কতকটা বিস্মৃত এবং অজ্ঞাতও ছিল। একমাত্র ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকদের নিকট এই অঞ্চলের যোগাযোগ বা যাতায়াত ছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আভ্যন্তরীণ চিত্র, তার সমাজজীবনের গতিবিধি এবং উত্থান-পতনের কাহিনী আমাদের অনেকের নিকট অজ্ঞাত ছিল। পশ্চিমী শাসন ও নতুন শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেক জায়গায় প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিম্বা রাজা, দলপতি অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েতি শাসন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মোটামুটি উনবিংশ শতক হইতে বিংশ শতকের প্রথম পাদ বা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অবসন্ন রূপই চোখে পড়িবে। ইন্দোচীনে তবু ফরাসী সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ওলন্দাজ শাসিত ইন্দোনেশিয়ায় দীর্ঘকাল

ইহার বালাই ছিল না। বরং ওলন্দাজেরা সেখানে ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সমাজগঠন বজায় রাখার নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। এজন্য অনেক দিন পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক শাসন প্রত্যক্ষ ছিল না। কারণ, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার কাঁচা মাল ও ঐশ্বর্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আহরণের দিকে। কোন প্রকার আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে তাদের গরজ ছিল না। বরং তারা এক ধরণের দেশীয় 'শিক্ষা' পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারেই উৎসাহ দিত। ফলে বিদ্যালয়গুলিতে কোন নতুন 'আইডিয়া' বা চিন্তার প্রবেশ ঘটে নাই। ফলে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কিম্বা তার সংগঠন দেখা দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত তারা কোন 'সাংস্কৃতিক প্রভাব' বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। এমন কি, অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি যখন পূর্ব্ব পৃথিবীতে 'সভ্যতা বিস্তারের ব্রত উদ্‌যাপনের' ভান করিত, তখন দুইশ' বছর ধরিয়া ইন্দোনেশিয়ায় তারা তেমন ভণ্ডামিটুকু পর্যন্ত করে নাই!—"For two hundred years they made no pretentions to any civilizing mission."—কারণ, ওলন্দাজদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার সম্পদ শোষণ। মনে রাখিতে হইবে ওলন্দাজদের সমগ্র জাতীয় আয়ের এক ষষ্ঠমাংশ আসিত এই উপনিবেশ হইতে।*

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের এই সুখের রাজত্ব এবং অবাধ লুণ্ঠনের দিন শেষ হইয়া গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতেই এশিয়ার অন্যত্র যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতেও তেমনি প্রবল জাতীয় আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিল। ইন্দোনেশিয়াও অনির্দিষ্ট-কাল বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল না। মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার প্যান-ইসলাম আন্দোলন ইন্দোনেশিয়ার মুস্লিম সমাজের (ইন্দোনেশিয়া মুস্লিম প্রধান) উপর প্রভাব বিস্তার করিল। মিশরের জাতীয় আন্দোলন এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ইন্দোনেশিয়াকেও আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই শতকের গোড়া হইতে বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইন্দোনেশীয় যুবকেরা দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও ধারণার আমদানি করিল। আর এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ পারস্পরিক আঘাতের দ্বারা প্রচণ্ড মার খাইল। অনেকের রাজত্ব চুরমার হইয়া গেল এবং মোটামুটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আবার

* সর্দার পানিক্কর প্রণীত "Asia and Western Dominance" গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

অন্যদিকে সোভিয়েট বিপ্লব এক নতুন দিগন্ত খুলিয়া দিল। এই অবস্থারই ঘাত-প্রতিঘাতে এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতার দাবী ধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ঘায়েল হইবার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ধরাশায়ী হইল—একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন বাস্তবে রূপায়িত করিবার পথ কিন্তু পরিষ্কার করিয়া দিল আর একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র—তার নাম জাপান। বিস্ময়ের কথা এই যে, সেদিনের ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী জাপানের জন্যই কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে ইউরো-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচিত হইল। মার্ক্সীয় ভাষায় যাহাকে "inner contradictions" অর্থাৎ 'আভ্যন্তরীণ বৈপরিত্যের দ্বন্দ্ব' বলে, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে সেই বৈপরিত্যের দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী জাপান পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধুরূপে দেখা না দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জার্ম্মানী ও ইতালীর সঙ্গে একত্রে এশিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যের বখরা জোর করিয়া আদায় করিতে চাহিল এবং এশিয়াবাসীদিগকেও "সমৃদ্ধির সহযোগিতার" জন্য লোভ দেখাইল। মার্কিণ, বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের বিস্তীর্ণ জমিদারির উপর জাপানীরা প্রচণ্ড থাবা বসাইয়া দিল এবং বিদ্যুৎগতিতে এগুলির অধিকাংশ কাড়িয়াও লইল —১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্ল হারবার হইতে ইহার স্থরু। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগষ্টে এটম বোমার আঘাতে জাপানের পতন এবং আত্মসমর্পণ ঘটিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে পশ্চাদপসরণের আগে জাপান বুদ্ধিমানের মত একটি কার্য করিল। যুদ্ধের যত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ সমস্তই ফেলিয়া রাখিয়া গেল জাতীয় আন্দোলনকারী ও স্বাধীনতা-কামীদের জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়েই তারা স্থানীয় 'দেশ-প্রেমিকদের' সহায়তা পাইল পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ফলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ জাপানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। (রণকৌশল, রণনীতি এবং অস্ত্রসম্ভারে ও যুদ্ধায়োজনেও তারা দুর্ব্বল ছিল। অধিকন্তু জাপানী আক্রমণ অত্যন্ত আকস্মিক ও অতর্কিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।) অর্থাৎ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে, উপদ্বীপে ও ভূভাগে পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতা অতি দ্রুত পরাজয় স্বীকার করিল এবং জাপান কর্তৃক সৃষ্ট এই সুযোগে স্বাধীনতাকামীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে অগ্রসর হইল। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগে কিম্বা তার আগে হইতেই (কলিকাতার রাজপথে নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে তখন হইতে যুদ্ধ

ফেরৎ ভারতীয় সৈন্যেরা জয়হিন্দ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিতে লাগিল।) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি আসন্ন হইয়া উঠিল।

ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব ঃ ব্রহ্মদেশ

১৮৮৫ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতের অংশরূপে শাসিত হইত। ফলে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ব্রহ্মদেশেও বিস্তৃত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সহযোগিতাস্বরূপ জাতীয়তাবাদীগণ 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস'-এর দাবী তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল। তখন ব্রহ্মদেশের তরুণ নেতা খ্যাতিমান আউঙ্গ সান্ ও তাঁর সহযোগিগণ জাপানীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন এবং জাপানে পালাইয়া গেলেন। পরে জাপানীদের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের সময় আউঙ্গ সান তাঁর দলবলসহ রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৃটিশ শক্তির পতনের পর জাপানীদের সঙ্গে একত্রে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই সহযোগিতা বজায় রহিল না, জাপানীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিল এবং প্রতিরোধ সুরু হইল। ব্রহ্মের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লইয়া যে 'Anti Fascist People's Freedom League' বা সংক্ষেপে 'A.F.P.F.L.' গঠিত হইল, জাপানীদের পতনের পর পুনরায় ইংরাজদের সঙ্গে তাদের লড়িতে হইল। কারণ, ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশে আবার 'সাম্রাজ্যের কারবার' খুলিবার জন্য বৃটিশ শাসনশক্তি রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন 'ফ্যাসীবিরোধী গণ-স্বাধীনতা সঙ্ঘের' এবং আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে 'পিপলস ভলাণ্টিয়ার অর্গেনাইজেশন' (P.V.O.) বা সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইলেন। বৃটিশ শক্তি তখন দুর্ব্বল এবং ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদিগণ শক্তিশালী। ফলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আউঙ্গ সানের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা ও সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীতে একটি 'সংবিধান রচনা পরিষদ' গঠিত হইল এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে সার্ব্বভৌম স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র (ইউনিয়ন অব্ বর্ম্মা) গঠনের সঙ্কল্প ঘোষিত হইল। কিন্তু জুলাই মাসে অতি অকস্মাৎ প্রধান মন্ত্রী আউঙ্গ সান্ ও তাঁর ৬ জন সহকর্ম্মী মন্ত্রী বিরোধী রাজনৈতিকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও গুলীবর্ষণে নিহত হইলেন। এই সাংঘাতিক ঘটনায় ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদীগণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। সেই হতাশা ও গোলযোগের মধ্যে আউঙ্গ সানের স্থলে উ নু প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী

নূতন স্বাধীন ব্রহ্ম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্ম হইল। (ব্রহ্মদেশের আয়তন ২,৬১,৭৮৯ বর্গমাইল এবং বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ২ কোটিরও বেশী।)

কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধিপত্রের দ্বারা যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইল কমিউনিষ্টরা তার বিরোধিতা করিলেন। এই বিরোধিতা আরও নানাদিক হইতে সুরু হইল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (P.V.O.—যারা গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়াছিল) দুই দলে বিভক্ত হইয়া 'পীতবর্ণ' ও 'শ্বেতবর্ণ' রূপে নূতন ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিল। প্রথমোক্ত দল মোটামুটি নূতন গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিলেও দ্বিতীয় দল বিরোধিতা করিতে লাগিল এবং সময় সময় কমিউনিষ্টদের সহিত সহযোগিতাও করিত। এদিকে কমিউনিষ্টরাও আবার 'লাল পতাকা' ও 'সাদা পতাকা' দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু উভয় দলই পাহাড় জঙ্গল ও গ্রাম্য অঞ্চল হইতে নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ চালাইতে লাগিল। আরও মুস্কিল বাধাইল কয়েকটি অ-বর্ম্মী জাতি, যেমন, কারেন, কাচিন, কয়া ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকে এবং বিশেষভাবে কারেনগণও সশস্ত্র বিদ্রোহ করিল। অধিকন্তু ফরমোজা দ্বীপে পলায়িত চিয়াংকাইসেকের উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যেরা চীনের য়ুনান প্রদেশ হইতে উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলে হানা দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'এ. এফ. পি. এফ. এল' বা ফ্যাসিবিরোধী সঙ্ঘের মধ্যে নানা মতভেদ ও বিচ্ছেদ দেখা দিল এবং কার্যতঃ ১৯৬০ সালে এই প্রতিষ্ঠানও দুই দলে ভাগ হইয়া গেল।

অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের পর ব্রহ্মদেশ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংঘর্ষে, কমিউনিষ্ট ও কাচিন বিদ্রোহে নিদারুণ বিপর্যস্ত হইল। এক সময় অবস্থা এমন খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বাহ্যতঃ রেঙ্গুনের সীমানার বাহিরে কার্যকরী ছিল না। অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় ছিল। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশের অর্থনীতির বনিয়াদস্বরূপ খনিজ সম্পদ, সুবিখ্যাত সেগুন কাঠ ও বৃক্ষের অরণ্যএবং শস্যসম্পদ (পৃথিবীতে চাউলের সবচেয়ে বড় রপ্তানীকারক ছিল ব্রহ্মদেশ) প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত ১৪ বছর ধরিয়া ব্রহ্মদেশ এই সমস্ত প্রচণ্ড বিঘ্ন ও বিপদের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়িতেছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এই দুঃসময়ে উ নুর নেতৃত্ব ব্রহ্মদেশকে শক্তি ও যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়াছে। কিন্তু অন্তর্বিরোধের জন্য 'উ নু'র সমাজতন্ত্রবাদী গবর্ণমেণ্টও তাল সামলাইতে পারেন নাই। ফলে; প্রধান সেনাপতি জেনারেল নে উইন্ ১৯৫৮, অক্টোবর হইতে ১৯৬০, ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন এবং ১৯৬২ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি পুনরায় শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়া ঃ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়া বা ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী। তিন হাজার দ্বীপ লইয়া গঠিত ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জও বটে। ইহার আয়তন ৭,৩৫,৮৬৫ বর্গমাইল এবং বর্ত্তমানে ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও এবং সেলিবিস—এই চারটি দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং জাভা দ্বীপ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ স্থানগুলির অন্যতম—প্রতি বর্গমাইলে হাজার লোকের বসতি। এশিয়া মহাদেশের ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া ইউরোপীয় চিত্ত ষোড়শ শতাব্দী হইতেই লোভাতুর হইয়াছিল এবং তখন পর্তু‌গীজরা মশলার সন্ধানে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে আসিয়া হাজির হয় এবং কোন কোন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর বৃটিশ ও ডাচ বা ওলন্দাজরা (১৫৯৫ খৃঃ) তাদের তাড়াইয়া দেয়। আবার ওলন্দাজরা শেষ পর্যন্ত ইংরাজদেরও বিতাড়িত করে এবং এভাবে ১৬০২ খৃঃ হইতে নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই 'পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' দখল করিয়া বসে এবং প্রায় দুই শ' বছর ইন্দোনেশিয়ার উপর শাসন চালায়। তারপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী উঠিয়া গেলে নেদারল্যাণ্ডস্ বা হল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহার শাসনভার গ্রহণ করে। এজন্য এই অঞ্চল ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ নামে পরিচিত ছিল।

পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের ধাক্কায় রাজ্য, সাম্রাজ্য, উপনিবেশ কাঁপিয়া গেলেও ইউরোপীয় ধনিক ও বণিকের দল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সুবিশাল সম্পত্তি হাত ছাড়া করিতে রাজী ছিল না। এই জন্যই ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়াতে সবচেয়ে বেশী সংঘাত হইয়াছে এবং আজও ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তীব্র বিরোধ চলিতেছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, উনিশ শতক পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় আধুনিক ভাবধারা প্রবেশ করে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালে যে জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, ওলন্দাজেরা সেই আন্দোলনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং কোন প্রকার স্বায়ত্ত শাসনও প্রবর্ত্তন করে নাই। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই দ্বীপপুঞ্জের উপর জাপানীদের আক্রমণ এবং ওলন্দাজ শক্তির পতন ঘটিলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পরাজিত জাপানীরা যখন ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাদের পরিত্যক্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ইন্দোনেশীয়দের হাতে আসে এবং এই

অস্ত্রের দ্বারা তাঁরা ওলন্দাজদের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখ খ্যাতিমান জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ আমেদ সুকর্ণ এবং মহম্মদ হাতা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সেই সময় ওলন্দাজদের শক্তি ছিল দুর্ব্বল এবং তাদের পক্ষে 'একক' প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। অতএব তারা অপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেনের শরণ নিল। জাভা পুনর্দখলের জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাপানের শূন্য স্থানে বৃটিশ সৈন্যেরা আসিয়া হাজির হইল, তখন ইন্দোনেশীয় 'স্বাধীন' রিপাব্লিক কার্যকরীভাবে শাসন সুরু করিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক এই স্বাধীন সরকারকে আংশিক স্বীকৃতি দিলেন। ফলে, ওলন্দাজেরা ক্রুদ্ধ হইল। কারণ, তাদের বিশাল সাম্রাজ্য এভাবে হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। এদিকে বৃটিশ বাহিনীর ইংরাজ সৈন্যসংখ্যা ছিল সামান্য এবং বেশীর ভাগই ছিল ভারতীয়। তখন ভারতবর্ষেও ইংরাজের অবস্থা সঙ্গীণ হইতে সুরু করিয়াছে। সুতরাং বৃটিশ সেনাপতি বুদ্ধিমানের মত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে নতুন ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিলেন না—যদিও তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন ওলন্দাজদের জন্য দেশটা পুনর্দখল করিতে। এই অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে কিছুকাল আলোচনা চলিল এবং ক্রুদ্ধ ওলন্দাজেরা ধৈর্য হারাইয়া ইন্দোনেশিয়া পুনর্দখলের জন্য "পুলিশী অভিযান" চালাইল। ফলে, হুলুস্থুল পড়িয়া গেল এবং ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সিকিউরিটি কাউন্সিলে নালিশ দায়ের করিল। ইহার ফলে ১৯৪৮-এর ১৭ই জানুয়ারী দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাতেও নিরস্ত হইল না। ডিসেম্বর মাসে তারা সেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি অস্বীকার করিল এবং রিপাব্লিকান্ নেতাদের বন্দী করিয়া পুনরায় 'পুলিশী অভিযান' চালাইল। এই দ্বিতীয়বার অভিযানের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিচলিত হইল এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে আগাইয়া আসিল। কারণ, ১৯৪৮'এর সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিক কমিউনিষ্টদের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। এজন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট প্রসন্ন হইলেন। এভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আমেরিকার চাপে পড়িয়া ওলন্দাজ সরকার নতি স্বীকার করেন এবং ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে হেগ্ নগরীতে উভয়-পক্ষের এক সম্মেলনে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্র অনুসারে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট একমাত্র 'ওলন্দাজ নিউগিনি'র অংশ ছাড়া আর বাকী

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। ‘ওলন্দাজ নিউগিনির’ পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে এই মর্ম্মে চুক্তি হইয়াছিল যে, এক বছরের মধ্যে ইরিয়ানের রাষ্ট্রিক সত্তা সম্পর্কে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর ১৯৬২ সালের মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হইল, আজও পশ্চিম ইরিয়ানের সমস্যা মিটিল না। গোয়া যেমন ভারতবর্ষের প্রাপ্য ছিল, ইরিয়ানও তেমনি ইন্দোনেশিয়ার প্রাপ্য। কিন্তু পর্তুগীজদের মত ওলন্দাজেরাও সেই অধিকার ছাড়িতে রাজী নয়।

১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হইল। উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়ন গঠিত হইল বটে, কিন্তু ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দোনেশিয়া এই ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেয় এবং আগষ্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের নিকট তাদের ঋণ অস্বীকার ও বাতিল করেন। (ওলন্দাজদের দাবী অনুসারে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০৮ কোটি ১০ লক্ষ গিল্ডার বা ৫৪১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) কিন্তু ইন্দোনেশীয়দের মতে এই টাকার অধিকাংশই ওলন্দাজেরা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিয়াছে। অতএব উল্টা ইন্দোনেশীয়দেরই ওলন্দাজদের নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে। পশ্চিম নিউগিনি বা পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া বিরোধের ইহাই পরিণতি। ১১৫৭ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া আপোষ মীমাংসার একটি প্রস্তাব বাতিল করিলে ইন্দোনেশীয় গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশিয়াস্থিত ওলন্দাজদের সমস্ত সম্পত্তি—বিভিন্ন বাগিচা, জাহাজী ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন-কেন্দ্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ইহার মোট মূল্য অন্ততঃ এক হাজার কোটি ডলারের বেশী হইবে! ৪৬ হাজার ওলন্দাজ (১৯৫৭ সালে ৬০ হাজার ওলন্দাজ ছিল) ইন্দোনেশিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

শত শত বছর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের পরিণাম এরূপ হইতেই বাধ্য। আজ ইন্দোনেশিয়ায় পশ্চিমীদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ এবং যতদিন পশ্চিম ইরিয়ান (যেখানে গেরিলা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে) ওলন্দাজদের কবলমুক্ত না হইবে, ততদিন এই বিদ্বেষ সম্পূর্ণ দূর হইবে না।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সঙ্কট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণ মোটেই ‘সুখের রাজত্ব’ চালাইতে পারিতেছেন না। অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক ও মতবাদের সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। কোন কোন সময় কমিউনিষ্টদের সংগে যেমন সহযোগীতা ঘটিয়াছে, তেমনি বিরোধীতাও চলিয়াছে প্রচুর। 'দারুল ইসলাম' নামে এক নিদারুণ গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমানদের সংগঠন প্রায়শঃ হাঙ্গামা ও সংঘর্ষ বাধাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ সুমাত্রায় সৈন্যদলেরও এক প্রকাণ্ড বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং অনেকের অনুমান ইহার পিছনে কোন কোন বৈদেশিক শক্তির প্ররোচনা ছিল। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৬০ সালে একটি অষ্টম বার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে এবং ১৯৬১।১৯৬৯ সালের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ হইবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার চিত্র উজ্জ্বল নহে।

ইন্দোচীন ঃ

ঔপনিবেশিকতাবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বেলজিয়ান্ (আফ্রিকায়) ওলন্দাজ ও ফরাসীরাই নিকৃষ্টতম। ফরাসীদের জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ যেমন আজও (১৯৬২, জুন) আলজেরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া দেখা যাইতেছে, তেমনি ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ইন্দোচীনেও প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া মহাদেশের আর কোন উপনিবেশে এত দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও যুদ্ধ দেখা দেয় নাই। আজও কমিউনিজমের নাম করিয়া সেখানে লাওসের বিরোধ চলিতেছে। কিন্তু মহাযুদ্ধের আগে ইন্দোচীনে ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদ প্রধানতঃ দুই প্রকারের ছিল, যেমন, প্রথমতঃ সর্বগ্রাসী ঔপনিবেশিক শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাক্তন বৃটিশ ভারতীয় নেটিভ্ ষ্টেট্ বা দেশীয় রাজ্যগুলির মত আশ্রিত রাজ্যের সৃষ্টি। কোচিন-চীন পুরাপুরি ঔপনিবেশিক শাসনে, আর বাকী অংশ টঙ্কিন্, আন্নাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস ছিল আশ্রিত রাজ্যের মত। এগুলির মধ্যে আন্নাম ছিল সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ও সম্পদশালী দেশ এবং রাজনৈতিক চেতনায়ও তারা বাকীগুলির চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল। অবশ্য সমগ্র ইন্দোচীনেই কমবেশী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল এবং এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এশিয়ার অন্যত্র যেমন, তেমনি ইন্দোচীনেও সোভিয়েট বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ফলে, ১৯৩০ সালে ইন্দোচীন কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হইল এবং আধুনিক কালের স্বনামধন্য কমিউনিষ্ট নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের (ভিয়েৎমিন) স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য একটি লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই লীগের প্রাণকেন্দ্রে ছিল কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব, যদিও তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল একান্তরূপে জাতীয়তা-

বাদী স্বাধীনতা আন্দোলন। ইন্দোনেশিয়ার মত এখানেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে জাপানীদের অনুপ্রবেশ ঘটিল এবং ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে জাপানীরা ফরাসী শাসনকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করিয়া ফেলিল এবং তারপর আন্নামের 'সম্রাট' বাও দাইকে 'স্বাধীন' ভিয়েৎনামের প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিল। অনুরূপভাবে কাম্বোডিয়া এবং লাওসের (লুয়াঙ্ প্রবঙ্) রাজাদিগকেও স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাইল ভিয়েৎমিনের স্বাধীনতা যোদ্ধারা। জাপানীদের পরাজয় ও ইন্দোচীনে তাদের শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েৎমিনের শক্তিশালী প্রতিরোধকারী দল (জাপানী দখলদারির সময় ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য বিপ্লববাদীদেরও গুপ্ত সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল।) ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে 'সম্রাট' বাও দাইয়ের কর্তৃত্বকে নস্যাৎ করিল এবং তাঁর 'রাজত্বের' অবসান ঘটাইয়া স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। হো চো-মিন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্টরূপে ঘোষিত হইলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা সমস্যা মিটিল না, বরং সমগ্র ইন্দোচীনের অবস্থা ঘোরালো ও জটিল হইয়া উঠিল। কারণ, তখন মিত্রশক্তিবর্গ (যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইসেকের চীনও ছিল) জার্ম্মেণীর পটস্‌ডামে* স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে চীনা সৈন্যদিগকে ইন্দোচীনের উত্তরাংশ এবং বৃটিশ সৈন্যদিগকে দক্ষিণাংশ দখল করিতে দিলেন—১৬নং অক্ষরেখায় এই দুই অংশের সীমানা বিভক্ত ছিল। উত্তরের চীনা কর্ত্তৃপক্ষেরা গোড়ার দিকে ভিয়েৎমিনে হো-চি-মিনের শাসন কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন এবং ফরাসীদের পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ দিকের বৃটিশ সেনাপতি বিপরীত পথ ধরিলেন, তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে হো-চি-মিনের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। বন্দী ফরাসীদিগকে কেবল মুক্তিই দিলেন না, তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রও দিলেন। এবং ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে একজন নবনিযুক্ত ফরাসী হাইকমিশনারের হাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। আর উত্তর দিকের চীনা কর্ত্তৃপক্ষও তাঁদের আগেকার নীতি পাল্টাইয়া ফেলিলেন এবং ফরাসীদের অনুকূলে উত্তর ভিয়েৎমিন ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এভাবে ইন্দোচীনের সঙ্কটকাল সুরু হইল। কারণ, ফরাসীরা তাদের

* ১৯৪৫ 'এর জুলাই-আগষ্টে ষ্ট্যালিন, ট্রুম্যান ও চার্চ্চিল এবং চার্চ্চিলের পর এ্যাটলি—এই তিন রাষ্ট্রপ্রধান এক ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যুদ্ধের পরবর্ত্তী পৃথিবী সম্পর্কে।

এই বিশাল জমিদারি পরিত্যাগ সম্পর্কে কোন আপোষরফা করিতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং সংঘর্ষ সুরু হইল। ভিয়েৎমিন ও ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে কিছুকাল লড়াইয়ের পর ফরাসীরা বাহ্যতঃ আপোষরফার ভঙ্গী দেখাইল এবং ১৯৪১-এর মার্চ্চ মাসে এই মর্ম্মে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করিল যে, ভিয়েৎনাম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্র হইবে এবং উহা ফরাসী ইউনিয়নের* অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ইন্দোচীন ফেডারেশনের অংশস্বরূপ হইবে। আর চুক্তির অন্যান্য বিস্তৃত বিষয় পরে আলোচিত হইবে। কার্যতঃ এই চুক্তি ছিল ফরাসীদের পক্ষে সময় হরণের কৌশলমাত্র—যাহাতে নূতন নূতন ফরাসী সৈন্য ইন্দোচীনে আমদানি ও সমাবেশ করা যায়। সুতরাং পর পর কয়েকটি নিস্ফল আলোচনা বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল। আপোষরফার জন্য প্যারিসের সরকারী মহলে যেটুকু উদারতা মাঝে মাঝে দেখা যাইত, স্থানীয়, অর্থাৎ ইন্দোচীনস্থিত ফরাসী "কলোন"গণ (যেমন আলজিরিয়ায়) তাহাও নস্যাৎ করিয়া দিত। এদিকে ভিয়েৎনামীদের যতই সন্দেহ ও সংশয় বাড়িতে লাগিল, অন্যদিকে ততই আলোচনার আড়াল ধরিয়া ফরাসী সৈন্যদের আগমন ঘটিতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে টঙ্‌কিনে (মধ্য ভিয়েৎমিন) উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সুরু হইল এবং সেই যুদ্ধ অন্ততঃ সাড়ে সাত বছর ধরিয়া চলিল।

ইন্দোচীনে ফরাসীদের এই রক্তক্ষয়ী ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চলিবার সময় এশিয়া মহাদেশে আরও দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ হইল। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৪৯ সালে সমগ্র মহাচীন চিয়াং কাইসেকের কবল হইতে মুক্ত করিল এবং ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফলে, কমিউনিষ্ট এবং বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট চীনের আরও অগ্রগতির আশঙ্কায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী মহলে এবং বিশেষভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিল। সুতরাং একদিকে ইন্দোচীনের মডারেটপন্থী ও ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতাকামী জাতীয়তাবাদীদের হাত করিবার চেষ্টা হইল পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের লোভ দেখাইয়া এবং অন্য দিকে 'চরমপন্থী' ভিয়েৎনামীদের জব্দ করিবার জন্য ক্ষীয়মাণ ফরাসী শক্তির সাহায্যার্থ আমেরিকা আগাইয়া আসিল। ১৯৪৯ সালে ফরাসীরা আন্নামের সেই প্রাক্তন 'সম্রাট' বাও দাইকে পুনরায় দাঁড় করাইয়া একটি ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র খাড়া করিলেন এবং

* 'French Union'—ফ্রান্সের এই নবতম রাষ্ট্ররূপ সমুদ্র পারের রাজ্য ও উপনিবেশ-গুলিকে ফ্রান্সের অংশরূপে ঘোষণা করিয়া ঐগুলিকে হাতে রাখারই আইনগত কূটনীতির কৌশলমাত্র।

ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস—এই তিনটি স্বতন্ত্র ও 'স্বাধীন' রাজ্য ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত 'এসোসিয়েটেড্ ষ্টেটস্'-রূপে ঘোষিত হইল। কিন্তু বৃটেনের দ্বিধাগ্রস্ত সমর্থন (ইন্দোচীনে ফরাসীদের যুদ্ধ কিম্বা আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রস্তাব ইংরাজদের পছন্দসই ছিল না) এবং আমেরিকার পুরাপুরি সাহায্য (প্রকাশ যে, এই যুদ্ধে ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় একা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জোগাইয়াছে !) সত্ত্বেও ফরাসীরা জয়লাভ করিতে পারিতেছিল না, যদিও অনেকগুলি শহর তাদের দখলে ছিল। বরং ধনেজনে ফ্রান্সের ক্ষয় ও রক্তপাত অবর্ণনীয় ছিল। অবশেষে হ্যানয় হইতে ১৮০ মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসী শক্তির পতন ঘটিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে ইহা ঘটিল। তখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদিগণের কানে জল ঢুকিল। বৃহৎ শক্তিবর্গ জেনেভায় এক সম্মেলনে মিলিত হইলেন এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নতি স্বীকার করিলেন। ১৯৫৪ সালের ২০শে জুলাই ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েৎনামীদের যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির ফলে কার্য্যতঃ উত্তর ও দক্ষিণে ১৭ তম অক্ষরেখায় বিভক্ত দুইটি স্বাধীন ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল, 'সম্রাট' বাও দাই পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইলেন। ফরাসীরাও আর তাঁর পক্ষ সমর্থন করিলেন না। যুদ্ধবিরতির সর্ত্তগুলি পর্য্যবেক্ষণের জন্য ভারতবর্ষ (চেয়ারম্যান), কানাডা ও পোল্যাণ্ডকে লইয়া একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হইল। কথা ছিল এই আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে মিলিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা হয় নাই। অন্য দিকে লাওস রাজ্যের 'প্যাথেট লাও' (যার অর্থ 'দেশপ্রেমিক লাও') সংগঠনের আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের সংঘর্ষ চলিয়াছে বহুদিন—১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত।*

এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'ফরাসী' ইন্দোচীন বলিতে আমরা যে একটি অখণ্ড রাজ্য বুঝিতাম, আসলে তাহা নহে। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াই আমাদের নিকট প্রায় অপরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সবিস্ময়ে প্রথম শুনিল যে, ইন্দোচীনে তিনটি স্বতন্ত্র ও পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম এবং শেষেরটি আবার দুই অংশে বিভক্ত—উত্তরে হো-চি-মিনের কমিউনিষ্ট

* এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সমস্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষ পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। —লেখক

প্রধান রাষ্ট্র, আর দক্ষিণে নগো দিন দিয়েমের মার্কিণ-আশ্রিত রাজ্য। সুতরাং ইন্দোচীনে স্বাধীন রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়াইল চারটি। কেবল রাজ্য সংখ্যাই নহে, বহু জাতি, অধিজাতি, উপজাতি এবং নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের এখানে সমাবেশ।

ইহার মধ্যে কাম্বোডিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র, যাঁর রাজা ও রাজ্যপ্রধান হইতেছেন নরোদম সিহানোক। ১৯৫৩ সালের ৯ই নভেম্বর কাম্বোডিয়া ফরাসী ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার আয়তন ৮৮ হাজার ৭৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষের উপর।

কাম্বোডিয়ার মত লাওস রাজ্যটিও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অন্তর্গত এবং লুয়াঙ্ প্রবঙ রাজবংশের দ্বারা শাসিত। রাজার নাম শ্রীসভং ভঘানা। ইহার আয়তন ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের উপর। এখানে কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট বিরোধী দীর্ঘ বিরোধের পর লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য গত ১১ই জুন (১৯৬২) স্থির হইয়াছে যে, লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইবে এবং এই সরকারের নেতৃত্ব করিবেন নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভান্না ফুমা এবং সহযোগিতা করিবেন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা প্রিন্স বুন উম ও কমিউনিষ্ট সমর্থক প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানুভং। এই তিন প্রিন্স বা রাজপুত্রই লাওসের রাজবংশের সন্তান।

অখণ্ড ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের, যাহা আগেকার টঙ্কিন, আন্নাম ও কোচিন-চীন লইয়া গঠিত, মোট আয়তন ১ লক্ষ ২৭ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ২ কোটি ৯০ লক্ষ। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের (রাজধানী সায়গন) আয়তন ৬৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। মধ্য ভিয়েৎনামের দক্ষিণবর্ত্তী ১৫টি প্রদেশ এবং একেবারে দক্ষিণের ২৩টি প্রদেশ লইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গঠিত।

উত্তর ভিয়েৎনাম (রাজধানী হ্যানয়) উত্তরের ২৯টি প্রদেশ এবং মধ্য ভিয়েৎনামের উত্তরবর্ত্তী ৪টি প্রদেশ লইয়া গঠিত, আয়তন ৬২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ।

ইন্দোচীনের রাজ্যগুলিতে প্রচুর সংখ্যক চীনাদের বাস এবং এককালে চীন সাম্রাজ্যের প্রভূত আধিপত্য ছিল এখানে। চীন সাম্রাজ্যের পতনের পর বিদেশীদের ঔপনিবেশিক শাসন এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

থাইল্যাণ্ড ঃ

প্রাচীন কাল হইতে শ্যামদেশরূপে পরিচিত এই রাজ্যটি ১৯৩৯ সালে থাই জাতিদের বাসভূমি হিসাবে সরকারীভাবে থাইল্যাণ্ড নাম ধারণ করে। ইদানীং এই দেশটির সঙ্গে বহির্জগতের প্রভূত পরিচয় ঘটিয়াছে (রাজনৈতিক ও রণনৈতিক প্রশ্ন ছাড়াও) ইহার সুবিখ্যাত বিমানবন্দর ব্যাঙ্ককের জন্য, যাহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বাধুনিক শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কেন্দ্র। ইহার আয়তন ২ লক্ষ ১৪৮ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৫ লক্ষ। বলা বাহুল্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মত এই দেশটিও ছবির মত সুন্দর, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-মণ্ডিত, মন্দির-শোভিত এবং কাঁচামালের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। সুতরাং পশ্চিমীদের লোভাতুর দৃষ্টি এখানেও পড়িয়াছিল। তবে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের মত ইহা সাম্রাজ্য-বাদের দ্বারা পূর্ণ কবলিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, এই অঞ্চলে বৃটিশ ও ফরাসী শক্তির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইন্দোচীন, মালয় ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটি 'বাফার্ ষ্টেট্' বা মধ্যবর্ত্তী নিরপেক্ষ রাজ্য গড়িয়া তোলার চেষ্টা। যত দিন পর্যন্ত চীন-সাম্রাজ্য শক্তিমান ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছিল, ততদিন পশ্চিমী শক্তিরা এখানে সুবিধা করিতে পারে নাই। সুতরাং সপ্তদশ শতকে ফরাসীদের প্রথম আক্রমণ চেষ্টা এখানে সফল হয় নাই। কিন্তু চীন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যত্র যখন ঊনবিংশ শতকের বৃটিশ, ফরাজী ও ওলন্দাজ প্রভৃতির সাম্রাজ্যবাদ শাসনের মধ্যে বিস্তার-লাভ করিল, তখন শ্যামদেশকে লইয়াও টানাটানি পড়িল। ফ্রান্স ইন্দোচীন ও মেকং নদীর অপর তীর হইতে এবং বৃটেন মালয় হইতে (কোন কোন সময় ব্রহ্মদেশ হইতেও) শ্যামের বিভিন্ন সীমান্তবর্ত্তী অংশের উপর থাবা মারিতে লাগিল। এমন কি, কিছু কিছু অঞ্চল ফ্রান্সের দখলেও গেল এবং এক সময় ফ্রান্সকে ও ফরাসী আশ্রিত চীনা নাগরিকদিগকে পর্যন্ত 'রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার' দিতে হইল। তথাপি ফ্রান্স একদিকে বৃটেনের বিরোধিতার জন্য (শ্যামকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফরাসী শক্তি ব্রহ্মদেশের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিবে, বৃটেনের তাহা আদৌ ইচ্ছা ছিল না) এবং অন্যদিকে রাজা চুলালঙ্কর্ণের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির জন্য শ্যামদেশকে অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু রাজ্যবিস্তারকামী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির নিকট শ্যামের বিপদ সর্ব্বদাই ছিল। কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্ণে এই দুই শক্তি পারস্পরিক চক্রান্তের দ্বারা শ্যামের দক্ষিণ ও উত্তরবর্ত্তী অংশে ২৫ হাজার বর্গমাইল ভূমি কাড়িয়া লইল। অবশ্য

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বৃটেন ও ফ্রান্স এই জবরদখল জমি হজম করিতে পারে নাই। মহাযুদ্ধের সুযোগে শ্যাম নিজের ঘর গুছাইয়া লইল এবং শেষের দিকে ১৯১৭ সালে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়ও যোগ দিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালটায় প্রাচীন রাজতন্ত্র শাসিত শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডে বহু উঠানামা গিয়াছে। মহাযুদ্ধের পরেও রাজা, শাসনতন্ত্র ও পার্লামেণ্ট লইয়া অনেক বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে থাইল্যাণ্ড দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের মিত্র ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বা ১৯৪৬ সাল হইতে বর্ত্তমান ১৯৬২ সাল পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের কখনও সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থা ছিল না। আজও ইহা মিলিটারি একনায়কতন্ত্রের অন্তর্গত এবং পশ্চিমী যুদ্ধশিবিরের সহযোগী। থাইল্যাণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার কিম্বা ইংরেজীতে যাহাকে সংক্ষেপে 'সীয়াটো' বলে, তার কেবলমাত্র অংশীদার নয়, প্রকৃতপক্ষে রাজধানী ব্যাঙ্ককে এই সামরিক সংস্থার প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সাম্যবাদ প্রতিরোধের নাম করিয়াই এই সমস্ত ঘটিতেছে। কার্যতঃ পাকিস্থানের মত থাইল্যাণ্ডও আমেরিকার কুক্ষিগত হইয়াছে। তবে, থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনাও সামান্য। রাজনৈতিক কাণ্ড-কারখানা ও অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সংঘাত লইয়া এখানকার যুবক সমাজ ও জনসাধারণ তেমন মাথা ঘামায় না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে মালয় ও সিঙ্গাপুরের (থাইল্যাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে ব্রহ্মদেশ ও অন্য দিকে মালয়ের সঙ্গে একান্তরূপে সংযোজিত) মত থাইল্যাণ্ডের অর্থ নৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। সম্ভবতঃ এই কারণেই এখানে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতি লইয়া কোন বৃহৎ সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে, দেশটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পশ্চিমী ঘেঁষা ও আধুনিক প্রগতিশীলতার বিরোধী।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ঃ

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ১৫২১ খৃষ্টাব্দে। পর্ত্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান এই আবিষ্কারের গৌরবভাগী, কিন্তু ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেন ইহা দখল করিয়া লয়। কিন্তু স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের ফলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর উহা আমেরিকার হস্তগত হয় একটি সন্ধিচুক্তির দ্বারা। উহার দুই বছর আগে ১৮৯৬ সালে ফিলিপিনোরা নিজেদের দেশকে একটি সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপরও দীর্ঘকাল ধরিয়া

ফিলিপিনোগণ মার্কিণী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকে। তখন মার্কিণ গণতন্ত্রবাদীদের প্রভাবে একমাত্র দেশরক্ষা ও সামরিক ঘাঁটি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে ফিলিপিনোদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সময় এক বিশেষ আইনবলে দশ বছর মেয়াদ অন্তে ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৯৩৫ সালেই একটি প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হইল। কিন্তু প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যাপারে ফিলিপাইন আগের মতই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৯৯ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছে।

অসংখ্য দ্বীপ লইয়া (ছোট বড় মিলাইয়া প্রায় ৭ হাজার!) ফিলিপাইন গঠিত। তবে, অধিকাংশ দ্বীপই অকেজো এবং নামহীন। মাত্র ১১টি বৃহৎ দ্বীপ এগুলির মধ্যে প্রধান এবং এই দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতটবর্ত্তী রেখার মোট দৈর্ঘ্য ১৪ হাজার ৪০৭ মাইল। কিন্তু আগ্নেয়গিরি ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এই দ্বীপপুঞ্জে রহিয়াছে। ম্যানিলা উপসাগরে দূরপ্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয় রহিয়াছে এবং বর্তমানে রাজধানী ম্যানিলা মার্কিণ প্রভাবিত ও পুষ্ট একটি আধুনিক ঝলমলে শহর!

ফিলিপাইনের মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭০৭ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ ১২ হাজার অর্থাৎ বাসযোগ্য স্থলভাগের প্রতি বর্গমাইলে ২১১ জনের বাস। প্রশান্ত মহাসাগরের বিখ্যাত মার্কিণ নৌঘাঁটি পার্ল হারবারের মত এখানেও একসঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানীদের আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণরূপে জাপানীদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল। মার্কিণ জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার এখানকার প্রতিরোধ ও পাল্টা-আক্রমণের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে পরাজিত জাপানের প্রধান প্রশাসক হইয়াছিলেন।

জাপানী দখলদারির বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্য হইতে যে প্রতিরোধবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যারা স্থানীয় ভাষায় "হুকবলাহাপ" নামে পরিচিত, স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও ফিলিপাইনে তাদের শক্তি কম ছিল না। তখন ইহারা কমিউনিষ্ট গেরিলা কিম্বা কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদী নামে অভিহিত ছিল। ফিলিপাইনের সরকারের সঙ্গে ইহাদের প্রভূত সংঘর্ষ গিয়াছে, যেমন—মালয়ে, ব্রহ্মদেশে ও ইন্দোচীন ইত্যাদিতে। আপাততঃ ইহারা দমিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ফিলিপাইন একান্তরূপে পশ্চিমী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত।

মালয় উপদ্বীপ ঃ

সিঙ্গাপুরসহ মালয় উপদ্বীপ আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিচিত। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের সীমান্তবর্ত্তী এই উপদ্বীপ যেন লম্বা একটি লাউয়ের মত (মানচিত্র অনুসারে) উপকূলভাগের মাচা হইতে নীচে সমুদ্রের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তার সঙ্গে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপকে কে যেন অবহেলায় পুরানো কাঠের ভেলার মত জলের বুকে ফেলিয়া রাখিয়াছে! বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া সিঙ্গাপুরের পৃথিবী বিখ্যাত নৌতুর্গ এবং মালয়ের রবার ও টিনের ঐশ্বর্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ ও শক্তিরূপে প্রচারিত ছিল। ১৮১৮ সালে স্যার ষ্টান্‌ফোর্ড র‍্যাফলার নামক জনৈক ইংরাজ ম্যালেরিয়া কবলিত দ্বীপে যখন সিঙ্গাপুর সহরের পত্তন করেন, তখন বোধ হয় তিনি কল্পনাও করেন নাই যে, একদা এই ক্ষুদ্র শহরটি ছুই মহাসমুদ্রের (ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর) 'অপরাজেয়' ত্তুর্গদ্বাররূপে খ্যাতি লাভ করিবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে নির্ম্মিত এই 'অজেয়' ত্তুর্গ ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানীদের অতর্কিত আক্রমণ ও বিস্ময়কর রণকৌশলের একটিমাত্র আঘাতেই ধরাশায়ী হইবে। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সামরিক ও নৌবলের প্রেষ্টিজ্‌ প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল এই সিঙ্গাপুরে এবংমালয় উপদ্বীপে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই দ্বীপ ও উপদ্বীপের রাজনৈতিক বিভাগ ছিল এইরূপ ঃ

'The Straits Settlements of Penang, Singapore and Malacca; the Federated States of Perak, Selangor, Negri Sembilan and Pahang; and the Unfederated States of Kelantan, Trengganu, Kedah, Perlis and Johore. The nine states were ruled by Sultans under British protection'

নৌঘাঁটি ও নৌতুর্গরূপে সিঙ্গাপুর প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল। কিন্তু বাকী মালয় উপদ্বীপ বৃটিশ আশ্রিতরূপে দেশীয় সুলতানদের (৯ জনের অধীনে ৯টি রাজ্য) শাসিত ছিল, যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করিত বৃটিশ বণিকবৃন্দ এবং তাদের সহযোগী স্থানীয় ধনিকগণ।

জাপানী সামরিক শক্তির পতনের আগে মালয়ের চীনাদের (যাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ) মধ্য হইতে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল এই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি এই

সমস্ত সংগঠনের মূলে ছিল কমিউনিষ্টরা। এই সংগঠনের নাম ছিল 'Malayan People's Anti Japanese Army' কিম্বা 'জাপ-বিরোধী মালয়ী গণসৈন্য'! জাপানীদের আত্মসমর্পণ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর অন্যান্য দেশের মত এই সমস্ত দ্বীপ উপদ্বীপেরও স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠে। এবং এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে "মালয়ী গণসৈন্য" কিম্বা কমিউনিষ্টদের (যাদের প্রায় সকলেই ছিল মালয়ের চীনা নাগরিক) সংগঠন বছরের পর বছর ধরিয়া দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ চালাইয়াছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে। মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া কমিউনিষ্টরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল এবং সেই সময় ইংরেজরাই জাপানীদের বিরুদ্ধে ইহাদের সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু জাপানের পতনের পর যখন মালয়ের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব ছিল না, তখন মালয়ের জঙ্গল হইতে কমিউনিষ্টরা গেরিলা যুদ্ধের এবং সন্ত্রাসবাদীয় লড়াইয়ের রণকৌশলে বিশেষ 'খ্যাতি' অর্জন করিয়াছিল। মালয়ের বিখ্যাত অরণ্য এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা কমিউনিষ্টদের খুব কাজে লাগিয়াছিল।

অবশেষে স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ইত্যাদি লইয়া বহু আন্দোলন ও আলোড়নের পর ১৯৫৭ সালের ৩১শে আগষ্ট 'স্বাধীন মালয় ফেডারেশন' জন্মলাভ করে। এই উপদ্বীপের আয়তন ৫০ হাজার ৭ শত বর্গমাইল। বর্ত্তমানে (১৯৫৯ সালের হিসাব) ইহার লোকসংখ্যা ৬৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৫১ জন। ইহার মধ্যে মালয়ীদের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার, আর চীনাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ২০ হাজার এবং ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ও অন্যান্য ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫৩৬ জন। অর্থাৎ তিনটি প্রধান জাতিগোষ্ঠী লইয়া এখানকার সমাজ গঠিত—মালয়ী, চীনা এবং ভারতীয় (পাকিস্থানী সহ)। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও সংখ্যাগত আধিপত্যে চীনাদের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। যদি সিঙ্গাপুরের চীনাদের ইহার সঙ্গে যোগ করা হইত, তবে, চৈনিক আধিপত্য সর্ববিষয়ে বিস্তার লাভ করিত। প্রধানতঃ এই কারণেই সিঙ্গাপুরকে মালয়ের সঙ্গে যোগ করা হয় নাই। কিন্তু যে ফেডারেটেড ষ্টেটস্ অব্ মালয় বা মালয় ফেডারেশন গঠিত হইল, তাহা দ্বারা কার্যত এমন একটা রাজ্য-সমবায়ের উদ্ভব হইল, যাহা কতকটা আমাদের দেশের প্রাক্তন নেটিভ ষ্টেটগুলির একত্রীকরণের মত। অর্থাৎ স্থলতান বা দেশীয় রাজাদের ৯টি রাজ্য এবং মালাক্কা ও পেনাং—এই মোট ১১টি ষ্টেট্ একত্রে মালয় ফেডারেশন নামে পরিচিত হইল। মালয়ের কেন্দ্রীয় শাসনে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ঠাঁট বজায়

রাখা হইয়াছে এবং যদিও ইহা সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য তথাপি উহা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুর্ক্ত এবং উহার ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে বৃটেনের হাতে—অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গেও সহযোগিতা বজায় থাকিবে। ফলে, উহার পররাষ্ট্রীয় নীতিও বৃটেনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে মালয়ের মত ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশকে (যেখান হইতে প্রভূত ডলার মুদ্রা অর্জিত হইয়া থাকে) হাতছাড়া করিতে বৃটিশ সরকার কখনও রাজী ছিলেন না। ফলে ১৯৪৮ সাল হইতে ৯ বছর ধরিয়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট আন্দোলন একত্রে মারমুখী হইয়া প্রভূত রক্তপাত ও সন্ত্রাসবাদ ঘটাইয়াছে। এই কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার ছিল বলিয়া অনুমান। জেনারেল টেম্পলারের মত দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ সেনানী বৃটেনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও এই কমিউনিষ্ট গেরিলা বাহিনীকে কাবু করিতে পারেন নাই। বৃটিশ সরকার ইহাদিগকে দমন করিতে গিয়া যেমন নৃশংসতা ঘটাইয়াছেন, তেমনি কোটি কোটি টাকাও খরচ করিয়াছেন। মালয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনেক বৃটিশ কার্ম্মচারী সেখানে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ১৯৫৭-৬১ সাল পর্যন্ত ২৭ কোটি টাকা বৃটেনের পক্ষ হইতে খরচ করা হইবে কমিউনিষ্ট দমনের জন্য।*

এদিকে অনেক দর 'কষাকষি' ও আন্দোলনের পর সিঙ্গাপুরও আভ্যন্তরীণ শাসনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের ৩রা জুন একটি নূতন সংবিধানের দ্বারা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুর্ক্তরূপে সিঙ্গাপুরে পার্লামেণ্টারি স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় নীতি বৃটিশ সরকারের হাতে এবং এখানকার ইংরাজ কমিশনার ও কমিশনার-জেনারেলই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ঘাঁটি আগলাইবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান নায়ক।

কিন্তু মালয়ে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সমস্ত দ্বীপ ও উপদ্বীপ অঞ্চলে কমিউনিষ্ট আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা। কেননা, চীনাদের সংখ্যা এই সমস্ত অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী। এজন্য মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা চলিতেছে এবং এই পরিকল্পনা সম্ভবতঃ শীঘ্রই বাস্তবে রূপায়িত হইবে। এই সম্পর্কে গত ৩রা জানুয়ারী ১৯৬২ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় উহার লণ্ডনস্থিত বিশেষ

* স্বাধীনতা অর্জনের পর বর্ত্তমান ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মালয়ের জঙ্গলে তেমন কোন সশস্ত্র কমিউনিষ্ট বিভীষিকা ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট আছে।

—লেখক

প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত করা গেল:

প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র :

লণ্ডন, ২৯শে ডিসেম্বর : মালয়, সিঙ্গাপুর, বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও, ব্রুনেই ও সারাওয়াক রাজ্য ও রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটা নতুন নয়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয় তা হলে এশিয়ার তথা বিশ্বরাজনীতিতে তা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি বলে বিবেচিত হবে।

কিছুদিন আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তেঙ্কু আব্দুর রহমানের কাছ থেকে এবিষয় বিস্তৃতভাবে শোনার সুযোগ হলো।

মাস ছয়েক আগেও তেঙ্কু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দেখানো দূরের কথা বরং বিরোধিতাই করতেন। আজ তাঁর মত পরিবর্তনের প্রাথমিক কারণ মালয়ের দ্বারপ্রান্তে সিঙ্গাপুর নগর রাজ্যের রাজনৈতিক সঙ্কট। সেখানে অতিবামপন্থীদের চাপে বামপন্থী লি কুয়ান ইউ-এর সরকার টলটলায়মান। অতএব পূর্বোক্ত পাঁচটি রাজ্য ও রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে :

(১) সিঙ্গাপুরে অতিবামপন্থীদের নিরস্ত্র করা সম্ভর হবে।

(২) সিঙ্গাপুরের চৈনিক জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে একটা সমতায় আনা সম্ভব হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে তেঙ্কু পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছেন যে, তিনি সিয়াটোর জঙ্গীজোটে যোগ দিতে চান না। কিন্তু তিনি কমনওয়েলথের সঙ্গে 'ডুবতে কিম্বা ভাসতে চান।' বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের সঙ্গে যুগ্ম বিবৃতিতে তাঁরা সচেতনভাবেই সিঙ্গাপুরের বৃটিশ রণঘাঁটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুচ্ছেদটি অস্পষ্ট রেখেছেন যাতে ভবিষ্যতে আপোষ-আলোচনার মধ্য দিয়ে কোন সম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায়। তবে নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণে উক্ত রণঘাঁটি চালু রাখার কথা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। কারণ, রণঘাঁটিটি ৪০ হাজার লোকের অন্ন সংস্থান করে।

মালয় রাষ্ট্রটি বর্তমানেই একটি যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে তার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির অধিকার অনেকটা মালয়-অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মত হবে।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রটির ভবিষ্যৎ বুঝতে হলে পূর্বোক্ত পাঁচটি রাজ্য ও রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অপরিহার্য।

মালয়ঃ একশ' বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৃটিশ শাসনের পর ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে মালয় স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ৯ বছর ধরে মালয়ে কমিউনিষ্টদের বন-জঙ্গলে জলাভূমিতে অবিশ্রান্ত গেরিলা যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে প্রায় ১১ হাজার ৪৮ জন মারা যায়।

স্বাধীনতার পর তেঙ্কু আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে এলায়ান্স পার্টি ক্ষমতায় আসে। বর্তমানে মালয় ১১টি রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই নিজস্ব সুলতান কিংবা রাজ্যপাল আছে। শাসনতন্ত্রে চীনা ও মালয়ীদের স্বার্থরক্ষার রক্ষাকবচ নির্দিষ্ট।

মালয় পৃথিবীর বৃহত্তম রবার ও টিন উৎপাদক রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ। জনসংখ্যা ৬৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৫১ জন। তার মধ্যে চীনারা ৩৭%, মালয়ী ৪৯.৯% অন্যান্য ১৩.১% জন।

সিঙ্গাপুরঃ ১৯৫৯ সালে ১৪০ বছর প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের পর সিঙ্গাপুর কমনওয়েলথের শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। কিন্তু অন্য কোন শিল্প নগণ্য হওয়ায় মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই হচ্ছে সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সমাধান। সিঙ্গাপুরে বৃটেনের পূর্বোল্লিখিত রণঘাঁটিই হচ্ছে 'সাউথ-ইষ্ট-এশিয়া ট্রিটি অর্গানিজেশনের' কেন্দ্র শক্তি।

সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৩৪ জন। তার মধ্যে মালয়ী ১৩.৯%, চীন ৭৫.২% এবং অন্যান্য ১০.৯% জন। বর্তমানে সিঙ্গাপুরের লোকেদের নাগরিকত্ব দ্বিত্ব—সিঙ্গাপুরী ও বৃটিশ। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র-অন্তর্ভুক্ত হলে হবে সিঙ্গাপুরী ও মালয়েশিয়ান।

বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওঃ স্কটল্যাণ্ডের আয়তনের এই দেশটির জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার জন। দেশটি পার্বত্য। সম্প্রতি কিছু কিছু তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ৬৫ বছর বৃটিশ নর্থ বোর্ণিও কোম্পানীর শাসনাধীন থাকার পর ১৯৪৬ সালে এটি বৃটিশ কলোনীতে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে সেই ঔপনিবেশিকতার অবসান হবে। জনসংখ্যার ২২% চীনে ও অন্যান্য ৭৮% ভাগ।

সারাওয়াকঃঃ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রুনেইর সুলতানের কাছ থেকে বৃটেনের ব্রুক পরিবার এই রাজ্যটি কিনে নিয়ে পারিবারিক শাসন (শ্বেতরাজ পরিবার) চালাতো। রাজ্যটির আয়তন ইংলণ্ডের সমান, জনসংখ্যা ৭ হাজার ৪৪ জন। সাধারণত তারা লম্বা লম্বা বারোয়ারী কুঁড়ে ঘরে বাস করে। এক-একটি বারোয়ারী ঘরে ৯০টি পর্যন্ত পরিবারের বাস।

১৯৪৬ সালে ব্রুক পরিবারকে খেসারৎ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার এই রাজ্যটির শাসনভার গ্রহণ করে। বর্তমানে সারাওয়াকে কিছু পরিমাণে রবার, সোনা ও বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে।

রাজ্যটির জনসংখ্যার ৩১% চীনে, ৬% মালয়ী এবং অন্যান্য ৬৩ ভাগ!

ব্রুনেই: বৃটিশ রক্ষণাধীন এই সুলতানশাহী প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের তৈল সম্পদে সবচেয়ে ধনী দেশ। জনসংখ্যা ৮০ হাজার; তার মধ্য চীনে ১৯%, মালয়ী ৪৯% ও অন্যান্য ৩২% ভাগ।

দু'বছর আগে একটি নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ব্রুনেইতে একটি নির্বাচনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু সেই নির্বাচন আজও কার্যে পরিণত হয় নি।

রাজ্যের তৈল আয়ের অনেকখানি জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং সেই জন্যে এশিয়ার মানে জনসাধারণের অবস্থা ভালোই।......

সুতরাং দেখা যাইতেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় উপদ্বীপ ও 'কমিউনিষ্ট উপদ্রব'কে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্রসমবায় গড়িয়া উঠিতেছে, যাহা এই অঞ্চলের রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে।*

---

* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, সিঙ্গাপুরবাসীদের গণভোটের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর আগামী ৩১শে আগষ্টের (১৯৬৩) পূর্ব্বেই মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে এবং ঐ তারিখেই মালয়েশিয়া ফেডারেশন জন্মলাভ করিবে। —লেখক

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব এশিয়ার সংঘাত

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে এশিয়া মহাদেশ মুক্তিলাভ করিলেও আজ পর্যন্ত (১৯৬২) কোথাও উহার জীবন সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। দীর্ঘ পরাধীনতাজনিত নানা গ্লানি যেমন এশিয়ার সমাজ অভ্যন্তরে জমিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের চক্রান্ত ও বিরোধিতা (প্রকাশ্য কিম্বা চাপা) আজও চলিতেছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের এবং বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের জন্য বছরের পর বছর যেমন ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে, তেমনি গত ১৯৫০ সাল হইতে নানা স্থানে অতি তীব্র সংঘাত, এমন কি 'গরম লড়াইয়ের'ও মহড়া হইয়াছে। পূর্ব বা পূর্বপ্রান্তিক এশিয়ার কোরিয়া, ফরমোজা, জাপান ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত।

কোরিয়ার যুদ্ধ

১৯৫০-৫৩ সাল পর্যন্ত কোরিয়া যে যুদ্ধের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও সর্বনাশগ্রস্ত হইয়াছে, তার জন্য একমাত্র দায়ী ঠাণ্ডা লড়াই। বৃহতের বিরোধের জন্য একটি নিরপরাধ ক্ষুদ্র জাতি কি ভাবে বিপর্যস্ত হইতে পারে তারও দৃষ্টান্তস্থল কোরিয়া। এই পর্বতবহুল উপদ্বীপটি এশিয়ার একেবারে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে উত্তর-পূর্ব এশিয়া যেন কোরিয়ার মারফৎ জাপানের দিকে কনুই দেখাইতেছে! প্রকৃতপক্ষে চারি হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসসম্পন্ন কোরিয়া বহুদিন জাপানীদের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র কোরিয়ার (উত্তর ও দক্ষিণসহ) লোক-সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। কোরিয়ানরা কিম্বা কোরীয় জনগণ একটি অখণ্ড দেশের অধিকারী এবং তারা এক ভাষাভাষী। কিন্তু অতীতের চৈনিক, রুশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এই ক্ষুদ্র দেশটির উপর প্রভূত আধিপত্য বিস্তার ও অত্যাচার করিয়াছে। ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বন্দরের সংগ্রাম এশিয়াতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার অন্যতম মূল কারণ ছিল কোরিয়ার দখলদারির প্রশ্ন। সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়ী ও

গর্বিত জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লইল। রাশিয়া উহা মানিয়া লইল এবং ১৯১০ সাল হইতে উহা জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট জাপ্ সাম্রাজ্যের পতনের পর কোরীয় জনগণ একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোড়াতেই মহাযুদ্ধের অংশীদারগণের জন্য তাহা ভণ্ডুল হইল। কারণ, ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটস্ডাম সম্মেলনে কোরিয়াকে ৩৮নং অক্ষরেখায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহা সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারির মধ্যে ভাগ করিবার প্রস্তাব হইল। ১৯৪৫ সালের ১০ই আগষ্ট সোভিয়েট সৈন্য উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিল এবং ৯০ লক্ষ অধিবাসীসহ ৪৮ হাজার ৪৬৮ বর্গ মাইল দখল করিল। এবং আমেরিকান সৈন্যেরা দক্ষিণ কোরিয়া (আয়তন ৩৬ হজার ৭৬০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ) অধিকার করিল।

তারপর হইতে কোরিয়া রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াইতে জড়াইয়া পড়িল। ফলে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রতিনিধিগণ (একমাত্র সীংম্যান্ রীর দল ছাড়া) পিয়ঙ্ ইয়ঙ্য়ে একত্র হইয়া অখণ্ড দেশ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিল, তাহা ব্যর্থ হইল—যেমন উহার আগে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে রুশ-মার্কিন জয়েণ্ট কমিশনের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যর্থতার মূলে ছিল মার্কিন এবং 'জাতীয়তাবাদী প্রবীণ নেতা' ডাঃ সীংম্যান রী'র উস্কানি ও অপচেষ্টা।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রুশ সৈন্যরা উত্তর কোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং পরের বছর গ্রীষ্মকালে আমেরিকানরাও দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল বটে, তবে সেখানে একটি 'মিলিটারি মিশন' রাখিয়া গেল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণভাবেই কোরিয়া ত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ায় কিম ইল স্থঙয়ের নেতৃত্বে একটি কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় সীংম্যান রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়াকে স্বীকৃতি দানের জন্য স্থপারিশ করিল। বলা বাহুল্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিল। ইউরোপে দ্বিখণ্ডিত জার্মানীর মত এশিয়ায় দ্বিখণ্ডিত কোরিয়ার দুই অংশেও তীব্র ও তিক্ত মত বিরোধ এবং সংঘাত দেখা দিল। এবং উভয়েই সমগ্র দেশের উপর ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী জানাইল। এ ভাবে প্রতিদিন উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাড়িয়া চলিল এবং

১৯৫০ সালের গোড়াতেই ৩৮নং অক্ষরেখার সীমান্তে এমন সমস্ত ঘটনা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল যে, সমগ্র অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়া পড়িল। অবশেষে সত্য সত্যই ২৫শে জুন (১৯৫০) ভোর রাত্র হইতে দ্বিখণ্ডিত কোরিয়ার কৃত্রিম সীমানা ধরিয়া উভয় অংশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হইল এবং উত্তর কোরীয় সৈন্যগণ দ্রুতবেগে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢুকিয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আসিল এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক বৈঠক আহূত হইল। এই বৈঠকে সিকিউরিটি কাউন্সিল উত্তর কোরিয়ার প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার এবং ৩৮ নং অক্ষরেখায় সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া আনিবার এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ইউ-এন সদস্যকে সাহায্য করিবার জন্য দাবী জানাইল। ২৭শে জুন সিকিউরিটি কাউন্সিলের পুনরধিবেশনে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে 'Police Action' বা পুলিশী অভিযান গ্রহণের সিদ্ধান্ত হইল। কারণ, সে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী এবং এই আক্রমণ-কারীকে প্রতিরোধ ও দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্যদানপূর্বক এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্যের নিকট আবেদন করা হইল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ও বিমানবহরকে তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে যাইবার এবং ৭নং মার্কিন নৌবহরকে ফরমোজা দ্বীপ রক্ষায় উদ্দেশ্যে চীনা সমুদ্রে চৌকি দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এজন্য যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই সমস্ত বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। কমিউনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদের বাহিরে রাখার প্রতিবাদে রাশিয়া তখন 'নিরাপত্তা পরিষদে'র বৈঠকগুলি বর্জন করিয়াছিল।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে উত্তর কোরিয়াকে 'Aggressor' বা আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং যদিও ভারত সরকারসহ পৃথিবীর অধিকাংশ গভর্ণমেণ্ট গোড়ায় এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইল, তথাপি পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট ব্লক ছাড়াও অনেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। বরং দক্ষিণ কোরিয়ার সীংম্যান রীর চক্র এবং তার পিছনে মার্কিন উস্কানিই যে প্ররোচনা দিয়াছে এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সীমান্তে প্রথম আক্রমণ ঘটাইয়াছে—এই মাইনরিটি অভিমতও জোরের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নেহরু গোড়ায় উত্তর কোরিয়াকেই দোষী

সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বোধ হয় তিনি তাঁর ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যের মত ভারত সরকার কোরিয়ার যুদ্ধে কোন সৈন্য পাঠায় নাই, যুদ্ধের স্বপক্ষে কোন সহায়তা দেয় নাই, বরং যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

কোরিয়া যুদ্ধের ঘটনাবলীর (যাহা নিয়া আলাদা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে) এখানে বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হইত, তবে দেখানো যাইত যে, ২৫শে জুনের আগে কি ভাবে এই শোচনীয় যুদ্ধের জন্য পটভূমিকা তৈয়ার করা হইয়াছে। কি ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' (প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মতবাদ ও নীতি) এশিয়ায় কমিউনিজম এবং শান্তি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া প্রয়োগ করা হইল এবং নেপথ্যে কারা এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই সম্পর্কে খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও অনেক তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে, যদিও সেগুলি আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিশারদ জনৈক মার্কিণ অধ্যাপক একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থে* কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আভাষ দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ১৯৫০ সালের বসন্তকালে জেনারেল ম্যাক-আর্থার, জেনারেল চিয়াং কাইসেক ও ডাঃ সীংম্যান রী—এই তিন মূর্তির ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপরে। এই ত্রি-মূর্তির সঙ্গে আসিয়া হাত মিলাইলেন ট্রুম্যানের "রিপাব্লিকান পরামর্শদাতা" জন ফষ্টার ডালেস, যিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আমলে পররাষ্ট্রনীতিতে স্বনামধন্য হইয়াছিলেন। টোকিও বা জাপানের সর্বময় মার্কিণ প্রশাসক জেনারেল ম্যাক-আর্থার আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এশিয়াতে একটা 'জবরদস্ত নীতি' (a tough policy in Asia) অনুসরণ করিতে হইবে। জুন মাসে ডালেস সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৩৮নং অক্ষরেখা হইতে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দূরবীণ দিয়া 'লাল উত্তর কোরিয়া'র দিকে তাকাইলেন এবং তারপর গেলেন টোকিওতে। সেখানে ম্যাক-আর্থার, জনসন ও ব্রাড্লি—এই তিন শীর্ষস্থানীয় 'ব্যক্তিদের সঙ্গে সলাপরামর্শ হইল। ইহার আগে সীমান্ত পরিদর্শনের পর ডালেসের মুখ দিয়া বাহির হইল—'positive action was impending' অর্থাৎ 'সক্রিয় পন্থা আসন্ন!' আর টোকিওতে ম্যাক-আর্থারের

---

* অধ্যাপক ডঃ ডি, এফ, ফ্লেমিং প্রণীত "The Cold War" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কোরিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সদর দপ্তরে এই মনোভাবই দেখা দিল যে, দক্ষিণ কোরীয়গণই যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। খ্যাতনামা মার্কিণ সাংবাদিক জন গন্থার তখন টোকিওতে ম্যাক-আর্থারের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, একজন বিশিষ্ট অফিসারকে হঠাৎ টেলিফোনে ডাকা হইল এবং তিনি ফিরিয়া আসিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিলেন ঃ
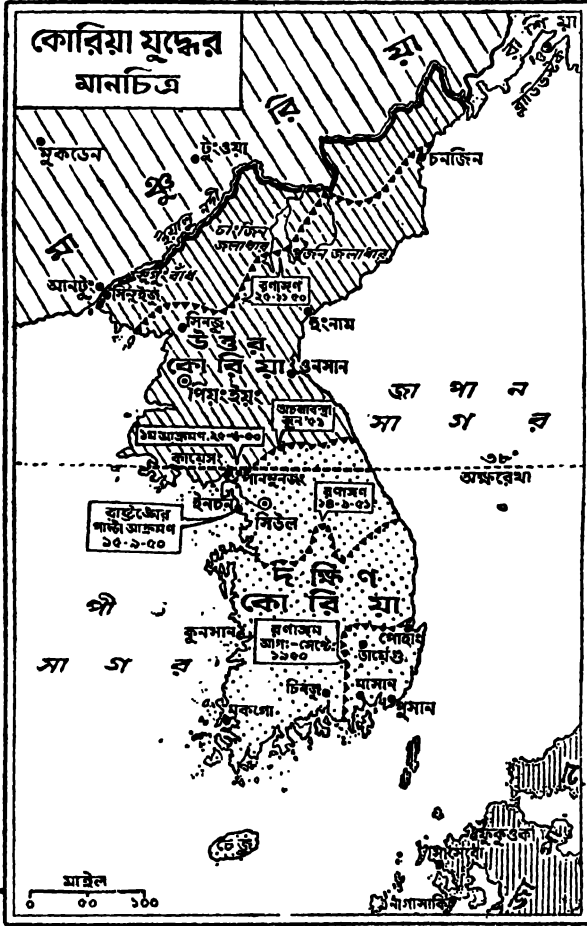
'A big story has just broken. The South Koreans have attacked North Korea.' অর্থাৎ এইমাত্র খুব বড় খবর পাওয়া গেল। দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে।*

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভের জন্য কারা মূলতঃ দায়ী ও দোষী, তাহা নিরপেক্ষ বিচারে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

যদিও পশ্চিমী প্রচারকার্যে জোর গলায় বলা হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়াই প্রকৃত উস্কানি ও উৎসাহদাতা এবং উত্তর কোরিয়ার বকলমে আসলে রাশিয়া এই যুদ্ধ চালাইতেছে, তথাপি একথা নিঃসন্দেহ যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। বরং ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইয়া যখন সোভিয়েট নায়ক মঃ ষ্ট্যালিনের নিকট চিঠি পাঠান, তখন ষ্ট্যালিন শান্তির স্বপক্ষে জবাব দেন। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দুই রাষ্ট্রের বিপরীত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক বৈষম্যও এখানে।

এই 'অনাবশ্যক যুদ্ধ' যাহা প্রকৃতপক্ষে হতভাগ্য কোরিয়ানদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, তিন বছর ধরিয়া তার ধ্বংস তাণ্ডব চলিল। যদিও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাম করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত হইল, তথাপি কার্যতঃ ইহা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। জাপানের 'মার্কিন অভিভাবক' জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার এই সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। কোরিয়ার এই যুদ্ধকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে:

প্রথমতঃ উত্তর কোরীয় সৈন্যদল কর্তৃক অতি দ্রুত দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল দখল (২৯শে জুন), তারপর মার্কিন ও অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্র-সৈন্য কর্তৃক উত্তর কোরীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধ এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ইনচন্ বন্দরে মার্কিন নৌসৈন্য দলের সাফল্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবতরণের দ্বারা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন এবং উত্তর দিকে অভিযান। ২০শে অক্টোবর উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ঙ্ ইয়ঙয়ের পতন এবং মার্কিন সপ্তম বাহিনী কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ার সীমানায় পৌছানো।

দ্বিতীয়তঃ চীন সরকার কর্তৃক সাবধানবাণী উচ্চারণ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যবাহিনীকে ৩৮নং অক্ষরেখা পার হইয়া উত্তর দিকের অভিযানে নিষেধকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সেই নিষেধ উপেক্ষা এবং ২৬শে নভেম্বর ২ লক্ষ চীনা "স্বেচ্ছাসৈন্য" কর্তৃক প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ। মার্কিন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যদলের বিপর্যয় ও উত্তরাঞ্চল হইতে দ্রুত পশ্চাদপসরণ (২৪শে ডিসেম্বর), দুর্দ্দম চীনা

বাহিনী কর্তৃক বন্যার বেগে অগ্রগতি, ৩৮নং অক্ষরেখা অতিক্রম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ৭০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলী কর্তৃক চীনকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষণা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্তৃক পাল্টা আক্রমণে চীনা সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ—৩রা এপ্রিল। ২২শে হইতে ৩০শে এপ্রিল (১৯৫১) ৬ লক্ষ চীনা সৈন্যের নূতন পাল্টা আক্রমণে রণক্ষেত্রে অচল অবস্থার উদ্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্তৃক জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি—১১ই এপ্রিল, ১৯৫১। এবং ৩৮নং অক্ষরেখা বরাবর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন, ১০ই জুলাই ১৯৫১। কিন্তু আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি।

২৭শে জুলাই, ১৯৫৩। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর ও যুদ্ধের অবসান।

তিন বছরের এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মোট ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার লোক কোরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। তার মধ্যে ২৮ লক্ষ ৩৪ হাজার স্থলসৈন্য, ১১ লক্ষ ৭৭ হাজার নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, ৪ লক্ষ ২৪ হাজার নৌ-সৈন্য, ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার বিমানবহরের ও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। ৩৩ হাজার ৬২৯ জন মার্কিন সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত, ২০ হাজার ৬১৭ জন মৃত (নানাভাবে), ১ লক্ষ ৩ হজার ২৮৪ জন আহত, অর্থাৎ মার্কিন পক্ষে মোট হতাহত ১লক্ষ ৫৭ হাজার ৫০৩ জন।

দক্ষিণ কোরিয়ার হতাহতের সংখ্যা (সামরিক) ছিল ১৩ লক্ষ ১২ হাজার ৮২৬ জন এবং রাষ্ট্রসংঘে অন্যান্য বাহিনীর (বৃটিশ ইত্যাদি) ১৭ হাজার ২৬০ জন। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের পক্ষভুক্ত সকল দলের মোট হতাহতের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৬৯ জন। হতাহত ও বন্দী লইয়া অপর পক্ষ (উত্তর কোরিয়া ও চীন) ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য হারাইয়াছিল। কিন্তু হিসাবটি এখানেই সম্পূর্ণ নহে। কারণ, আরও উল্লেখ করা দরকার এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মোট হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক। ইহার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ জন এবং উত্তর কোরিয়া ও চীনের আরও অনেক বেশী।

ইহার সংগে অসামরিক (উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া উভয়ের) হতাহতের সংখ্যা যোগ দিলে কোরিয়া যুদ্ধের মোট হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ৫০ লক্ষ! ইহার মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষই প্রাণ হারাইয়াছিল। আর সেই সংগে ধনসম্পত্তির ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র কোরিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

কোরিয়া যুদ্ধের এই ট্রাজিডির জন্য মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশেষ-ভাবে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের গোয়াতুর্মি, অবাধ্যতা, দাম্ভিকতা ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষই দায়ী—যদিও সামরিক ও নৈতিক দিক হইতে শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পক্ষই জয়ী হইয়াছিল।

বহু নাটকীয় এবং অতি-নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল কোরিয়ার যুদ্ধে। জেনারেল ম্যাক-আর্থার বার বার হুমকি দিয়াছিলেন যে, তিনি ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের ঘাঁটির উপর বোমা ফেলিবেন এবং নৌ ও বিমানবহরের দ্বারা চীনকে আক্রমণ করিবেন। ম্যাক-আর্থারের এই সমস্ত শাসানি ও গোয়াতুর্মির ফলে স্বয়ং ট্রুম্যান বিব্রত ও বিরক্ত হন এবং মিত্রপক্ষ বৃটেন ও অন্যান্য শক্তি তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হুকুম দেন যে, জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁর এবং ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়া নীতি বা পলিসী সংক্রান্ত কোন বিবৃতি দিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ম্যাক আর্থার তাঁর খামখেয়ালি মত চলিতে ও বিবৃতি দিতে থাকেন। তখন বাধ্য হইয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সংবিধানগত বিশেষ ক্ষমতা (তিনি স্বয়ং সুপ্রীম কমাণ্ডারও বটেন) অনুযায়ী জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে কোরিয়া ও প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত সামরিক নায়কত্ব হইতে বিতাড়িত করেন এবং অষ্টম বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল রিজওয়েকে তাঁর স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সেদিনের পৃথিবীতে এই ঘটনায় নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইহার আগেও একবার নিদারুণ চাঞ্চল্য এবং পৃথিবীব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তুলিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান—যখন ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫০, তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে "পৃথিবীব্যাপী সমর সমাবেশ" প্রয়োজন এবং যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দেয়, তবে জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে এটম্ বোমা বর্ষণের ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, ট্রুম্যানের এই ঘোষণায় আমেরিকার সমরসঙ্গীরা পর্যন্ত ত্রাসগ্রস্ত হন। এবং বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া যান ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টকে ঠাণ্ডা করার জন্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটম্ বোমা বর্ষণের আর সুযোগ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এশিয়া সম্পর্কে ট্রুম্যান-ম্যাক-আর্থারের মনোভাব ও নীতি নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

কোরিয়ার এই শোচনীয় যুদ্ধের আরম্ভে ভারতবর্ষের ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল না। কারণ, 'আক্রমণকারী' উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে 'পুলিশী অভিযানে'র

যে সিদ্ধান্ত ২৫শে ও ২৭শে জুন, ১৯৫০, সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, ভারত সরকার যথোচিত সতর্কতা ও অনুসন্ধান ছাড়াই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁরা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোরিয়া কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের রিপোর্টের উপর। কিন্তু কমিশনের ভারতীয় সদস্য মিঃ সি কোন্দাপি এবং ডাঃ অনুপ সিং'য়ের আচরণ সন্দেহাতীত ছিল না। কোরিয়া যুদ্ধের উৎপত্তির বিবরণ সংগ্রহে তাঁরা "ব্যক্তিগত সংস্কার ও বদ্ধমূল ধারণা"র দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। *

কিন্তু পরে প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার তাল সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন। অ-কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাগ্রে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে 'নামে মাত্র' সৈন্যবাহিনী পাঠাইতেও অস্বীকৃত হয় এবং কোরিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরু বহু চেষ্টা করেন। এই কোরিয়া যুদ্ধ উপলক্ষেই আবার ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতির মোড় ফিরিতে থাকে এবং উহা নয়াচীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে ঘুরিতে থাকে। অবশ্য পিকিংস্থিত তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মনীষী সর্দার পানিক্করের এই বিষয়ে যথেষ্ট দান রহিয়াছে। কারণ, চীন, তিব্বত ও কোরিয়া সম্পর্কে সর্দার পানিক্কর এমন অনেক নূতন তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, কোরিয়াতে যাহাই ঘটুক না কেন, তাতে চীনের স্বার্থ জড়িত না হইয়া পারে না। সুতরাং কোরিয়া সমস্যা মিটাইতে গেলে চীনের সহযোগিতা অপরিহার্য এবং এ জন্যই চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরূপে গ্রহণ করা দরকার। যখন উত্তর কোরীয় সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পিছু হটিতে থাকে, তখন ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ জানান ৩৮নং অক্ষরেখা পার না হওয়ার জন্য। কারণ, পিকিং হইতে রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর শ্রীনেহরুকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ৩৮নং অক্ষরেখা অতিক্রান্ত হইলে নয়াচীন সরকার উহা চীনের প্রতি ঘোরতর বিপদরূপে গণ্য করিবে। সুতরাং এই লাইন অতিক্রম তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু সর্দার পানিক্করের মারফৎ ভারতবর্ষের (এবং চীনের) এই সতর্কবাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ণপাত করিলেন না এবং ম্যাক-আর্থারের সৈন্যেরা যখন ইয়ালু নদী পার হইল, তখনও ভারতরাষ্ট্র আর একবার প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সৈন্যেরা দমিলেন না। পরে যখন চীনাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়া ম্যাক-আর্থারের সৈন্যরা বিধ্বস্ত হইয়া গেল,

* এই সম্পর্কে শ্রীকরুণাকর গুপ্ত প্রণীত 'Indian Foreign policy' নামক পুস্তকের তথ্য-মূলক ভূমিকা এবং ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তখন আন্তর্জাতিক জগতে ভারতের সতর্কবাণী ও ভবিষ্যৎবাণীর কদর বাড়িল। (এই প্রসঙ্গে সর্দার পানিক্করেরও যথেষ্ট সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল)। তারপর রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে কোরিয়া যুদ্ধাবসানের জন্য ভারতবর্ষ আরব-এশীয় ব্লকের মারফৎ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল।

এই চেষ্টারই পরিণতিতে কোরিয়া যুদ্ধের জটিলতম প্রশ্ন 'যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে'র (repatriation of prisoners of war) সমস্যা শেষ পর্যন্ত মিটিয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সালের জুন মাস হইতে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, এই 'যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তন' প্রশ্নে তাহা নিদারুণ অচল অবস্থার সৃষ্টি করিল। এবং দুই বছর ধরিয়া এই অচল অবস্থা চলিল, যাহা কোরিয়া যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত ঘটনা। যুদ্ধবন্দীদের অনেকেই এবং বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট উত্তর কোরিয়ার বন্দীসৈন্যেরা তাদের স্বদেশে ফিরিতে ইচ্ছুক নহে, ইহাই ছিল মার্কিন পক্ষের বক্তব্য এবং এই সমস্ত বন্দীকে জোর করিয়া উত্তর কোরিয়ায় পাঠাইলে উহা মানবতাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী কার্য হইবে—এমন যুক্তি দেখান হইতেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের নজীরে চীন ও উত্তর কোরিয়া দাবী করিতেছিল যে, সমস্ত যুদ্ধবন্দীকেই তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করে যে, একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিশনের হাতে সমস্ত যুদ্ধবন্দীর দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই নিরপেক্ষ কমিশনে চীন এবং উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিরাও থাকিবেন এবং এই প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রয়োজনমত পরামর্শ ও উপদেশাদি দিতে পারিবেন।

১৯৫২ সাল হইতে এক বছর ধরিয়া যুদ্ধবন্দীদের এই সমস্যা লইয়া নানা প্রকার টানা-হেঁচড়া চলিল এবং আন্তর্জাতিক জগতে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে লাগিল। *

অবশেষে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে চীনের উদ্যোগে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত ভারতবর্ষের মূল্য প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং

* ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি, কে. কৃষ্ণমেনন ১৯৫১ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিতর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেনের পক্ষ সমর্থন করিয়া মূল ভারতীয় প্রস্তাবের একটি সংশোধন মানিয়া লইয়াছিলেন। উহার ফলে চীনে ও রাশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে নূতন করিয়া সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পশ্চিমী জগৎ ভারতের প্রতি সন্দেহাতুর এবং বিরূপ হইয়া উঠে, আর এশিয়া মহাদেশে কোরিয়া যুদ্ধের জেরস্বরূপ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি আরও উগ্র এবং ঠাণ্ডা লড়াই তীব্র হইয়া উঠে, যার অন্যতম ফলস্বরূপ কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লা ভারত বিরোধী চক্রান্তে ধরা পড়িয়া ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। কোরিয়া যুদ্ধ এশিয়াতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়াছিল।

ফরমোজার সঙ্কট ঃ

ভারতবর্ষ হইতে বিমানযোগে জাপান যাতায়াতের পথে বর্তমান লেখক উর্ধ্বাকাশ হইতে ফরমোজাকে একাধিকবার দেখিয়াছেন সমুদ্র ও অরণ্যবেষ্টিত সুন্দর স্বপ্নময় সবুজ দ্বীপের মত। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা এই দ্বীপে প্রথম অবতরণ করিয়া ইহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ফরমোজা নামটি সম্ভবত পর্তুগীজ উদ্ভূত। একদা ভারতবর্ষের যেমন ছিল সুন্দর সিংহল দ্বীপ (বা পৌরাণিকমতে 'স্বর্ণপুরী লঙ্কা'), চীনেরও তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব তীরভূমি হইতে তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপ। চীনের উপকূলভাগ হইতে ইহার দূরত্ব ১১০ মাইল। ইহার দক্ষিণে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, উত্তরে জাপান, পশ্চিমে চীনা সাগর এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসমুদ্র। ইহার আয়তন ১৩ হাজার ৮৮৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা (১৯৫৯) ১ কোটি ২ লক্ষ ৩২ হাজার এবং ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল, প্রস্থে প্রায় অর্ধেক বা ৬০ মাইল। পাহাড় ও অরণ্যবহুল এই দ্বীপের পূর্বাংশ অত্যন্ত কর্কশ ও খাড়া, কিন্তু পশ্চিমাংশ সমতল ও শস্যপূর্ণ। কর্পূর, চিনি, চাউল, চ এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থে এই দ্বীপটি সমৃদ্ধ। সুতরাং জাপানের ইহা নজরে পড়িল এবং ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে ইহা জাপানের দখলে আসে। পঞ্চাশ বছর ধরিয়া এই দ্বীপ জাপানের কঠোর শাসনের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার ফলে দ্বীপটির প্রভূত উন্নতিও ঘটিয়াছিল। জাপানীরা কুশলী জাত। সুতরাং তাদের শাসনে ও সংস্পর্শে ফরমোজার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর ফরমোজা ও পেস্‌কাডোর দ্বীপ (তাইওয়ান ও চীন উপকূলের মধ্যবর্তী, আয়তন ৫০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮২ হাজার ৬৩৬) চীনের একটি প্রদেশরূপে চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান মিত্র-নায়কগণ ইয়াল্‌টাও পটসডাম চুক্তির দ্বারা ফরমোজাকে চীনের হাতে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং ১৯৫১ সালের

জাপানী সন্ধি চুক্তিতেও জাপান তাইওয়ানের উপর তার দাবী সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রাক্তন মিত্রশক্তিবর্গ ফরমোজাকে চীনের হাতে ফিরাইয়া দেওয়ার সময় কল্পনা করেন নাই যে, গোটা চীন মহাদেশ অবিলম্বে জেনারেল চিয়াং কাইশেকের হাতছাড়া হইয়া যাইবে এবং চিয়াং তাঁর দলবল লইয়া এই দ্বীপটিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবেন। আর লাল চীন তাইওয়ানকে পিকিংয়ের অধীনে ফেরৎ পাইবার জন্য এত সোরগোল বাধাইবে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপানের পতনের পর চিয়াং কাইশেকের সৈন্যেরা এই দ্বীপটির দখল লইল। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল ও অধঃপতিত চিয়াং সৈন্যদের অত্যাচারে ফরমোজার অধীবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হইতে লাগিল। ইহারা অবাধে লুঠতরাজ করিত এবং ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করিবার জন্য প্রায়শঃই খুনখারাবি করিত। আর চিয়াংয়ের অফিসারেরা (অ-সামরিক) স্থানীয় লোকজনকে তাদের চাকুরি হইতে তাড়াইয়া দিল, বহু লোককে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উচ্ছেদ করিল এবং এই সমস্ত অফিসার অবাধ লুণ্ঠনের দ্বারা অপরিমিত মুনাফা পকেটস্থ করিল। এক কথায় আগেকার ফরমোজার সুসংবদ্ধ জীবন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে একদিন ফরমোজার জনগণ মরীয়া হইয়া উঠিল এবং ১৯৪৭ সালের বসন্তকালে চিয়াংয়ের চেলাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু ইহার ফল দাঁড়াইল ভয়াবহ। উন্মত্ত চিয়াং সৈন্যেরা এই প্রতিরোধকামী নিরস্ত্র জনতাকে কুকুর বিড়ালের মত গুলী করিয়া হত্যা করিল। নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে।*

এই মর্মান্তিক পটভূমিকার মধ্যে ১৯৪৯ সালে মহাচীনের মহাফ্যাসিষ্ট নায়ক জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেক কমিউনিষ্ট নেতা মাও সে-তুঙের হাতে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও অপমানিত হইয়া দলবলসহ ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চীনের শত শত বছরের পুরাতন, জীর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু রাজ-বংশের ১৯১১ সালে পতন ঘটাইয়া যিনি চীনের জাতীয় জীবনের নব বোধন করেন এবং চৈনিক বিপ্লবের ভিত্তিকে যিনি প্রতিষ্ঠা দিয়া যান, সেই মহান্ নেতা সান্ ইয়াৎ সেনের (১৮৬৬-১৯২৪) পার্শ্বচর হওয়া সত্ত্বেও চিয়াং কাইসেক শেষ পর্যন্ত সমস্ত বৈপ্লবিক আদর্শ ও মহৎ নীতির চূড়ান্ত অবসান ঘটাইয়া কুওমিণ্টাং পার্টিকে হেয় করিয়া তুলিলেন এবং দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ

---

* অধ্যাপক ফ্লেমিং রচিত 'The Cold War' গ্রন্থের ৭০৮ পৃষ্ঠায় জ্যাক্ বেল্ডেনের 'China Shakes the World' বই থেকে উদ্ধৃতি।

ডাকিয়া আনিলেন। আর তাঁর আমলে চীনের অপরিমিত দুর্দ্দশা ঘটিল। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদারহৃদয় প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের 'সুবিবেচনা'র জন্য চিয়াং কাইসেক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় অন্যতম প্রধান মিত্রশক্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। এমন কি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদের পঞ্চ-প্রধানের (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন) অন্যতমরূপে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন, যার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট চীন আজও তীব্র এবং তিক্ত প্রতিবাদ জানাইতেছে। আমেরিকার আশ্রিত ও পৃষ্ঠপোষিত চিয়াং কাইসেক ফরমোজার রাজধানী তাইপিতে সদর দপ্তর স্থাপন করিয়া উহাকেই মহাচীনের আসল অর্থাৎ আইনসঙ্গত জাতীয়তা-বাদী রিপাব্লিক গভর্ণমেণ্ট বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণে আজও তাঁর এই স্বীকৃতি রাষ্ট্রসঙ্ঘে বজায় আছে। কিন্তু মহাচীনের একচ্ছত্র শাসক পিকিং গভর্ণমেণ্ট সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে চিয়াং কাইসেকের চূড়ান্ত পরাজয় এবং কুওমিণ্টাং পার্টির নিদারুণ বিপর্যয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। কারণ, ইহার ফলে এতদিনের অনুসৃত 'চীনা নীতি'ই যে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভাসিয়া গেল, তা' নয়, সম্পূর্ণ বিরোধী এক বিপজ্জনক বৈপ্লবিক শক্তি এশিয়ার প্রকাণ্ড ভূভাগ গ্রাস করিয়া ফেলিল। আর সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই চীনা বিপ্লব অবিলম্বেই ৭০ থেকে ৮০ কোটি মানুষকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রবন্ধনের মধ্যে আনয়ন করিল। ফলে, জাপান, চীন, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রসহ পূর্ব গোলার্দ্ধের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমেরিকার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে যে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল, মাও সে-তুঙের দল তাহা ধূলিসাৎ করিয়া দিল। ইহার উপর কোরিয়া যুদ্ধে চীনাদের হাতে আমেরিকার পরাজয় (পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনেও এই পরাজয়) তার জাতীয় মর্যাদা-বোধকে প্রচণ্ডভাবে আহত করিয়াছিল। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা উগ্রপন্থী, তাঁরা এই সমস্ত অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানিবার জন্য একটা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। চিয়াং কাইসেকের মারফৎ এই সুযোগ পাওয়া গেল।

১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ফরমোজা সংক্রান্ত নীতি পাল্টাইয়া ফেলিলেন, (তাঁর পূর্বেকার নীতি এই ছিল যে, চিয়াং ও ফরমোজাকে আমেরিকা কোন প্রতি-রক্ষামূলক সাহায্য দিবে না, বরং চীনকেই ফরমোজা ফেরৎ দেওয়া হইবে।)

২৭শে জুন, ১৯৫০। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ সপ্তম নৌবহরকে ফরমোজার চতুর্দিকস্থ সমুদ্রপথ রক্ষা করিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে চিয়াং কাইসেককেও নিষেধ করিলেন চীনের মূল ভূভাগ আক্রমণ করিতে। অর্থাৎ মার্কিণ অস্ত্রশক্তির আবরণের দ্বারা ফরমোজাকে যেন একটা 'নিরপেক্ষিত' অঞ্চলে পরিণত করা হইল। কিন্তু ১৯৫৩ সালের জানুয়ারীতে রিপাব্লিকান পার্টির (যাঁরা ট্রুম্যানের আগেকার নীতি সমর্থন করিতেন না।) জেনারেল আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইবার পরেই চীন সম্পর্কে আমেরিকা আরও উগ্র হইয়া উঠিল। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৩, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই মর্ম্মে ফরমান জারী করিলেন যে, তিনি চিয়াং কাইসেকের জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্টকে চীনের মূল ভূভাগ আক্রমণে অনুমতি দিয়াছেন এবং মার্কিণ নৌবহরকে হুকুম দিয়াছেন ফরমোজার উপর চীনা কমিউনিষ্টদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য। সোজা কথায় ফরমোজার খাঁচা হইতে যেন বন্দী চিয়াং কাইসেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং লেলাইয়া দেওয়া হইল চীনের বিরুদ্ধে। ছাড়া পাইয়াই চিয়াং কাইসেক মার্কিণ বোমারু বিমান ও জাহাজের সাহায্যে চীনের উপকূলস্থ বন্দরে, জাহাজে ও ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এভাবে ফরমোজার বিপরীত দিকস্থ চীনা উপকূলে কিছুটা অবরোধ সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইল। তখন স্বভাবতঃই কমিউনিষ্ট চীনের পক্ষ হইতে পাল্টা জবাব আসিল এবং চিয়াং কাইসেকের অধিকৃত উপকূলস্থ তাচেন, কুয়েময় ও মাৎস্থ দ্বীপপুঞ্জের উপর কামান ও বিমানযোগে আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ১৯৫৩ সালের এই সংঘর্ষ ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে আরও তীব্র হইল এবং উভয় পক্ষে কামানের গোলা ও বোমা বর্ষণ চলিতে লাগিল। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল যেন কমিউনিষ্ট চীন ফরমোজা, পেসকাডোর এবং কুয়েময় ইত্যাদি দ্বীপের বিরুদ্ধে বড় রকমের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কারণ, আমেরিকা ও চিয়াং চক্রের উস্কানি ও আক্রমণের জন্য ইহা ছাড়া তার উপায়ও ছিল না। কুয়েময়ের দিকে তাক করিয়া কমিউনিষ্ট চীনের কামানশ্রেণী গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তখন কুয়েময় দ্বীপ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা উচিত হইবে কিনা ইহা লইয়া আমেরিকার অভ্যন্তরে তীব্র মতভেদ আত্ম-প্রকাশ করিল। শেষ পর্যন্ত কুয়েময়, মাৎস্থ দ্বীপগুলি সংক্রান্ত নীতি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া (কিম্বা চিয়াং কাইসেকের জন্য রাখিয়া দিয়া) বাকি পেসকাডোর ও ফরমোজা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

এই দ্বীপ দুইটি রক্ষা করিবেই। এই মনোভাবেরই পরিপূরকস্বরূপ ১৯৫৪, ২রা ডিসেম্বর তারিখ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাইসেকের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করা হইল। এই চুক্তির সারবত্তা আমেরিকায় এবং আমেরিকার মিত্র বৃটেনেও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কারণ, বহু সহস্র মাইল দূরবর্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র পেসকাডোর বা ফরমোজা দ্বীপের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কেবল তাহাই নহে, এই সমস্ত দ্বীপ লইয়া যুদ্ধ করা যে অনুচিত এবং উপকূলবর্তী কুয়েময়, মাৎসু দ্বীপ যে চিয়াং কাইসেক কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, এমন মতবাদও মার্কিণ-মিত্র মহলে ধ্বনিত হইল।

অন্যদিকে পিকিংয়ের কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট ৮ই ডিসেম্বর তারিখ চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি বরবাদ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, ফরমোজা ও অন্যান্য দ্বীপ হইতে মার্কিণ সশস্ত্র শক্তি প্রত্যাহৃত না হইলে যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে, তার জন্য আমেরিকাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও এই প্রশ্নে নয়াচীন সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন এবং চিয়াং-মার্কিণ চুক্তির তীব্র নিন্দা করিলেন। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হইল। ফরমোজার ২৩০ মাইল উত্তরে উপকূলভাগস্থ তাচেন দ্বীপগুলি দখলের জন্য কমিউনিষ্টরা বোমাবর্ষণ করিল এবং জাতীয়তাবাদীরাও চীনের মূল ভূখণ্ডে বোমারু আক্রমণ চালাইল। ১৮ই জানুয়ারী কমিউনিষ্টরা তাচেনের সন্নিহিত ইকিয়াং দ্বীপটি আক্রমণ ও দখল করিয়া লইল এবং চিয়াংয়ের দুই হাজার গেরিলা সৈন্য চূর্ণ হইয়া গেল। ফলে, ওয়াশিংটনের উগ্র 'চীনামহল' যেন ক্ষেপিয়া গেল। ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৫৫, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং মার্কিণ কংগ্রেসের দ্বারস্থ হইলেন তাঁর হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের জন্য, যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে তিনি ফরমোজা, পেসকাডোর এবং 'সন্নিহিত অঞ্চল' সশস্ত্র আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত মার্কিণ সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেস প্রায় একবাক্যে প্রেসিডেণ্টের উপর এই বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিলেন এবং ২৭শে তারিখ তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ফরমোজা এলাকায় যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন তিনি একাই নির্দ্ধারণ করিবেন। রিপাব্লিকান পার্টি ও সমরবিভাগের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধের পক্ষপাতী এবং কমিউনিষ্ট চীনের উপর ভয়ঙ্কর রকমের ক্রুদ্ধ, তাঁরা এই সমস্ত ঘটনায় কেবল খুসী হইলেন না, উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সমরবিভাগের প্রধানগণ, যেমন, র‍্যাডফোর্ড,

কার্ণে, টোয়াইনিং প্রভৃতি উস্কানি দিতে লাগিলেন এবং এই উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিক নেতা সাজিলেন জন্ ফষ্টার ডালেস—মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ গাঁটছড়া বাঁধিবার জন্য যিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। জেনারেল ম্যাক-আর্থারও এই দলেই ছিলেন। তবে, তিনি প্রেসিডেণ্টের উপরও 'ছড়ি ঘুরাইতে' গিয়াছিলেন বলিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন।

যাহা হউক, এশিয়া ও চীন সম্পর্কে এই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতি এমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিল যে, কোরিয়ার মত আবার ফরমোজা উপলক্ষেও তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা নিকটতর হইল। মিঃ ডালেস প্রেসিডেণ্টকে বুঝাইলেন যে, চীন ও দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে কঠোর হইতে হইবে, আর পশ্চাদপসরণ চলিবে না এবং যদি যুদ্ধ বাধে, তবে, চীনকে তিন রণাঙ্গনের সম্মুখীন হইতে হইবে—(১) দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। (২) ফরমোজা এবং (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া। এমন কি, মিঃ ডালেস চীনের বিরুদ্ধে "রণকৌশলগত এটম্ বোমা" ('Tactical' A-bombing) বর্ষণেরও হুম্‌কি দিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারও তাঁকে এই বলিয়া প্রকারান্তরে সমর্থন করিলেন যে, 'বেবী এটম বোমা' কেন ব্যবহার করা চলিবে না, তাহা তিনি বুঝিতেছেন না। এই 'বেবী বোমা' এবং রণকৌশলগত এটম্ বোমা বর্ষণ (অর্থাৎ রণকৌশলের প্রয়োজনে একমাত্র সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা বর্ষণ) লইয়া আমেরিকায়ও বিতর্ক দেখা দিল, বৃটেনে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল এবং এশিয়াখণ্ডে মার্কিণ নীতির বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বহিতে লাগিল।

কোরিয়ার যুদ্ধ হইতে ফরমোজার সঙ্কট পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিতে লাগিল যে, আমেরিকা 'এশিয়ান্‌দের দ্বারা এশিয়ান্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইতে চাহিতেছে।' উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার ও হাতেকলমে যুদ্ধ করার পর এবং নয়াচীনকে প্রতিনিয়ত আক্রমণের হুম্‌কির মধ্যে রাখিয়া এক্ষণে চিয়াং কাইসেককে দিয়া আবার চীনের মূল ভূখণ্ডে সশস্ত্র অভিযানের চেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ এশিয়বাসীকে দিয়া এশিয়বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার ঘৃণ্য প্ররোচনা এবং প্রকাশ্য আয়োজন চলিতেছে। যেহেতু ইউরোপ শ্বেতবর্ণ এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠীর অন্তর্গত সেই হেতু ইউরোপের অভ্যন্তরে যুদ্ধের উস্কানির বদলে মার্শাল পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনা মারফৎ পশ্চিম ইউরোপকে পুনরায় শক্তিমান করার চেষ্টা চলিতেছে, আর এশিয়াখণ্ডে আমেরিকা বিপরীত

নীতি অনুসরণ করিতেছে। প্রথম এটম্ বোমা এশিয়াবাসীর মাথায়ই (হিরোসিমা ও নাগাসাকি) ফেলা হইয়াছিল এবং কোরিয়া ও ফরমোজা উপলক্ষেও এশিয়ানদের ধ্বংস করার জন্যই এটম্ বোমা নিক্ষেপের হুম্‌কি দেওয়া হইতেছে।

আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের একটি শক্তিমান দল এবং ডেমোক্রাট পার্টির কিছু কিছু সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি এই মারমুখো ডালেস-নীতির তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং ফরমোজার কথা উল্লেখ করিয়া শ্লেষের ভঙ্গীতে বলিলেন যে, আমেরিকা 'চীনের দরজার পাপোষ' লইয়া যুদ্ধ বাধাইতেছে। এশিয়াতে, বৃটেনে এবং আমেরিকার অভ্যন্তরে এই সমস্ত সমালোচনা ধ্বনিত হইবার পর মারমুখো নীতির প্রবক্তাগণ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হন এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ ফরমোজা এলাকায় শত্রুতা ও সংঘর্ষ অবসানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ঘোষণা করেন যে, চিয়াং কাইসেকের মত একজন 'বিশ্বাসঘাতকের' সঙ্গে যুদ্ধবিরতির কোন প্রস্তাব নিয়া আলোচনাই চলিতে পারে না। তিনি আইনের দিক হইতে আরও বলিলেন যে, ফরমোজা, পেসকাডোর ইত্যাদি দ্বীপ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন এক্তিয়ার নাই। কারণ, এই দ্বীপগুলি চীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে ২৯টি এশীয়-আরব জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, যাহা সমসাময়িক ইতিহাসে বান্দুং সম্মেলন নামে বিখ্যাত।

এই সম্মেলন হইতে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই আমেরিকার জনগণের উদ্দেশে চীনের জনগণের বন্ধুত্বের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, চীন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ চাহে না। তাইওয়ান (ফরমোজা) অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাস করিবার জন্য চৈনিক গভর্ণমেণ্ট মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ আলোচনার কথা বলিতে রাজী আছেন। কিন্তু চৌ এন-লাইয়ের এই শান্তিপূর্ণ মনোভাবের উপযুক্ত সাড়া আইসেনহাওয়ার-ডালেস্ মহল হইতে পাওয়া গেল না।

যাহা হউক, উহার আগেই চিয়াং কাইসেকের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, চিয়াং সৈন্যেরা তাচেন দ্বীপ ও নানচি দ্বীপ ছাড়িয়া আসিবে। মার্কিণ নৌবহরের সহযোগিতায় এই দ্বীপ দুইটি পরিত্যক্ত হইল এবং আগষ্ট মাসে (১৯৫৫) জেনেভায় মার্কিণ ও চীনা রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের মধ্যে ফরমোজা নিয়া

* পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বান্দুং সম্মেলন সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আলোচনাও স্বরু হইল বটে, কিন্তু কয়েক মাস আলোচনার পর উহা অচল অবস্থায় পরিণত হইল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারীতে উভয় পক্ষই ফরমোজা সম্পর্কে নিজ নিজ দাবী ও বক্তব্যের উপর জোর দিয়া বিবৃতি প্রচার করিলেন।

এভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ফরমোজা প্রণালীর জল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল বটে, কিন্তু ১৯৫৮ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে মধ্যপ্রাচ্যে বা পশ্চিম এশিয়ার ইরান ও লেবানন-সঙ্কট দেখা দেওয়ার পর চিয়াং কাইসেক-চক্র পুনরায় চীনের তীরভূমিতে হামলা করিতে লাগিল। ১৯৫৫ সালের ফরমোজা সঙ্কটের পর চিয়াং কাইসেক কুয়েময় ও মৎস্থ দ্বীপ দুইটিতে প্রচুর সৈন্য আমদানি করিলেন এবং মার্কিণ নৌবহরের সহায়তায় চীনের উপকূলভাগে অবরোধের তীব্রতা বাড়াইলেন। স্থতরাং কমিউনিষ্ট চীনও পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং ২৩শে আগষ্ট একদিনের মধ্যেই কুয়েময় দ্বীপের উপর ৫০ হাজার কামানের গোলা নিক্ষেপ করিল। ফলে, আমেরিকাতে পুনরায় যুদ্ধের জীগির শুনা গেল। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কুয়েময় ও মাৎস্থ দ্বীপ রক্ষা করিবে, এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিবে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ডালেসের এমন মনোভাব দেখা গেল। কানাডা ও বৃটেন এই মনোভাবের প্রতিবাদ জানাইল এবং আমেরিকার অভ্যন্তরেও পুনরায় সমালোচনা ধ্বনিত হইল। পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র স্বীকার করিলেন যে, (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) জনসাধারণের পক্ষ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন হাজার পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং উহার শতকরা ৮০ ভাগই প্রতিবাদপত্র! চারিদিক হইতে জনমতের এই চাপে পড়িয়া পুনরায় কুয়েময় ও মাৎস্থ দ্বীপ উপলক্ষে যুদ্ধের মতলব পরিত্যক্ত হইল। তবে, ফরমোজা ও চীন সম্পর্কে পূর্বেকার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতি এশিয়াতে বজায় রহিল এবং ১৯৫৬ সাল হইতে মিঃ জন ফষ্টার ডালেস্ পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘাতে, বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে "brink of war" বা যুদ্ধের কিনারা ঘেঁষিয়া চলার যে বিখ্যাত (না, কুখ্যাত?) কূটনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৯, মে) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব এশিয়া কিম্বা অন্য কোথাও তাহা শিথিল হইল না।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিদ্রোহ :

১৯৫০ হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব-এশিয়াতে একটি মানুষ অগণিত মানুষের দুঃখ, দৈন্য, অত্যাচার ও রক্তপাতের কারণ হইয়াছিল এবং এই

মানুষটির নাম ডাঃ সীংম্যান রী। বলা বাহুল্য যে, মার্কিণ সরকারী মহল ও সামরিক মহলের সমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই এই ব্যক্তি দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্টরূপে এত দুৰ্দ্ধর্ষ ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকায়ও কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই ব্যক্তিই কলকাঠি নাড়িয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়াছিল এবং ডালেস, ম্যাক-আর্থার ও তাঁদের পার্শ্বচরেরা সেই যুদ্ধের বা আকস্মিক আক্রমণের গোপন নক্সা করিয়াছিলেন। কোরিয়া যুদ্ধের যাহাতে অবসান না হয়, যাহাতে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে না পারে, তার জন্য সীংম্যান রী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, নানাভাবে প্রচণ্ড বাধা দিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট বিরোধী ২৫ হাজার বন্দীকে পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য ও মিলনেতো ক্রমাগত বাধা দিয়া আসিয়াছেন বটেই (কোরিয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং অখণ্ড কোরীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল), আমেরিকার কাছে একাধিকবার ধর্ণা দিয়াছেন চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটম বোমা বর্ষণ এবং এভাবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য। এই সমস্ত ঘটনার জন্য 'দুর্দান্ত' সীংম্যান রীকে লইয়া খাস ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষও অনেকবার বিপন্ন হইয়াছেন। একবার স্বয়ং ডালেসকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল রীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য। কিন্তু এই সমস্ত দুষমণি সত্ত্বেও রীকে মার্কিণমহল যত্ন ও সতর্কতা সহকারে লালনপালন করিতেছিলেন। কারণ, রী'র মত এত বড় কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী উন্মাদ কোরিয়াতে আর কেহ ছিল না। সুতরাং প্রশ্রয়পুষ্ট সীংম্যান রী দক্ষিণ কোরিয়াকেও স্বেচ্ছাচারের দ্বারা ক্রমশঃ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল। ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনেও তাঁর সত্যকার জয়লাভের সুযোগ ছিল না। কারণ, দক্ষিণ কোরিয়ার জনমত তাঁর পক্ষে ছিল না। নেতৃত্বটা ছিল সাজানো এবং উপর থেকে চাপাইয়া দেওয়া—যেমন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নগো দিয়েম, ফরমোজায় চিয়াং কাইসেক প্রভৃতির সাজানো নেতৃত্ব। পুলিশী রাষ্ট্রের সঙ্গীনপাণি প্রহরার ফলে ইঁহাদের নেতৃত্ব বাহ্যতঃ সুরক্ষিত। এই পুলিশী ব্যবস্থা ও চক্রান্তের ফলে ১৯৬০ সালের ১৫ই মার্চ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, তাতে চতুর্থবার প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য রী এত বেশী ভোট পাইলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার লোকেরা তাজ্জব বনিয়া গেল। শতকরা ৮৫টি ভোট রী'র পকেটস্থ হইল। অথচ ভোটদাতারা জানিত যে, রী'র পক্ষে এত ভোট কিছুতেই হইতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণের সন্দেহ ক্রমে বিক্ষোভে পরিণত

হইল। এই বিক্ষোভকে ভাষা দিল দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্রসমাজ। কোরিয়ার একটি বন্দরে প্রথমে ছাত্রেরা আগাইয়া আসিল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ। কিন্তু সীংম্যান রী'র পুলিশ জল্লাদের মত তাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। নির্মম অত্যাচারের সঙ্গে তাদের দমন করা হইল। ১৬ জন ছাত্র একেবারে নিখোঁজ হইয়া গেল। কিন্তু পরে যখন তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণীকৃত মৃতদেহ সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল, তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় জনগণ মরীয়া হইয়া উঠিল এবং সমস্ত সরকারী অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। আর পুলিশ প্রাণভয়ে লুকাইয়া রহিল।

দক্ষিণ কোরিয়ায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। হাজার হাজার ছাত্র ও যুবক রাজধানী সিওলের রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিল। আবার পুলিশী বর্বরতা স্বরু হইল। সীংম্যান রী'র প্রাসাদ-ভবনের সম্মুখে ১৮ই এপ্রিল (১৯৬০) তারিখ অন্ততঃ ৩০ জন ছাত্রকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। পরদিন আরও ৫০ জন ছাত্রকে খুন করা হইল। তখন রী'র অভিভাবক আমেরিকাও প্রমাদ গণিল এবং পরোলোকগত ডালেসের স্থলে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান্ এ হার্টার বিচলিত হইয়া রী'কে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। কারণ, তিনি অনুভব করিলেন যে, এমন নৃশংসতা চলিতে থাকিলে দক্ষিণ কোরিয়াও কম্যুনিষ্টদের দলে ঢুকিয়া পড়িবে! স্নুতরাং এই ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষ সমর্থন করাই মার্কিণ কর্তৃপক্ষ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন এবং রী'কে সাবধান করিয়া দিলেন। রী এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে পারে, ইহা 'অবিশ্বাস্য'। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটিতে লাগিল। জনমতের প্রচণ্ড ক্রোধের সম্মুখে পড়িয়া ২২শে এপ্রিল ভাইস প্রেসিডেণ্ট লী কি পুঙ্ (যাঁর অর্দ্ধাঙ্গ অবশ ছিল) পদত্যাগ করিলেন এবং রী'ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ ক্ষমতাগুলির অধিকাংশ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। পরদিন তিনি শাসক পার্টির নেতৃত্বপদে ইস্তফা দিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টের পদটি আঁকড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু ছাত্র ও যুবকেরা রী'কে ভুলিল না। এদিকে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ বাড়িয়াই চলিল এবং হতাহতের সংখ্যা দুই হাজারে দাঁড়াইল। সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হইল ছাত্রদের দমন করিবার জন্য। কিন্তু সৈন্যেরা গুলী চালাইতে অস্বীকার করিল (সৈন্যবাহিনীর বড়কর্ত্তারা গুলী চালাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন) এবং ছাত্রেরা তাদের ট্যাঙ্ক দখল করিয়া লইল। আর পুলিশবাহিনী ইতিপূর্বেই পিছনে হটিয়া গেল। মার্কিণ

রাষ্ট্রদূত আর একবার সীংম্যান রীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কারণ, এই ব্যাপক বিদ্রোহের মুখে রী তখন আমেরিকার কাছেও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সিওল এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আরও বড় বড় পাঁচটা শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িল। সামরিক আইন জারি হইল, গুলী ও গ্রেপ্তারী চলিল। কিন্তু লক্ষাধিক ছাত্রের (শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকেরাও যোগ দিয়াছিলেন) লড়াইকে ঠেকাইবার শক্তি রী' গভর্ণমেণ্টের ছিল না। ২৬শে এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল এসেম্বলী (বিধানসভা) রী'র অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করিলেন এবং মার্চ মাসের নির্বাচনকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশেষে ২৭শে এপ্রিল ৮৫ বছরের বৃদ্ধ সীংম্যান রী পদত্যাগ করিলেন এবং জনতার ক্রুদ্ধ আক্রোশ হইতে কোনমতে জীবন বাঁচাইয়া মার্কিণ সহায়তায় বিমানযোগে সস্ত্রীক পলাইয়া গেলেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনুলুলুতে।

মার্কিণ করধৃত এই পুত্তলিকা কোরিয়া ও পূর্ব এশিয়ার বহু প্রকার লাঞ্ছনা ও সর্বনাশের কারণ হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়া আজও আমেরিকার কবলমুক্ত হইতে পারে নাই এবং সেখানে আজও সত্যকার গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই।

বিদ্রোহের পথে জাপান ?

১৯৪৫ সালে জাপানকে আমরা দেখিয়াছিলাম পরাজিত, বিধ্বস্ত ও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি বন্দী জাতিরূপে। ১৯৬০ সালে সেই জাপানকে দেখিতেছি উদ্ধত, বিক্ষুব্ধ ও পূর্ণ স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরূপে। মাঝখানে ১৫ বছর কাটিয়াছে জেনারেল ম্যাকআর্থারের 'শিক্ষানবীশ' হিসাবে, মার্কিণী গণতন্ত্রের পাঠশালায় একজন পড়ুয়ারূপে। 'নাবালক' জাপান আজ 'সাবালক' হইয়াছে এবং এই সাবালকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাপান আর আমেরিকার পোষ্যপুত্র হিসাবে দূর প্রাচ্যের মার্কিণ জমিদারী পাহারা দিতে রাজী নয়। পর পর জাপানের আত্মসম্মানে ঘা লাগিতেছে—১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে এটম্ বোমার আঘাতে ধরাশায়ী জাপান বিনা সর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল। তারপর সে কার্যতঃ আমেরিকার অভিভাবকত্বে পরাধীনতাই বরণ করিয়াছিল। তার শ্রমশিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি. প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সংবিধান, এমন কি শিক্ষানীতি পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা জেনারেল ম্যাক-আর্থারের কবলিত ছিল। ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিসস্কো-সন্ধিপত্রের দ্বারা জাপান কাগজেকলমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন

করে বটে, কিন্তু সেই সন্ধিপত্রে যেমন একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতবর্ষের স্বাক্ষর ছিল না, তেমনি সার্বভৌম রাষ্ট্রিক অধিকারও তার ছিল না। কারণ, জাপানের অভ্যন্তরে যেমন মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্যসামন্ত রক্ষা করিতে হয়, তেমনি ওকিনাওয়া দ্বীপটি আমেরিকাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হয়; যেখানে আজ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসমুদ্রীয় সামরিক বলয়ের মূল ঘাঁটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালের শান্তিসন্ধির চুক্তি অনুযায়ী জাপান ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরসঙ্গী হইতে বাধ্য—যদিও মার্কিণ অভিভাকত্বে গৃহীত নূতন জাপানী সংবিধানে (১৯৪৭, ৩রা মে) যুদ্ধ, যুদ্ধায়োজন ও নিয়মিত সৈন্যদল বা আর্মি রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ! এমন কি জাপানী রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যুদ্ধায়োজনের ও 'যুদ্ধরত অবস্থা'র ঘোষণা জারির অধিকার পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। জাপানী জনগণকে "চিরতরে যুদ্ধ বর্জনের" এবং 'বলপ্রয়োগের অধিকার' পরিত্যাগের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। কেবল আহ্বান নয়, সংবিধান অনুযায়ী জাপানী রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে আইনতঃ বাধ্য করা হইয়াছে এবং সংবিধানের আক্ষরিক বিচার করিলে জাপান আজ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘোষিত 'অহিংস রাষ্ট্র'—একেবারে ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক রাষ্ট্র! কারণ, নূতন জাপানী সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদ পড়িয়া দেখুন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবেন। এই অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হইয়াছে: "Aspiring sincerely to an internationnl peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes, In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized."

সোজা কথায় সংবিধান অনুসারে জাপান আজ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকৃত, নিরামিষাশী, নিরীহ জাতি মাত্র। তথাপি গত তিন মাসে জাপানকে লইয়া সাত সমুদ্রের জল এত ঘোলা হইল কেন এবং কেনইবা জাপানী জনগণের বিক্ষোভ জাপানের প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিখ্যাত টাইফুনের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানী জনগণের এমন 'সর্বনাশা' মূর্তি আর কখনও দেখা যায় নাই। এই টাইফুন বা সামুদ্রিক তুফানের পাল্লায় পড়িয়া

আইসেনহাওয়ার ভাসিয়া গেলেন, হ্যাগার্টি অপদস্থ হইলেন এবং কিশি অপসারিত হইলেন।

১৯৫১ সালের মার্কিণ-জাপান নিরাপত্তা চুক্তিই বর্তমানে সংশোধিত আকারে উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির বলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আগের মতই মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য জাপানের অভ্যন্তরে রাখিতে পারিবে এবং যদি এই ঘাঁটি কখনও তৃতীয় কোন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে, জাপান ও আমেরিকা একত্রে উহা প্রতিরোধ করিবে। অবশ্য জাপান আক্রান্ত হইলেও আমেরিকা তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু দূরবর্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষার দায়িত্ব জাপানের নাই। তথাপি এই চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে এমন সর্বাত্মক আন্দোলন কেন এবং কেনইবা প্রধানমন্ত্রী কিশিকে পদত্যাগে বাধ্য করা হইল?

ইহার প্রথম কারণ এই যে, আপন দেশের অভ্যন্তরে বিদেশের সৈন্য ও সামরিক ঘাঁটি রক্ষা করিতে দেওয়া পরাধীনতার চিহ্ন—সার্বভৌম স্বাধীনতার নহে। অর্থাৎ ইহা একান্তরূপে জাতীয় সম্মানের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ চুক্তির সর্তানুসারে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি আক্রান্ত হইলে জাপানকে উহা রক্ষা ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ আমেরিকার ঘাঁটি রক্ষার জন্য জাপানকে তার সৈন্যসামন্ত দিয়া লড়িতে হইবে! বিদেশী স্বার্থের জন্য স্বদেশের রক্তপাত করিতে হইবে। এমন সর্ত নিশ্চয়ই যে কোন জাতির পক্ষে আত্মাবমাননাকর এবং হীনতার পরিচায়ক! তৃতীয়তঃ জাপানের মার্কিণ ঘাঁটিসমূহ হইতে যদি কমিউনিষ্ট চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন সামরিক কার্যকলাপ চালানো হয় কিম্বা 'ইউ-২' গোয়েন্দা বিমানের মত কোন গুপ্তচরবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়, তবে, স্বভাবতই চীন ও রাশিয়ার পক্ষ হইতে পাল্টা জাপানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত আসিবে। অর্থাৎ মার্কিণ ঘাঁটির জন্য জাপান চীন বা রাশিয়ার হাতে মার খাইবে! এমন অদ্ভুত অবস্থা কোন সচেতন জাতি মানিয়া লইবে কেন? চতুর্থতঃ যেহেতু আমেরিকা ও চীনের মধ্যে বিরোধ আছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নয়াচীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতেছেন না, অধিকন্তু ফরমোজাকেই একমাত্র চীনরাষ্ট্র বলিয়া চালানো হইতেছে, সেই হেতু জাপানও নয়াচীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিতেছে না। অথচ নয়াচীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বর্তমান জাপানের কোন শত্রুতা নাই। বরং জাপানের বহু ব্যবসায়ী ও শ্রমশিল্প এবং কলকারখানার কারবারি মহাচীনের সুবৃহৎ বাজারের সঙ্গে আদানপ্রদান করিতে চাহেন।

কারণ, উহা দ্বারা নূতন অর্থনৈতিক বিস্তারের পথ খুলিয়া যাইবে। কিন্তু জাপান-মার্কিণ চুক্তির জন্য এই সুবৃহৎ বাজারের দ্বার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং দুইটি প্রাচীন প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিক আদান প্রদান অবরুদ্ধ রহিয়াছে। জাপানের নতুন জনমত এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহে। পঞ্চমতঃ বর্তমান জাপান কোন সামরিক শিবিরে বা যুদ্ধ-ব্লকে যোগ দিতে চাহে না। কারণ, মহাযুদ্ধের অনিবার্য ধ্বংসকাণ্ড জাপান হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। সুতরাং বর্তমান জাপানও ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মিশর বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ইত্যাদির মত নিরপেক্ষতা ও জোটবদ্ধহীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহে। কারণ, এই নীতিই যেমন জাপানের আত্মরক্ষার পক্ষে সর্বোত্তম গ্যারেন্টি, (কার্যতঃ জাপানকে কেইই আক্রমণ করিতে চাহিতেছে না) তেমনি শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিজের দেশকে গড়িয়া তোলার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মার্কিণ-জাপান নিরাপত্তা চুক্তি এই নিরপেক্ষ শান্তিনীতির বিরোধী। ষষ্ঠতঃ আমেরিকার হাতে জাপান অতি ভয়াবহ এবং অসম্মানজনক মার খাইয়াছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আমেরিকাই প্রলয়ঙ্কর এটম বোমা ফেলিয়া অমানুষিক হত্যালীলা ও ধ্বংসকাণ্ড ঘটাইয়াছিল, যার জের আজও মিটে নাই। (এই সেদিনও ১৫ বছর পর এটম বোমার তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে দুইজন জাপানীর মৃত্যু হইয়াছে।) প্রধানতঃ এই এটম বোমার আঘাতেই জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং এই আত্মসমর্পণ ঘটিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ম্যাকআর্থারের (অবশ্য মিত্রশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে) নিকট। সুতরাং জাপান যেমন এটম বোমা ভুলিতে পারে না, তেমনি আত্মসমর্পণের গ্লানিও বিস্মৃত হইতে পারে না। জাপানীরা অত্যন্ত আত্মাভিমানী স্বদেশপ্রেমিক জাতি —শ্রমশিল্পে, কৃষিকার্যে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং চারুকলা ও কারুকলায় এশিয়া মহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জাতি। সেই জাপান কেন দীর্ঘকাল আমেরিকার মাতব্বরি মানিয়া লইবে ? তারপর যদি 'একক' অর্থাৎ আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়াই জাপানের আত্মরক্ষার প্রশ্ন উঠে, তবে, ইদানীং জাপানীরা জবাব দিতেছে যে, তারা নিজেরাই তাদের দেশ রক্ষা করিবার শক্তি রাখে। এমন কি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিবার শক্তিও জাপানের আছে। জাপানী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই কিম্বা ১৯৪৪ সালে পরলোকগত জাপানী বিজ্ঞানী ডাঃ নিশিনা পারমাণবিক শক্তি বিস্ফোরণের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যদি উপযুক্ত পরিমাণ

ইউরেনিয়াম পাওয়া যাইত, তবে, জাপান আমেরিকার আগেই ২০ হাজার টন ডিনামাইটের শক্তির তুল্য এটম বোমা (অর্থাৎ হিরোসিমার বোমার সমান) প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিতে পারিত। আধুনিক জাপানের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ ইয়ুকাওয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ সুযোগ সুবিধা পাইলে এটম বা হাইড্রোজেন বোমা কিম্বা অস্ত্রাদি তৈয়ার করিতে পারেন। সুতরাং আধুনিক যুগে আত্মরক্ষার প্রশ্নেও জাপান একক প্রতিরোধের শক্তি রাখে এবং ইহার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত কারণের জন্যই জাপানী জনমতের বৃহত্তম অংশ মার্কিণ-জাপান নিরাপত্তা চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, কিশি গভর্ণমেণ্ট এমন একটা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন কেন, যাহা জাপানী জনমতের অভিপ্রেত নয়? ইহার কারণ এই যে, বর্তমান জাপানের শাসকগোষ্ঠী পুরানো আমলের ধারক ও বাহক। মিঃ নবুস্কি কিশি লিবারেল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্তর্গত। এই 'উদারনীতিক গণতন্ত্রী' দলটি নামে যাহাই হউক না কেন, আসলে ইহারা হইতেছে মহাযুদ্ধের আগেকার দুইটি বৃহত্তম রক্ষণশীল দলের উত্তরাধিকারী। যে অভিজাত, ঐশ্বর্যশালী ও কলকারখানা এবং শ্রমশিল্পের মালিকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ও যুদ্ধ বিস্তারের জন্য পূর্ব-এশিয়ার নানা দেশে হানা দিয়াছিল, তারা 'সিজুকাই' ও 'মিনসেইটু' নামক দুইটি প্রধান রক্ষণশীল দল কর্তৃক পরিচালিত হইত এই প্রাক্তন সিজুকাই ও মিনসেইটু দলের উত্তরাধিকারিগণই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্তমান লিবারেল-ডেমোক্রাট পার্টি গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, জাপানী সমাজের উচ্চতর স্তরে ইহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী। কারণ, ইহারা বর্তমান জাপানের ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র স্বরূপ। এই ধনিক শ্রেণী বা জেইবাৎসু পার্লামেণ্টারি সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল-ডেমোক্রাট পার্টির ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন। প্রধানতঃ জেইবাৎসুর তরফ হইতে গত ১৯৫৯ সালের প্রথমার্ধে এই পার্টি ফাণ্ডে ১২৬০ মিলিয়ন ইয়েন জমা পড়িয়াছে। অপর দিকে সোসিয়েলিষ্ট পার্টির নির্বাচনী ভাণ্ডারে ১৩০ মিলিয়ন ইয়েন, আর কমিউনিষ্ট পার্টি ফাণ্ডে মাত্র ৪৭ মিলিয়ন ইয়েন চাঁদা উঠিয়াছে। ১৯৫৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাপানের একচেটিয়া কারবারের ক্রোরপতির দল লিবারেল-ডেমোক্রাট পার্টিকে ৪৮০ মিলিয়ন ইয়েন চাঁদা দিয়াছেন। সুতরাং নির্বাচনী যুদ্ধে এই পার্টির সঙ্গে পারিয়া উঠা কঠিন। কারণ, টাকা ছড়াইয়া ভোটে জয়লাভ

করার কৌশল ইহাদের জানা আছে। বিগত পার্লামেন্টারি নির্বাচনে (১৯৫৮) প্রতিনিধি-পরিষদের মোট ৪৬৭টি আসনের মধ্যে একা লিবারেল-ডেমোক্রাট পার্টিই ২৮৮টি আসন লাভ করিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে এই পার্টি ১৩৭টি আসন দখল করিয়াছেন। অবশ্য বিরোধী দল হিসাবে সোসিয়েলিষ্ট পার্টিই সর্বাধিক শক্তিশালী। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৯ মাসের জন্য ইহারা শাসন ক্ষমতাও হাতে পাইয়াছিলেন। (কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে রক্ষণশীল শক্তিগুলি একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।) বিগত সাধারণ নির্বাচনে সোসিয়েলিষ্ট পার্টি প্রতিনিধি পরিষদে ১৩০টি আসন এবং উচ্চতর পরিষদে ৮৪টি আসন দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু গত বছরের (১৯৫৯) শেষভাগে সোসিয়েলিষ্ট পার্টি দক্ষিণে ও বামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণপন্থী গ্রুপের নেতা হইতেছেন মিঃ নিশিও, যদিও এই উপদলটি খুব ছোট্ট এবং ডেমোক্রাটিক্ সোসিয়েলিষ্ট পার্টি নাম ধারণ করিয়াছে, তথাপি মূল সোসায়েলিষ্ট পার্টি ইহার ফলে কিছুটা দুর্বল হইয়াছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রজা-সোসিয়েলিষ্ট পার্টির যে সম্পর্ক ও আঁতাত রহিয়াছে, জাপানের শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে এই নূতন দক্ষিণপন্থী ডেমোক্রাটিক্ সোসিয়েলিষ্ট পার্টিরও সেই ভূমিকাই রহিয়াছে। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া নিশিও'র এই উপদলটিও জাপান-মার্কিণ চুক্তির বিরোধিতা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আমেরিকায় এবং আমাদের দেশের বহু জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ও নেতা জাপানের বর্তমান আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের নষ্টামি, চীন কর্তৃক প্ররোচনা দান ও গোপনে প্রভূত আর্থিক সাহায্য দান—অর্থাৎ সাম্যবাদীগণ কর্তৃক জাপানী যুবক ও জনগণকে ক্ষেপাইয়া তোলার অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগ ও রটনার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। কারণ, জাপানে কমিউনিষ্টরা আদৌ শক্তিশালী নহেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মাত্র একজন জাপানী কমিউনিষ্ট পার্লামেন্টে নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন এবং সমস্ত ভোটের শতকরা মাত্র ২টির বেশী লাভ করিতে পারেন নাই।- সুতরাং কমিউনিষ্টদের নষ্টামির কথা বলা নিতান্তই বাড়াবাড়ি মাত্র। কেবল তাহাই নহে, ইহা দ্বারা কমিউনিষ্টদের সেই শক্তি স্বীকার ও প্রচার করা হইতেছে, যে শক্তি তাদের নাই! তথাপি জাপানের এই বিক্ষুব্ধ আন্দোলন এত গভীর ও ব্যাপক হইল কিরূপে? হিরোসিমা ও নাগাসাকির জন্য জাপানে এটম বোমা বিরোধী আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলন খুব ব্যাপক ও

শক্তিশালী, (ইঁহাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক আন্তর্জাতিক বৈঠকে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎ হইয়াছে) এবং এই আন্দোলন মুখ্যত মার্কিণ রণনীতি ও যুদ্ধায়োজনের বিরোধী।* তারপর রহিয়াছে জাপানের "সোহিও" বা ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইহার সদস্য সংখ্যা ৫০ লক্ষ। কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের দেশ বলিয়া জাপানে শ্রমিক ও মজুরের সংখ্যা প্রচুর এবং ইহারা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। এই ৫০।৬০ লক্ষ শ্রমিক-মজুর-কর্মচারী সোসিয়েলিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন এবং ইহারাও মার্কিণ সামরিক প্রস্তুতি ও চুক্তির বিরোধী। তারপর যুব-সমাজ, ছাত্রদল, শিক্ষক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবিগণ, এমন কি কোন কোন বৃহৎ দৈনিক পত্রিকা পর্যন্ত জাপান-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি সম্পর্কে কিশি মন্ত্রিসভার অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর খড়্গহস্ত। ইঁহারাই একত্রে বারবার জাপানে বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটাইয়াছেন। সাম্প্রতিক কালের জাপানের ইতিহাসে এমন ব্যাপক আন্দোলন আর ঘটে নাই—যে আন্দোলনে ছাত্রদের 'সর্পনৃত্য' একটা নূতন রোমাণ্টিক অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এবং জাপানী ছাত্র, শিক্ষক ও ট্রেড ইউনিয়নিষ্টগণ এই উপলক্ষে সারা এশিয়ায় এক নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সমবেত চাপে পড়িয়া মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের প্রেস-সেক্রেটারী মিঃ হ্যাগার্টি এবং মার্কিণ রাষ্ট্রদূত টোকিওর বিমান-বন্দরে কার্যতঃ বন্দী ছিলেন, (এবং পরে একটি মার্কিণ হেলিকপ্টারের দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন।) ১৬ই জুন তারিখ মিঃ কিশি মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের টোকিও সফর বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হন। অথচ মিঃ আইসেনহাওয়ারকে আনাইবার জন্য কিশি মন্ত্রিসভা অপূতপূর্ব জেদ প্রকাশ করিতেছিলেন। টোকিও বিমান-বন্দর হইতে ৩৬ হাজার পুলিশ দিয়া আইকের যাত্রাপথ ঘিরিয়া রাখা হইবে, বুলেট নিরোধক মোটর গাড়ী ব্যবহৃত হইবে এবং 'মানুষের শক্তিতে যত প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্ভব' তার সমস্তই আইকের টোকিও ভ্রমণের জন্য অবলম্বিত হইবে—মিঃ কিশির ইহাই ছিল প্ল্যান। কিন্তু এই সমস্ত প্ল্যানই জনমতের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেল এবং আইকের আর টোকিও যাওয়া হইল না।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের মত একজন মানী লোকের পক্ষে এই প্রকার ঘটনা নিশ্চয়ই খুব অসম্মানজনক কিম্বা লজ্জাকর। বিশেষতঃ ১৬ই মে তারিখ প্যারিসের সামিট কনফারেন্সের কেলেঙ্কারি এবং ক্রুশ্চেভ কর্তৃক আইকের

* ১৯৬১, আগষ্ট মাসে টোকিওর বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত ও বিশ্বশান্তি-সংসদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে বর্তমান লেখক যোগদান করিয়াছিলেন।

রাশিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ বাতিল হওয়ার পর জাপানের ঘটনা নিরতিশয় ক্লেশকর।* কিন্তু এই সমস্ত অভূতপূর্ব ঘটনা সত্ত্বেও মিঃ কিশি কিভাবে জাপানী-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ ও অনুমোদন করিয়া ছাড়িলেন? ইহার কারণ এই যে, তাঁর পার্টি পার্লামেণ্টে বা ডায়েটে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের অধিকারী—একেবারে নিরঙ্কুশ মেজরিটি। সুতরাং সংসদে বা আইনগতভাবে তাঁকে বাধা দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। এইজন্য তিনি বরাবর দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চুক্তির চূড়ান্ত গ্রহণের আগে তিনি কিছুতেই পদত্যাগ করিবেন না। ২৩শে জুন তারিখে তিনি পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন বটে, কিন্তু উহার কয়েক ঘণ্টা আগে জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর গৃহে ৬০০ পুলিশের পাহারায় জাপানী-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন ও দুই দেশের মধ্যে উহার বিনিময় হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই মুহূর্ত হইতেই আইনতঃ ইহা কার্যকরী হইল।

এশিয়া মহাদেশে জাপান খুব ঐশ্বর্যশালী দেশ বলিয়া সুনাম আছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে বর্তমান লেখক যখন জাপানে গিয়াছিলেন, তখন জাপানের ঐশ্বর্যের চেয়ে জনসাধারণের দারিদ্র্যই তাঁর মনের উপর বেশী রেখাপাত করিয়াছিল। এজন্য বর্তমান লেখকের মনে জাপানী ঐশ্বর্য সম্পর্কে একটা খট্‌কা ছিল। আপাততঃ বিভিন্ন সূত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঐ ঐশ্বর্যটা উপরের দিকে—জনসংখ্যার একটি মাইনরিটি এই বিপুল বিত্ত ও ধনাঢ্যতা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মেজরিটি গরীব—যদিও এই মেজরিটির সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আধুনিক জাপানের শতকরা ৩৫ জন লোক দেশের উৎপাদনের শতকরা ৫৮ ভাগ ভোগ করিয়া থাকে, আর শতকরা ৬৫ জনের জন্য বাকী রহিল মাত্র শতকরা ৪২ ভাগ। সুতরাং জাপান অতি স্পষ্টরূপে দুইটি অংশে বিভক্ত—বড়লোক জাপান ও গরীব জাপান। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন এই জাপানীদের মধ্যে পড়েন শতকরা ৩৫ জন এবং কার্যতঃ ইঁহারাই আমেরিকার সহযোগী ও সহযাত্রী এবং ইঁহারাই গভর্ণমেণ্টের মেরুদণ্ড।

* বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া—এই চরি রাষ্ট্র প্রধানের প্যারিসে বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রাশিয়ার আকাশে 'ইউ—টু' নামে একটি মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ধরা পড়িয়াছিল। ফলে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হন এবং মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নিকট এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানান। এমন কি, ক্রুশ্চেভ আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে করমর্দ্দণে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হন। ফলে, বৈঠক আরম্ভ হওয়ার আগেই ভাঙ্গিয়া যায়।

এই 'বড়লোক জাপান' আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তির মারফৎ কমিউনিজম, চীন ও রাশিয়ার কবল হইতে ত্রাণ পাইতে চাহে! আর সত্যের খাতিরে একথাও বলিতে হইবে যে, পশ্চিম জার্মানীর মত জাপানও আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রমশিল্পের বিস্ময়কর পুনর্গঠন করিতে পারিয়াছে।* আমেরিকার বাজার জাপানের নিকট খোলা হইয়াছে এবং আমেরিকার মূলধন, কারিগরী বিদ্যা, যন্ত্রবিশেষজ্ঞতা এবং ব্যবসা-পরিচালনা সংগঠন, অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্ট ইত্যাদির সহায়তায় জাপানী ধনিকশ্রেণী যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন এবং নূতন নিরাপত্তা চুক্তির আগে তাঁরা আমেরিকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি গোপন বুঝাপড়া করিয়াছেন, যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী ধনিকরা নূতন বাণিজ্য প্রসার করিতে চান। মার্কিণ শিল্পপতিরা এই বিষয়ে তাঁদের সহযোগী হইবেন। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, কিশি গভর্ণমেণ্ট ও জাপানের বড়লোকেরা আমেরিকার সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি চাহিবেন। আর পার্লামেণ্টে ইহাদেরই ভোটাধিপত্য। অতএব সেই দিক দিয়া কোন অসুবিধা নাই। এমন কি কিশির প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে বিদায় লওয়ার পরও সরকারী স্তরে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। এমন কি, পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সম্ভবতঃ গদীচ্যুত হইবে না। কারণ, ইহারা প্রভাবশালী।

কিন্তু জাপানের যে অংশ গরীব এবং যারা মেজরিটি, তারা আমেরিকার কাছ হইতে বিশেষ কোন সহায়তা পায় নাই। তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। তাদের মধ্যে ৭০ লক্ষ লোক নিতান্ত দরিদ্র—অর্দ্ধ বেকারের সংখ্যাও প্রচুর। এই 'দরিদ্র জাপানের' মধ্যে রহিয়াছে মজুর, কর্মচারী, ছোট ছোট দোকানদার, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও চাষীদের একটি বড় অংশ। ইহারা আমেরিকার বিরোধী। কারণ, ইহাদের বিশ্বাস যে, আমেরিকার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিলে একদিন সমগ্র জাতি বিপন্ন হইবে। নূতন করিয়া যুদ্ধ ও ধ্বংসের মুখে পড়িতে হইবে। সুতরাং 'নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি' ইহাদের কাম্য এবং ইহারা চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে চাহেন। এই 'গরীব জাপান'ই মার্কিণ-বিরোধী আন্দোলনে সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি এই আন্দোলন এত

* ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে বর্তমান লেখক পুনরায় জাপান পরিদর্শন করিয়া জাপানের এই সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছেন।

দূরপ্রসারী হইয়াছে যে, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে জাপান ও পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা দেখা দিয়াছে। পররাষ্ট্র বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিণ সমালোচক মিঃ ওয়াল্টার লিপম্যান প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে জাপান ও দূরপ্রাচ্য নীতির পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা, ২৯শে জুন।) মিঃ লিপম্যানের মতে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদির মত জাপানের পক্ষেও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে আমেরিকার সমর্থন করা উচিত। কারণ, আমেরিকার বর্তমান রণনীতি এশিয়াতে আদৌ জনপ্রিয় নয়, বরং ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যাইতেছে। মিঃ লিপম্যানের মতামতের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, সন্দেহ নাই। আমাদেরও বিশ্বাস জাপানের জনমতের বর্তমান বিদ্রোহ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতি ও রণনীতির বিরুদ্ধে। জাপান শান্তির পথে সমৃদ্ধি চায়, যুদ্ধের পথে ঐশ্বর্য ও ধ্বংস চায় না।

—জুন, ১৯৬০

১৯৬০ সালে জাপানের এই রুদ্রমূর্তির পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত জাপানের আভ্যন্তরীণ জীবনে কিম্বা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তেমন কোন উঠানামা ঘটে নাই। তবে, জাপানের বৈষয়িক সমৃদ্ধি অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে জাপানের নতুন সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল-ডেমোক্রাট পার্টি ২৯৭টি আসন, সোসিয়েলিষ্ট পার্টি ১৪৫, ডেমোক্রাটিক সোসিয়েলিস্ট ১৬, কমিউনিষ্ট ৩ এবং অন্যান্যরা ৬টি আসন পাইয়াছে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয় এবং হায়াতো ইকেদা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

জাপানের আয়তন ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৪৪ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা (১৯৬০ অক্টোবর) ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬ হাজার ৮৩০, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতি হইতেছে ২৫১·৮ জন। জাপানের আয়তনের তুলনায় এই লোকসংখ্যা একটি সমস্যার (পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী) মত এবং জাপান যে, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফরমোজা ইত্যাদি দখল করিয়াছিল, তার স্বপক্ষে এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার "যুক্তি" দেখানো হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে রাজধানী টোকিওর জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর আর কোন শহরে বা রাজধানীতে এত জনবসতি নাই।

——০:০——

চতুর্থ অধ্যায়

চীন-ভারত সম্পর্ক

স্বাধীন এশিয়ার তুইটি বৃহত্তম রাজ্য ভারতবর্ষ ও চীন। কিন্তু গত ১৩ বছর এই তুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের যে অদ্ভুত উঠানামা ঘটিয়াছে এবং বার বার যে নাটকীয় চাঞ্চল্যের স্বষ্টি হইয়াছে, এশিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি ও প্রকৃতির পথে তার পর্যালোচনা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কের তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় রহিয়াছে। এক অধ্যায়ে মৈত্রী ও শান্তি এবং অন্য অধ্যায়ে বিরোধ ও অশান্তি, আর তৃতীয় অধ্যায়ে চীন-ভারত যুদ্ধ। প্রথমতঃ মৈত্রী ও শান্তি হইতেই এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের সুত্রপাত হইয়াছিল। সুতরাং সেটাই আগে আলোচ্য।

ভারত-চীন মৈত্রী ঃ

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে নয়াচীনে চিয়াংকাইশেকের শাসনের অবসান হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও চীনের কম্যুনিস্ট-আধিপত্য প্রায় কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তর্ক উঠিতে পারে যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির অধীন, ঔপনিবেশিক শাসনের রজ্জুতে আবদ্ধ। কিন্তু চীন তো বৈদেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে ছিল চিয়াংকাইশেকের রাজত্ব কিম্বা স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন। সুতরাং ভারত ও চীনের মধ্যে কিভাবে তুলনা দেওয়া যায়? একথা ঠিক যে, চীনে একটা স্বদেশী গবর্ণমেণ্ট ছিল এবং তার নায়ক ছিলেন জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাইশেক, যিনি কুওমিণ্টাং দলের অধিপতি। এমন কি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেও এই গবর্ণমেণ্টের একটা স্বাধীন রাষ্ট্রিক মর্যাদা ছিল এবং ছিল বলিয়াই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক, সন্ধিচুক্তি ইত্যাদি এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চিয়াং-কাইশেকের আমলে কাগজেপত্রে 'স্বাধীন চীন রাষ্ট্র' লেখা থাকিলেও আসলে উহার কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। গোটা মাঞ্চুরিয়া রাজ্য, উত্তর-চীনের একটা প্রকাণ্ড অংশ, কোরিয়া এবং ফরমোজা বা তাইওয়ান—একত্র যোগ করিলে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বড়

বড় রাজ্যকে ছাড়াইয়া যাইবে—এগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে জাপান কবলিত। বাকী অংশে ছিল আমেরিকার প্রভুত্ব এবং সেই সঙ্গে বৃটেনেরও। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর বিখ্যাত সাংহাই ছিল বিদেশীদের হাতে কিম্বা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের অধীন (আজও হংকং বন্দর সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ কবলিত)। অন্যান্য বন্দরে, বড় বড় শহরে, জলপথে, জাহাজঘাটে ও রেলওয়ের বড় বড় কেন্দ্রে বিদেশীদের ছিল প্রচুর প্রভুত্ব। অবশ্য এই সমস্তই 'আইন অনুসারে' চীনা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাকী ভূখণ্ডেরও অধিকাংশ অঞ্চল বিভিন্ন 'ওয়ার লর্ডদের' মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং তারা ইচ্ছামত শাসন চালাইত। কার্যতঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মহাচীন ইঙ্গ-মাকিণ-জাপানী-রুশ-ফরাসী-জার্মাণ ইত্যাদি শক্তিসমূহের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। অবশ্য রুশ-ফরাসী-জার্মাণ অধিকার দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের আগেই লুপ্ত হইয়াছিল। শেষ পর্যায়ে প্রধানতঃ ছিল জাপান ও আমেরিকা—দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পর এই শক্তিই চীনের ভূভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের পূর্ব পর্য্যন্ত চীন ভারতবর্ষের তুলনায় নামে স্বাধীন থাকিলেও কাজে কোন সার্বভৌম অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র ছিল না। মাও সে-তুঙের পার্টির ঘোরতর বিরোধী আজ আমরা। কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তব অবস্থার বিচারে উপরোক্ত সত্যকে খণ্ডন করা যায় না। বরং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের একচ্ছত্র শাসন, আইন ও শৃঙ্খলা, যোগাযোগ কিম্বা রেলওয়ে ও রাস্তাঘাট এবং আধুনিক শিক্ষা ও স্কুল-কলেজ আর ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি—এগুলি বিচার করিলে চিয়াংকাইশেকের 'স্বদেশী' চীনের চেয়ে বৃটিশ-ভারত অনেক বেশী উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর পিকিংয়ে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ্ কর্তৃক নয়াচীনের 'পিপলস্ রিপাব্লিক' প্রতিষ্ঠা কার্যতঃ চীনের জনগণের বৈদেশিক ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ।

প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে যোগাযোগ ছিল, তাহা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন। ভূমিপথে হিমালয় ডিঙ্গাইয়া কিম্বা সমুদ্রপথে বঙ্গোপসাগর ও চীন-সাগর পাড়ি দিয়া এই দুই উপমহাদেশের মধ্যে পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক কিংবা বণিকদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড রোমাঞ্চকর অধ্যায় জুড়িয়া আছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষ ও চীন এবং পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও বাণিজ্যিক

যোগাযোগ ছিল দুই হাজার বছরের। অবশ্য এই প্রাচীন যোগসূত্র ও পারস্পরিক বিনিময় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বৃটিশ আমলের প্রায় দুইশত বছর—যখন এশিয়ার সর্বত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠনে ও শোষণে ব্যস্ত ছিল এবং এশিয়ার রাজ্যগুলি পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পরাধীনতার যুগে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে না, তার হৃদয় মন ও আত্মা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং জাতিগত দৈন্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে, তখন সে খোলা মন লইয়া অপরের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, মিশিতে পারে এবং ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। কিন্তু অসুস্থ ও পঙ্গু মানুষ নিজের দুর্বিসহ অস্তিত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সুতরাং বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগও থাকে না। এই দশাই ঘটিয়াছিল এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যের গত দুই বা তিন শত বছর ধরিয়া। চীন ও ভারতবর্ষ পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতকের অর্ধ ভাগ কিংবা মোটামুটি ১৯৫০ সাল হইতে ইতিহাসের নূতন অধ্যায় খুলিতে আরম্ভ করে। স্বাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীন চীন পরস্পরের সঙ্গে আবার হাত মিলাইতে সুরু করে। গত ৮।১০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে যেন ওলট পালট ঘটিয়া গিয়াছে এবং এশিয়ার মানচিত্র নতুন করিয়া আঁকা হইয়াছে। এই নতুন মানচিত্রের দিকে তাকাইলে ভারতবর্ষ ও চীনের মৈত্রীবন্ধনকে এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের মত মনে হইবে।

কিন্তু বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গেলেও উভয়ের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং সেই সহানুভূতির সাধারণ ভিত্তিভূমি ছিল এশিয়ায় বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে এবং ১৯২৭ সালে যখন ব্রুসেল্সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (Congress of the League Against Imperialism) অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তখন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিগণ একত্রে একটি সম্মিলিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন—যে ঘোষণা ছিল চীনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের বিরুদ্ধে। ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হইলে ভারতবর্ষ সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য জাপানী পণ্যদ্রব্যের বয়কট ঘোষণা করে। ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস

তিব্বতের মত নেপাল সম্পর্কেও ভারতের মনোভাব 'স্পর্শকাতর' এবং গত কয়েক বছর নেপালে যে প্রভূত রাজনৈতিক পরিবর্তন ও উঠানামা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াছে।

আসলে নয়াচীন পুরাণো চীনের মতই পররাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক ধারাগুলি অনুসরণ করিতেছে—যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদী কিম্বা তারও পূর্বেকার চীন সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও লক্ষ্য যেমন ছিল জাপান ইন্দোচীন শ্যাম ব্রহ্মদেশ ফরমোজা কোরিয়া ও তিব্বত, আজিকার নয়াচীনের পররাষ্ট্র নীতিও এই দেশগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। আর ভারতবর্ষের স্বার্থের সীমানাও আসিয়া মিশিয়াছে তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমানায়। তিব্বত লইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যেমন কিছুকালের জন্য মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল, তেমনি কোরিয়ার ব্যাপারেও কিছু কিছু নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যখন উত্তর-কোরিয়াকে দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণের জন্য দায়ী করা হয়, তখন ভারতবর্ষ ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। কিন্তু পরে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে যেমন সে যোগ দেয় নাই, তেমনই গোড়া হইতেই ভারতবর্ষ যুদ্ধের অবসান ও শান্তির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল এবং এজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক মঃ স্টালিন ও মার্কিন পররাষ্ট্রসচিবের নিকট প্রধানমন্ত্রী নেহরু তার পাঠাইয়াছিলেন। এজন্য পশ্চিমী জগতে যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ম্যাক-আর্থারের-বাহিনী যখন উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ পানিক্করের নিকট পিকিং সরকার জানাইয়া দেন যে, ইউ-এন বাহিনী যদি ৩৮নং অক্ষরেখা অতিক্রম করে, তবে চীনা সৈন্যেরা কোরিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিবে। কিন্তু ভারত সরকারের মারফৎ প্রাপ্ত এই সতর্কবাণী ইঙ্গ-মার্কিন মহল উপেক্ষা করেন এবং নভেম্বর মাসে ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদল ইয়ালু নদীর অদূরে চীনা সৈন্যদের হাতে পরাজয় বরণ করে। এই ঘটনায় (অর্থাৎ ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রচারিত চীনের সতর্কবাণীতে) ভারত সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে থাকেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আরব-এশীয় গ্রুপ এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রসঙ্গে আসল ফ্যাসাদ বাধিল যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ লইয়া। বহু প্রস্তাব, আলোচনা ও

গবেষণা হইল, কিন্তু যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত ভারতীয় প্রস্তাবের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব কোন পক্ষই পেশ করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ সকলের পক্ষে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এবং আপোষ-মীমাংসার নিম্নতম সর্তরূপে ভারতীয় প্রস্তাব নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু সোভিয়েট-রাশিয়ার উহা পছন্দ না হওয়ায় কার্যতঃ প্রায় দুই বছর ধরিয়া কোন মীমাংসা হইল না। কিন্তু ১৯৫৩ সালে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রস্তাবই সোভিয়েট-রাশিয়া এবং নয়াচীন মানিয়া লইল এবং কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিল। সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধের প্রশ্নে ভারতবর্ষের ভূমিকা যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ এবং প্রশংসাব্যঞ্জক ছিল। সম্ভবতঃ ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির সময় হইতেই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পরিপোষক হইয়া উঠে। চীন ও ভারতের আপাত মৈত্রীবন্ধন ইহার পরেই দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনের যুদ্ধেও (ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে) ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কোরিয়ার মত ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতিতেও ভারতবর্ষের আপোষচেষ্টা সাফল্য অর্জন করে।

১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল তিব্বত সম্পর্কে ভারত ও চীনের মধ্যে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং যাহা দ্বারা এই শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইয়াছিল, উহার ভূমিকায় পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং ইহাই পরবর্তী কালে পঞ্চশীল নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। সেই বহুল প্রচারিত ও বহু বিজ্ঞাপিত পাঁচটি নীতি হইতেছে এই :

(১) পরস্পরের রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ও ভূমিগত অখণ্ডতার প্রতি পরস্পরের মর্যাদা

(২) অনাক্রমণ

(৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা

(৪) পারস্পরিক সমান অধিকার ও পরস্পরের হিতসাধন এবং

(৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।

এই পাঁচটি নীতি এশিয়া ও ইউরোপীয় মহাদেশের অধিকাংশ রাজ্য সমর্থন করিয়াছেন, এমন কি যাঁরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁরাও মূল নীতিগুলির অনুমোদন করিয়াছেন। কিছু কাল পূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউ এন) একটি প্রস্তাবেও এই পঞ্চশীলের প্রতি সমর্থন জানানো হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলন হইতে নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই ভারত সরকারের আমন্ত্রণে

নয়াদিল্লীতে আগমন করেন এবং ২৮শে জুন তারিখে দুই প্রধান মন্ত্রী—নেহরু ও চৌ এন-লাই একত্রে যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তাহাতে এই পঞ্চশীলের নীতিকে চূড়ান্তরূপে অনুমোদন করা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবে পঞ্চশীলের সঙ্গে চৌ-নেহরুর নাম যুক্ত হইয়া আছে, যাহা চীন-ভারত মৈত্রী ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের মত। প্রকৃতপক্ষে নব যুগের চীন-ভারত মৈত্রীর আসল ভিত্তিই ছিল এই পঞ্চশীলের নীতি। এবং মূলতঃ এই নীতির উপর দাঁড়াইয়াই ভারতবর্ষ তার পররাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক নীতির অনুসরণ করিতেছে। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী চীন পরিদর্শনে গেলে অন্ততঃ ১০ লক্ষ চীনা নরবারী শ্রীনেহরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, যাহা কোন বিদেশী নেতার ভাগ্যে এ পর্যন্ত ঘটে নাই। (সোভিয়েট-রাশিয়াতেও শ্রীনেহরু ১৯৫৫ সালে অনুরূপ সম্বর্ধনা পাইয়াছিলেন)। আবার চীনের প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এবং শান্তিনিকেতনে তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হয়।

চীন ও ভারতবর্ষের এই বাহ্য মৈত্রী প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার। যে বৈদেশিক অধিকার দুইটি দেশে রহিয়াছে, সেগুলির অপসারণের জন্য এই দুই রাষ্ট্রই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল। যেমন গোয়ার পর্তুগীজ অধিকারের লোপ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে গোয়ার অন্তর্ভুক্তির দাবীকে চীনের জনগণ ও সরকার সমর্থন করিল। অনুরূপ বলা যায় যে, চীনের নিকটস্থ মাকাও দ্বীপের উপর পর্তুগীজ অধিকার এবং ফরমোজা দ্বীপের উপর মার্কিনী অভিভাবকত্ব বিলোপে ও ফরমোজাকে মূল চীন-ভূখণ্ডের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে তখনকার ভারতীয় জনমত চীনকে সমর্থন করিয়াছিল। এইভাবে এশিয়া মহাদেশ হইতে শেষ-ঔপনিবেশিক চিহ্ন দূর করা সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও নয়াচীন একত্রে চলিতে লাগিল।

এই উপনিবেশ-বিরোধী নীতি নূতন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে বান্দুং কনফারেন্সে।* এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ২৯টি স্বাধীন জাতির সরকারী মুখপাত্র ও প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন চীন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবং ইন্দো-নেশিয়া, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রীগণ। ২৯টি জাতির এই 'সরকারী

* বান্দুং সম্মেলন সম্পর্কে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

সম্মেলন' হইতে যে সমস্ত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল, তার মূল কথা এই ছিল যে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কোথাও ঔপনিবেশিক বা বৈদেশিক শাসন ও অধিকার রাখা চলিবে না, এই সমস্ত জাতির মৌলিক স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। এক কথায় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটাইতে হইবে। বান্দুং সম্মেলন হইতে এই ঘোষণা পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যের উদ্রেক করিয়াছিল এবং সোভিয়েট-রাশিয়াসহ সোসিয়ালিস্ট দেশগুলি এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইয়াছিল। নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এই সময়ে বান্দুং সম্মেলনে যে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন এবং যে ঐক্যের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পশ্চিম-এশিয়ার আরব জনমতের উপর পর্যন্ত যথেষ্ট রেখাপাত করিয়াছিল। বান্দুংয়ে চৌ-নেহরু সহযোগিতা এশিয়ার রাজনীতিতে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। কারণ, চীন ও ভারতবর্ষ তখন একত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছিল, এবং শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন করিতেছিল। ভারতবর্ষ ভাবিত যে, নয়াচীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ না করিলে দূর-প্রাচ্যের বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে না। অথচ মহাচীনের বদলে ফরমোজা দ্বীপকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসন দেওয়া হইয়াছে—ইহা যেন ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া আন্দামান দ্বীপকে ভারতীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দানের মত হাস্যকর। ভারতবর্ষের মনোভাব তখন এই প্রকার ছিল।

ভারত-চীন মৈত্রীর সর্বাপেক্ষা সুফল মনে করা গিয়াছিল এশিয়া মহাদেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার গ্যারেন্টি। কারণ এশিয়া মহাদেশের ভূখণ্ডে ভারতবর্ষ ও নয়াচীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। অবশ্য আধুনিক শ্রমশিল্প ও কল-কারখানার দিক হইতে জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। কিন্তু জাপান মহাসমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টিত বলিয়া তার সঙ্গে এশিয়ার ভূমিপথের সীমানার কোন যোগ নাই। ফলে এশিয়ায় জাপানের প্রভাব ও যোগাযোগ তেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইতেছে না। অধিকন্তু বর্তমান জাপান দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পর শান্তি-সন্ধি অনুসারে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদার অধিকারী হইলেও সে প্রত্যক্ষরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। যদি এই মার্কিন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ জাপানের উপর না থাকিত, তবে চীন ও জাপানের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইত। (অবশ্য ইদানীং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।) কিন্তু চীনের সঙ্গে এই কূটনৈতিক সদ্ভাব ও স্বীকৃতির অভাবে

এশিয়া মহাদেশের রাজনীতি হইতে জাপান যেন সরকারীভাবে কতকটা দূরে সরিয়া আছে। ফলে ভারতবর্ষ ও চীন এই সময়ে এশিয়ার রাজনীতিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু চীন ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ও মতবাদের মধ্যে আদৌ মিল নাই। দুইয়ের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। নয়াচীন কমিউনিস্ট আর ভারতবর্ষ অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। কিন্তু চীন ও ভারতের মধ্যে এই সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও দুইয়ের মধ্যে মিত্রতার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ নয়—উহার পিছনে রহিয়াছে দুই হাজার বছরের পুরাতন ঐতিহ্য। বর্তমান দুনিয়ার কাছে ইহা ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। জনসংখ্যার দিক দিয়া ভারতবর্ষ ও চীন একত্রে প্রায় ১০০ কোটির মত। অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং এশিয়ার বুকের উপর কোন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটিলে এই অভূতপূর্ব জনশক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক হইতে পারিত। কেবল তাহাই নহে, ভারত ও চীনের মৈত্রী পূর্ব-গোলার্ধে সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারাকে শক্তিশালী করিতে পারিত। আজিকার এশিয়াতে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইত যে, কোন দেশের শাসকবর্গই আর আগের মত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সহিত চক্রান্ত করিয়া পিছনের দিকে হটিতে কিম্বা পুরাপুরি ধনতান্ত্রিক শোষণের দিকে ঝুঁকিতে পারিত না। পিকিং ও দিল্লীর মধ্যে যথার্থ মৈত্রী হইলে, মানব-সমাজের বহু কল্যাণ হইতে পারিত।

বান্দুং সম্মেলন:

১৯৫৪-১৯৫৫ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র ও রণনীতি যখন এশিয়াতে এবং বিশেষভাবে পূর্ব-এশিয়ায় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিতেছিল, তখন এশিয়ার কয়েকজন নেতা আফ্রিশীয় দেশগুলির শান্তি ও স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। এজন্য ১৯৫৪ সালে ২৮-২৯শে ডিসেম্বর 'কলম্বো পরিকল্পনার শক্তিবর্গ' নামে পরিচিত পাঁচটি দেশের প্রধানমন্ত্রী, যথা—ভারতবর্ষের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ব্রহ্মদেশের ইউ নু, ইন্দোনেশিয়ার আলি শাস্ত্রমিদ জোজো, পাকিস্তানের মহম্মদ আলী এবং সিংহলের স্যার জন কোটলেওয়ালা জাকার্তার নিকটবর্তী বোগোরে একত্র হইয়াছিলেন এবং উহার পূর্ববতী এপ্রিল মাসের আলোচনা-বৈঠক অনুসারে এবার তাঁরা হাতে-কলমে কিছু করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এজন্য তাঁরা স্থির করিলেন যে, তাঁরা আরও ২৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদিগকে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষে ইন্দোনেশিয়ায় মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইবেন। এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল—'এশিয়া ও আফ্রিকার

বিভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগীতার বৃদ্ধি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা, এশীয় ও আফ্রিকান জনগণের নিকট বিশেষভাবে বিবেচ্য সমস্যাসমূহ, যেমন—জাতীয় সার্বভৌম স্বাধীনতা, বর্ণ-বৈষম্য ও উপনিবেশবাদ এবং বর্তমান পৃথিবীতে এশীয় ও আফ্রিকান জনগণের মর্যাদা। এবং পৃথিবীতে শান্তি ও সহযোগীতা প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া-আফ্রিকার জাতিসমূহ কি ভাবে সহায়তা করিতে পারে, সেই সম্পর্কে বিবেচনা।'

এই উদ্দেশ্য লইয়া এশিয়া, আফ্রিকা ও আরব দেশের ৩০টি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইল বান্দুং সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্য। একমাত্র সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন (বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত উত্তর রোডেসিয়া, দক্ষিণ রোডেসিয়া ও নায়েসাল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্র) ছাড়া আর বাকী ২৯টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। এই ২৯টি দেশ হইতেছে: আফগানিস্থান, কাম্বোডিয়া, কমিউনিষ্ট চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, গোল্ড কোষ্ট, ইরাণ, ইরাক, জাপান, জর্ডান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, সিরিয়া, নেপাল, ফিলিপাইনস্, সৌদী আরব, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ইয়েমেন এবং ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও পাকিস্তান। (শেষের পাঁচটি দেশ হইতেছে আমন্ত্রক।)

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে অশ্বেতকায় জাতিসমূহের এতবড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে এবং সেই দিক হইতে সারা পৃথিবীর পক্ষেও এই সম্মেলন ছিল ঐতিহাসিক এবং এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল আরও তিনটি কারণে। প্রথমতঃ এই সম্মেলন ছিল সরকারী স্তরে। অর্থাৎ ২৯টি গবর্ণমেণ্ট এখানে প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন, যাঁদের প্রায় সকলেই সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আরব, আফ্রিকান ও এশীয়—প্রধানতঃ এই তিন জাতিগোষ্ঠি এখানে মিলিত হইয়াছিলেন, যাহা সম্পূর্ণ নতুন এবং তৃতীয়তঃ কমিউনিষ্ট, অ-কমিউনিষ্ট ও কমনিষ্ট বিরোধী, এই তিন প্রকারের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিগণ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, মতবাদের বৈষম্যের দিক হইতে যাহা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও এশিয়া ও আফ্রিকার দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা এবং সাম্রাজ্যবাদের লাঞ্ছনার দিক হইতে ইহাদের সকলের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও নৈকট্যবোধ ছিল। তথাপি এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ কমিউনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণের প্রস্তাব করায় পাকিস্তান ও সিংহল আপত্তি জানাইয়াছিল।

ফলে, জাপানকে আমন্ত্রণ করিতে হইল। পাছে আরব রাষ্ট্রগুলি সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃত হয়—এই আশঙ্কায় ইস্রায়েলকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। ফরমোজা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকেও বাদ দেওয়া হইল।

কিন্তু বান্দুং সম্মেলনের পূর্বাহ্নে এমন একটি ঘটনার বা দুর্ঘটনার সমাবেশ হইল, যার রাজনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল না। ১১ই এপ্রিল তারিখে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যালের "কাশ্মীর প্রিন্সেস্" নামে একটি কনষ্টেলেশন বিমান হংকং হইতে জাকার্তা অভিমুখে যাইবার কালে ৮ জন লস্কর, ২ জন ইউরোপীয় সাংবাদিক, একজন ভিয়েৎনামী এবং কমিউনিষ্ট চীনের ৮ জন প্রতিনিধিসহ হঠাৎ বিস্ফোরণে ভাঙ্গিয়া টুকরা হইয়া বোর্ণিওর অদূরবর্তী সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া গেল। (৩ জন ভারতীয় লস্কর বা বৈমানিক অপূর্ব্ব সাহসিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিলেন, যাঁদের কাহিনী আবার নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছিল।) বিখ্যাত ভারতীয় বিমান 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'এর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় চীনে, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র প্রবল সন্দেহ উদ্রেক হইল যে, হংকংস্থিত চিয়াং কাইসেক-চক্রের গুপ্তচরেরাই এই ধ্বংসকাণ্ডের জন্য দায়ী। কারণ, পূর্বাহ্নে এমন অনুমান করা হইয়াছিল যে, নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই হংকং হইতে এই বিমানযোগেই জাকার্তা সম্মেলনে যাইবেন। কিন্তু প্রকাশ যে, শেষ মুহূর্তে (চীনের নিজস্ব গোয়েন্দাসূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী) এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং কয়েকজন সাধারণ চৈনিক প্রতিনিধি এই প্লেনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্টের তদন্তের ফলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' এর অভ্যন্তর একটি টাইম্ বোমা লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং উহাই বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ছিল। এই দুর্ঘটনার পর হংকং বিমানঘাঁটির একজন চীনা কর্ম্মী ফরমোজায় পালাইয়া গিয়াছিল। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাইলে ফরমোজার চিয়াং গভর্ণমেণ্ট উহাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রান্তটা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।...

প্রকৃতপক্ষে ২৯টি আফ্রিশীয় জাতির এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের কথা প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই পশ্চিমী মহলে নানা আশঙ্কা ও ভীতি এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা যাইতে থাকে। সুতরাং এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানে বিঘ্নসৃষ্টির জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা হইয়াছিল, এমন সন্দেহ নিতান্তই অমূলক নহে। 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'এর ধ্বংস সাধন সেই সন্দেহকে আরও গভীরতর

করিয়াছিল। তথাপি বান্দুং সম্মেলন স্বাধীন এশিয়ার ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বান্দুং যাত্রার পথে রেঙ্গুনে চার প্রধানমন্ত্রী (সেদিন এই চার প্রধানের মধ্যে যথেষ্ট মিত্রতা ছিল) যথা—চীনের চৌ এন-লাই, ভারতের নেহরু, ব্রহ্মের উ নু এবং মিশরের নাসের একত্র হইলেন এবং সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখ সুরম্য বান্দুং শহরের পূর্ব্বতন ডাচ্ ক্লাবে ২৯টি আফ্রিশীয় জাতির যে সম্মেলন সুরু হইল, প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয়। সুতরাং জন-প্রতিনিধিত্বের দিক হইতেও এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া ঘোষণা করিলেন, "আমি আশা করি এই সম্মেলন পৃথিবীর মনুষ্যজাতির পথ নির্দ্দেশ করিবে। আমি আরও আশা করি যে, এই সম্মেলন প্রমাণ দিবে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার পুনর্জন্ম হইয়াছে। আজিকার দিনে মানুষের জীবন ভয়ের দ্বারা জীর্ণ ও তিক্ত হইয়াছে।" সম্মেলনের সম্মুখে সাত দফা কর্ম্মতালিকা উপস্থিত করা হইল, যথা—(১) অর্থনৈতিক সহযোগীতা (২) সাংস্কৃতিক সহযোগীতা (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক অধিকার (৪) পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার (৫) পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ব্যবহার (৬) বিশ্বশান্তি এবং (৭) পরাধীন জাতিসমূহের সমস্যা।

পঞ্চশীলের স্বাক্ষরকারী হিসাবে নেহরু এবং চৌ এন-লাই কেবল পারস্পরিক মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না, বান্দুং সম্মেলন যা'তে কমিউনিজমের প্রশ্নে তিক্ত হইয়া না উঠে সেদিকেও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। যদিও সম্মেলনের মূল সুর ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং বিভিন্ন বক্তা পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন, তথাপি পশ্চিমী ঘেঁষা কয়েকটি দেশের (ইরাক, ইরান, সিংহল প্রভৃতি) পক্ষ হইতে "কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধেও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে এই দলের মুরুব্বী ছিলেন সিংহলের স্যার জন কোটলেওয়ালা। তিনি বলেন যে, পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার মত কমিউনিষ্ট ঔপনিবেশিকতাও কম নিন্দনীয় নহে। কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য হইতেছে ইউরোপ ও এশিয়ার স্বাধীন জাতি-গুলিকে ('ফ্রী নেশন্স') সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিষ্ট চীনের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে যদি কমিউনিষ্টদের আন্তরিকতা থাকিয়া থাকে, তবে, তাদের উচিত হইবে সেই সমস্ত পার্টিকে

বিলোপ করিয়া দেওয়া যায়া অন্যান্য দেশে 'গুপ্ত ধ্বংসাত্মক' কার্য্য চালাইতেছে এবং এক মাত্র মস্কো ও পিকিংয়ের হুকুমে চলিতেছে। অবশ্য কোটলেওয়ালা সেই সঙ্গে দশ বছরের মধ্যে সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা দাবী করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, ৫ বছরের জন্য ফরমোজাকে 'ট্রাষ্টিশিপ' বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছিগিরির অধীনে রাখা হউক এবং তারপর তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইলেন প্রধান-মন্ত্রী নেহরু এবং ঘোষণা করিলেন যে, ঔপনিবেশিকতাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে ন্যাটো বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সামরিক শক্তিবর্গ। "কিন্তু দুই শক্তি জোটের যে কোন একটির তল্পীবাহক হওয়ার অবস্থায় নামিয়া আসা এশিয়ার বা আফ্রিকার যে কোন জাতির পক্ষে অসহ্য অসম্মানের মত। এই সমস্ত শক্তিজোট ভুলপথে চলিতেছে এবং তাদের অনুসৃত নীতি যুদ্ধের কিনারায় গিয়া পৌছিতেছে।"

কিন্তু নেহরুর এই সমালোচনার জবাবে তুরস্ক, পাকিস্থান ও ইরান ন্যাটোকে এই বলিয়া সমর্থন করেন যে, দেশের নিরাপত্তার জন্য এই চুক্তি-সংস্থার প্রয়োজন।

সম্মেলনে 'কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের' প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় স্বভাবতঃই ওয়াশিংটনে খুসীর হাওয়া দেখা দিল। কিন্তু সম্মেলনে আগত ইউরোপ ও আমেরিকার তীক্ষ্ণদর্শী পর্য্যবেক্ষকগণ (ভার্ণন বার্টলেট, সি পি ফিটজেরাল্ড, এডাম ক্লেটন পোয়েল প্রভৃতি) এই খুসীর মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কমিউনিজম লইয়া সম্মেলনে কোন বড় বিভেদ হইবে না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ ঘটিবে সাম্রাজ্যবাদ, পরাধীনতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে। সুতরাং পশ্চিমীদের উল্লসিত হওয়ার কিছু নাই।

কার্য্যতঃ সম্মেলনে 'কমিউনিষ্ট আক্রমণ' লইয়া কোন মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইল না। বরং ঘটিল প্রায় বিপরীত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্ব এবং চৌ এন-লাইয়ের 'মিষ্ট হাসির ব্যক্তিত্ব'—বান্দুং সম্মেলনে এই দুইয়েরই জয় ঘোষিত হইল। ২০শে এপ্রিল তারিখ চৌ এন-লাই কেবল ঐক্য, শান্তি এবং অপরের রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করার উপরেই জোর দিলেন না, শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত বিভেদ মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইলেন। "কমিউনিষ্ট চীন প্রতি-বেশীদের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখী"—এই তত্ত্ব সেদিনের বান্দুং সম্মেলনের আবহাওয়ায় টিকিল না। মিঃ চৌ এন-লাই যেন সর্ব্ব ব্যাপারেই মধুর হইয়া

উঠিলেন। মহাচীনের বাহিরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চৈনিক বংশজাত লোকদের মোট সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষের কম হইবে না। ইহার মধ্যে এক মাত্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতেই প্রবাসী চীনাদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন বা এক কোটির মত হইবে এবং এই বিপুল সংখ্যক চীনাদের নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্রীক আনুগত্য লইয়া যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা দিয়াছিল। বিশেষভাবে এই প্রশ্ন লইয়া চীন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু চৌ এন-লাই বান্দুংয়ে ইহার মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। ইন্দোনেশিয়ার ২০ লক্ষ চীনাদের দ্বিত্ব নাগরিকত্ব সম্পর্কে তিনি এই মর্ম্মে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার চীনারা চীনের কিম্বা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাদের গণভোট গ্রহণ করা হইবে। চৌ এন-লাই আরও প্রস্তাব করিলেন যে, ফিলিপাইন এবং থাইল্যাণ্ডও অনুরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারে। তিনি উদারতার ভঙ্গীতে আরও বলিলেন যে, এই সন্ধিপত্রের জন্য থাইল্যাণ্ড বা ফিলিপাইনকে পূর্ব্বাহ্নে পিকিং সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নাই। যাঁরা চীনের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দে চীনে আসিয়া নিজেরা সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইতে পারেন।

লাওস ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও চৌয়ের দীর্ঘ আলোচনা হইল এবং তাঁরা স্বীকার করিলেন যে, তাঁরা আলোচনায় খুসী হইয়াছেন।

বান্দুং সম্মেলনে চৌ এন-লাই আরও বলিলেন যে, চীন একটি বৃহৎ শক্তি এবং বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে তাচ্ছিল্য করা সহজ। সেজন্য তাঁরা সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র শক্তিগুলির প্রতি তাঁদের নিজেদের আচরণ সতর্কতা-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করেন। যদি সম্মেলনে উপস্থিত কোন প্রতিনিধি মনে করেন যে, চীন তাঁর দেশের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা দেখান না, তবে, "তিনি দয়া করিয়া আমাদের বলুন এবং আমরা সানন্দে সেই সমালোচনা গ্রহণ এবং আমাদের ভ্রম সংশোধন করিব।"

ইহার পর ২৩শে এপ্রিল তারিখ চৌ এন-লাই দস্তুরমত এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড বাধাইলেন। প্রতিদিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুণ্ডুপাত না করিয়া যে চীন জল গ্রহণ করে না, সেই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই অন্যান্য ৮ জন নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ঘোষণা করিলেন:

"The Chinese people are friendly to the American people. The Chinese people do not want to have a war with

the United States of America. The Chinese Government is willing to sit down and enter into negotiations with the United States Government to discuss the question of relaxing tension in the Taiwan (Formosa) area. —"

অর্থাৎ চীনের জনগণ মার্কিন জনগণের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের জনগণ কোন যুদ্ধ করিতে চাহে না। তাইওয়ান বা ফরমোজা এলাকায় কিভাবে উত্তেজনা হ্রাস করা যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে চীন সরকার মার্কিন সরকারের সঙ্গে এক বৈঠকে বসিয়া আলাপ করিতে ইচ্ছুক।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে চীনের এই আকস্মিক বন্ধুতা প্রদর্শনের জন্য বান্দুং হইতে সর্ব্বত্র একটা আশা ও চাঞ্চল্যের স্রোত বহিয়া গেল। সম্মেলনের বহু নেতা চৌ'-এর প্রতি সমর্থন জানাইলেন এবং ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় বলিলেন যে, আমেরিকার উচিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করা। এমন কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী পর্যন্ত মনের আবেগে চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এক তারবার্তা পাঠাইলেন ওয়াশিংটনে এবং জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর বিবেচনায় চৌ এন-লাই আন্তরিকভাবেই ফরমোজা সঙ্কটের অবসান চাহেন। সিরিয়ার এক প্রতিনিধি উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করিলেন, 'চৌ এন-লাই একজন সৎ প্রকৃতির মানুষ।'

এই সমস্ত ঘটনার পর ইঙ্গ-মার্কিন পর্যবেক্ষকেরা পর্যন্ত বলিলেন যে, বান্দুং ছিল চৌ এন-লাইয়ের কনফারেন্স। বলা বাহুল্য যে, মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফষ্টার ডালেসের হৃদয় ইহা দ্বারা বিচলিত হইল না, কিম্বা ফরমোজার চিয়াং সরকারও নরম হইলেন না। তাঁরা নানা যুক্তি দেখাইয়া চৌ এন-লাইয়ের প্রস্তাব কার্যতঃ অগ্রাহ্য করিলেন।

তথাপি বান্দুং সম্মেলন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে সেদিনের চৌ এন-লাইয়ের শান্তিদ্যোতক আপোষ মনোভাবের জন্য, আর নেহরুর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের বিরোধীতা ও সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা দাবীর জন্য।

সম্মেলনের শেষে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইল, তা'তে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির আর্থিক উন্নয়ন ব্যবস্থা, পারস্পরিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃদ্ধি, বর্ণ-বৈষম্য ও উপনিবেশবাদের অবসান—বিশেষভাবে উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকায় —প্যালেষ্টাইনে আরবদের অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে প্যালেষ্টাইন সমস্যার মীমাংসা, পশ্চিম ইরিয়ানের উপর ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে আফ্রিকীয় দেশগুলির অধিকতর প্রতিনিধিত্ব, নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্র

নিষিদ্ধকরণ, একটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক এজেন্সি প্রতিষ্ঠা এবং তাতে উপযুক্ত পরিমাণে আফ্রিশীয়ার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ, সমস্ত রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা, মানবিক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা, সমস্ত জাতির সমান অধিকার, অপরের রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন, ক্ষমতালিপ্সা, চাপসৃষ্টি ও পররাজ্য আক্রমণ হইতে বিরত থাকা, সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা—এই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হইল।

আগের বছর তিব্বত উপলক্ষে চৌ-নেহরু স্বাক্ষরিত পঞ্চশীলের চুক্তি বান্দুং সম্মেলনে বিশেষ মর্যাদা পাইল এবং বান্দুংয়ের এই আবহাওয়া অনেক দিন পর্যন্ত এশিয়া-আফ্রিকায় নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইল। এমন কি, বান্দুংয়ের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের জন্য হাতে হাতে কিছু সুফলও পাওয়া গেল। যেমন—থাইল্যাণ্ড হইতে কমিউনিষ্ট পক্ষপাতী ৪০ হাজার ভিয়েৎনামী শরণার্থী অপসারিত হইল, জেনেভায় নয়াচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা সুরু হইল। বাইরের জগতে নয়াচীন সরকারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রচার-অভিযান তীব্রতর হইয়া উঠিল, শক্তিশালী আফ্রিশীয় ব্লকের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ বান্দুং ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সংখ্যক অশ্বেতকায় মনুষ্যজাতির মানসিক দর্পণের মত, যেখানে শ্বেতকায়দের সঙ্গে তাঁদের আশাকাঙ্ক্ষা ও অধিকারবোধের সমান দাবী প্রতিফলিত হইল।

এই বান্দুং সম্মেলনেরই জের স্বরূপ পরবর্ত্তী কয়েক বছর ধরিয়া আফ্রিকা-এশীয় সংহতি সম্মেলন, (ডিসেম্বর, ১৯৫৭, কাইরোতে প্রথম অধিবেশন) আফ্রিশীয় লেখক সম্মেলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইল এবং আফ্রিশীয় জাতিসমূহ পরাধীনতার শেষ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাওয়ার প্রেরণা বোধ করিল।

তিব্বতের বিদ্রোহ

১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন এশিয়ার নতুন স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও ঐক্য রচনার যে ভাবগত সেতু ছিল, তার উপর প্রথম প্রচণ্ড আঘাত আসিল ১৯৫৯ সালে তিব্বতের বিদ্রোহ এবং চীন-ভারত সম্পর্কের নিদারুণ অবনতি হইতে।

চীনের মত তিব্বতের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ বহু প্রাচীন কালের। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে। বাণিজ্যিক সম্পর্কও অতি দীর্ঘকালের। তা' ছাড়া নেপাল, তিব্বত ও ভূটান—হিমালয়ের এই তিনটি রাজ্য উত্তর দিকে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে দেওয়ালের মত ছিল। স্থতরাং এই সমস্ত রাজ্যের উঠানামার প্রশ্নকে ভারতবর্ষ গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও গ্রহণ না করিয়া পারে না। বহু প্রাচীনকাল হইতে সম্পর্কের বিবেচনায় তিব্বত আমাদের নিকট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি 'চৈনিক এলাকা' মাত্র নহে। স্থতরাং ১৯৫৯ সালের তিব্বতের ঘটনাবলী ভারতবর্ষকে গভীরভাবে আলোড়িত করিল।

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুরানো হইলেও সেই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল পণ্ডিত, ধর্ম্মনেতা এবং 'রহস্য সন্ধানী' কিছু কিছু পরিব্রাজকের কিম্বা তীর্থযাত্রীব মধ্যে। অর্থাৎ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তিব্বতের কোন স্পষ্ট পরিচিতি ছিল না একমাত্র 'তিব্বতী বাবা'র অনুরূপ কিছু কিছু লামা সন্ন্যাসীর মারফৎ ছাড়া।

বলা বাহুল্য যে, তিব্বত ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। কিন্তু এই উত্তর দিকে ভারত ও তিব্বতের মাঝখানে রহিয়াছে নেপাল, সিকিম ও ভূটান। এখানে নেফার (নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি—NEFA কিম্বা উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সি) সীমানাও তিব্বতের সঙ্গে মিশিয়াছে। ইহার পশ্চিম সীমানায় কাশ্মীর এবং উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে চীনের বিভিন্ন প্রদেশ। কিন্তু ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের সঙ্গে যুক্ত। ইহার আয়তন ৪ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল এবং তিব্বতীয় জনসংখ্যা মোট ৬০ লক্ষ। কিন্তু ১৯৫৩ সালের জুন মাসে চৈনিক সেন্সাস্ অনুসারে 'খাস তিব্বত ও চামডো' এলাকায় ১২ লক্ষ ৭০ হাজার এবং বাকী সমস্ত চীনে ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার, ইহা ছাড়া আরও ১৪ লক্ষ তিব্বতী নর-নারীর বাস নাকি খাম, গোলোক, আমডো, সেরথা ও মিনায়ক অঞ্চলে। রাজধানী লাসায় ৩০ হাজার হইতে ৫০ হাজার নর-নারীর বাস। ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের যাতায়াত ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত দুরূহ ও দুর্গম অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া। সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘ গিরিসঙ্কট, যার উচ্চতা ১৪ হাজার হইতে ১৮ হাজার ফুট, সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া লাসায় পৌছিতে হইত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তিব্বতের উচ্চতা গড়ে ১৫ হাজার ফুট। ইহার ছোট্ট সহর গারটক ১৫ হাজার ১ শত ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই জনবসতির

সর্ব্বোচ্চ সহর। তিব্বতীরা যদিও মোঙ্গল জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত, তথাপি তারা একটি পৃথক জাতি এবং তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃত রহিয়াছে।

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে দেখা দেয় এবং অষ্টম শতাব্দীতে সে এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, সে চীনের নিকট হইতেও কর আদায় করিত। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃতের উপর ভিত্তি করিয়া এক ধরণের তিব্বতীয় বর্ণমালা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যার ফলে ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার প্রায় হাজার বছর পর ষষ্ঠ দলাই লামার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকার লইয়া মোঙ্গল ও তিব্বতীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধের সুযোগ লইয়া মাঞ্চু সাম্রাজ্য লাসায় সশস্ত্র অভিযান চালায় এবং সপ্তম দলাই লামাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পর লাসাতে কার্য্যতঃ চৈনিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন হইতে প্রায় ১৯১২ সাল পর্যন্ত মাঞ্চু রাজবংশ তিব্বতে বাহ্যতঃ তাদের আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা নাম মাত্র 'অভিভাবকত্বে' পরিণত হইয়াছিল। ১৯১২ সালে চৈনিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইলে তিব্বতীরা সমস্ত চীনা সৈন্য ও অফিসারদের তাড়াইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ বৃটেন ও বৃটিশ ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। চীন রিপাব্লিকের পক্ষ হইতে তিব্বতকে চীনের একটি প্রদেশে পরিণত করার দাবী জানানো হইলে বৃটেন উহাতে অস্বীকৃত হয়। ১৯১৪ সালে সিমলা কনফারেন্সে বৃটেন, তিব্বত ও চীনের সরকারী প্রতিনিধিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং এই সিমলা বৈঠকে তঁ রা এই মর্মে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, যার দ্বারা খাস তিব্বতের (Outer Tibet) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং আন্তঃ তিব্বত (Inner Tibet) নামে একটি এলাকার সৃষ্টি হয়, যার উপর তিব্বতীদের কতকগুলি অধিকারের সঙ্গে চীনের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু চীন বহিঃ তিব্বত ও আন্তঃ তিব্বতের সীমানা মানিয়া লইতে অসমর্থ হয় এবং চীন সরকার ইহা অনুমোদন (ratify) করিতেও অস্বীকৃত হন। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চীন সরকার চুক্তির অন্যান্য সমস্ত সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছিলেন—চুক্তির সঙ্গে স্বাক্ষরিত মানচিত্র হইতেই অধুনা বিখ্যাত ম্যাকমেহন লাইনের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা বর্তমান চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইনতঃ সিদ্ধ। বৃটেন ও তিব্বত এই চুক্তিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং বৃটেন বা বৃটিশ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে পরবর্ত্তীকালের সমস্ত সম্পর্ক এই চুক্তিপত্র অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

১৯১৮ সালে তিব্বতের উপর চীনের আক্রমণ ঘটিলে তিব্বতীরা কেবল সাফল্যের সঙ্গে উহা প্রতিরোধই করে নাই, প্রতিশোধও নিয়াছে যথেষ্ট। বৃটেনের মধ্যস্থতায় ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে চীন ও তিব্বতের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটে, কিন্তু আপোষ-মীমাংসা কিম্বা মনের মিলন ঘটে নাই। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যু ঘটিলে একজন 'রিজেন্ট' বা রাজ-প্রতিনিধি (দলাই লামাই তিব্বতের ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু) নিযুক্ত হন। চিংহাইতে একটি পাঁচ বছরের শিশুকে নতুন দলাই লামারূপে আবিষ্কার করা হয় এবং ১৯৩৯ সালে তাকে লাসাতে আনা হয়। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার অভিষেক হয় এবং ১৯৫০ সালের ১৭ই নভেম্বর চতুর্দ্দশ দলাই লামা তিব্বতের ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু-রূপে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য একটি চীনা মিশনকে লাসায় আগমনের জন্য তিব্বতের গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন এবং অনুরূপভাবে চতুর্দ্দশ দলাই লামার অভিষেকের সময়ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি চীনা মিশনকে আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত লাসাতে চীনের কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে তিব্বতীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে সেই প্রতিনিধিমণ্ডলী লাসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।*

এই সমস্ত ঘটনা হইতে এক দল আইন-বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ১৯১২ সালের পর হইতে তিব্বত কার্য্যতঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপেই তার আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে এবং ১৯১৩ ও ১৯১৭-১৮ সালে তিব্বতীরা চীনাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজেদের স্বাধীন সত্বা রক্ষা করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও তিব্বতের এই স্বাধীন সত্বা বজায় ছিল। এই সমস্ত বিস্তৃত অনুসন্ধান ও তদন্তের পর জেনেভার আন্তর্জাতিক আইন কমিশন (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্কিত) তাঁদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"Tibet's position on the expulsion of the Chinese in 1912 can fairly be described as one of de facto independance and there are, as explained, strong legal grounds for thinking that any form of legal subservience to China had vanished. It is therefore submitted that the events of 1911-12 mark the

* তিব্বত সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রধানতঃ ১৯৬১ সালের 'ষ্টেটসম্যান ইয়ার বুক' হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

re-emergence of Tibet as a fully Soveregn State. independent in fact and in law of Chinese control."*

এই আন্তর্জাতিক কমিশন ২৩টি দেশের আইন-বিশারদদের লইয়া গঠিত। সুতরাং তাঁদের মতামত একবাক্যে উড়াইয়া দেওয়ার মত নহে।

কিন্তু গোল বাধিল এখানেই। অর্থাৎ তিব্বতের স্বাধীন ও পৃথক অস্তিত্ব লইয়া। কারণ, ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যখনই সুবৃহৎ চীন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ব্বল ও ঐক্যহীন ছিল, তখনই তিব্বত তার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী চলিয়াছে এবং চীনের কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত বার বার অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে কমিউনিষ্ট চীন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং দেশের সর্ব্বত্র এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ও সংহত গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। আর চিয়াং কাইসেকের কুওমিণ্টাং সরকার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া মূল ভূখণ্ড হইতে ফরমোজা দ্বীপে পলায়ন করে। সুতরাং এই বিজয়ী ও মদগর্বী গবর্ণমেণ্ট তিব্বতকে রেহাই দিবে কেন? ১৯৫০ সালের গোড়া হইতেই পিকিং সরকার দলাই লামার উপর চাপ দিতে থাকেন তিব্বত সম্পর্কে বুঝাপড়ার জন্য। তখন ফেব্রুয়ারী মাসে লাসা হইতে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরিত হইয়াছিল ভারতস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য। কিন্তু বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া চীনা রাষ্ট্রদূত প্রতিনিধিমণ্ডলীকে জানান যে, এই বিষয়ে সরাসরি পিকিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলাই ভালো। তখন প্রতিনিধিমণ্ডলী পিকিং যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করেন। কিন্তু হংকং কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে ভিসা পাইতে ও অন্যান্য কারণে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। চীনা গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বিলম্বের জন্য অভিযোগ করিয়াছেন যে, আসলে তিব্বতীয় প্রতিনিধিদিগের পিকিং যাওয়ার ও তিব্বত সম্পর্কে মীমাংসা আলোচনার ইচ্ছা ছিল না, তাঁদের গূঢ় মতলব ছিল "সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্রীড়নক" রূপে তিব্বতকে সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করিবার। সুতরাং ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে চীনা 'মুক্তি ফৌজ' তিব্বত আক্রমণ করে এবং তিব্বতীয় গবর্ণমেণ্ট এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট দুইবার আবেদন করেন। কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। ভারত সরকার গোড়ায় চীনের এই তিব্বতীয় অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু চীন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমে দলাই

*'The Question of Tibet and the Rule of Law'—International Commission of Jurists, Geneva, 1959. P. 85

লামা পলাইয়া গিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৫১ সালের ২৩শে মে পিকিংয়ে চীনের কেন্দ্রীয় সরকার ও তিব্বত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ১৭ দফা সর্ত্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিপত্রের প্রথম সর্ত্তই হইল এই যে, তিব্বতীয় জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং তিব্বত হইতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করিবে এবং তিব্বত 'মাতৃ-ভূমির বৃহৎ পরিবারে' অর্থাৎ জনগণতন্ত্রী চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। দ্বিতীয় সর্ত্ত হইল এই যে, চীনা 'মুক্তি ফৌজকে' তিব্বতে প্রবেশ করিতে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাগুলি সংহত ও শক্তিশালী করিতে দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে প্রধান কথা হইল কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিতে ধীরে ধীরে সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে। দলাই লামার ক্ষমতা, মর্য্যাদা ইত্যাদি নষ্ট করা হইবে না, কিম্বা বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক সংগঠনেরও বদল করা হইবে না। ধর্ম্মের স্বাধীনতা রক্ষা করা হইবে এবং ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মীয় আচরণের প্রতি সম্মান দেখানো হইবে এবং লামাদিগকে ও মঠগুলিকে রক্ষা করা হইবে। আভ্যন্তরীণ শাসনে ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যে তিব্বতের নিজস্ব অধিকার থাকিবে বটে, কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এই সমস্ত সন্ধিসর্ত্ত কার্য্যক্ষেত্রে পালনের জন্য ১৯৫২ সালে লাসাতে একটি চীনা সামরিক সদর দপ্তর এবং ১৯৫৩ সালে চীনের অধীনে পররাষ্ট্র বিষয়ক একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইল।

যখন দুইটি পার্টির মধ্যে আইনতঃ ও নিয়মিতভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের অধীন ছিল না। অর্থাৎ যদি তিব্বত সম্পূর্ণরূপে চীনের পরাধীন কিংবা একটা সাধারণ প্রদেশ মাত্র হইত, তা'হলে এমন আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনতঃ পরস্পরের সম্মতিযুক্ত (অবশ্য এই ক্ষেত্রে তিব্বতকে পিকিংয়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হইয়াছিল) চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিব্বতের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ এই ১৭ দফা চুক্তিপত্রকে মানিয়া চলেন নাই। বরং তাঁরা প্রভূত জোর জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে দলাই লামা ও তাঁর মন্ত্রীদিগকে হটাইয়া দিতেছিলেন।

পিকিং ও লাসার মধ্যে এই সমস্ত অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ এবং বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে তিব্বতে

ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং দলাই লামা লাসার পোটালা রাজপ্রাসাদ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া ৮০ জন পার্শ্বচর ও প্রভূত সম্পদসহ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব্বদিকে যেখানে নেফা, ভূটান ও তিব্বত একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই তিন সীমানার সঙ্গমস্থল দিয়াই দলাই লামা ভারতে প্রবেশ (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতে এই সীমানা দিয়াই ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে) করেন এবং মুসৌরীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনী বিড়লাদের প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করেন।

১৯৫০ সালের পর হইতে কমিউনিষ্ট চীন তিব্বতকে জবরদস্তিপূর্ব্বক গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে থাকে এবং তিব্বতের দারিদ্র্য, পশ্চাৎবর্তিতা ও অসহায় অবস্থার সুযোগ লইতে থাকে। একথাও সত্য যে, তিব্বত প্রায় অন্ধকার যুগে বাস করিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি ও ব্যভিচার এবং তন্ত্রমন্ত্র, ঝারফুক, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ ও নানাবিধ কদর্য্য আচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। বিবাহিতা মেয়েদের একাধিক স্বামী থাকিত এবং ইহাতে কোন সামাজিক নিন্দা বা চরিত্রভ্রষ্টতার গ্লানি বহন করিতে হইত না। (সম্ভবত এই সমস্ত প্রাচীন কুপ্রথার অধিকাংশই এখন উঠিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার জন্যই বোধ হয় এই সমস্ত অন্যায় প্রথা প্রচলিত ছিল।) অথচ দেশটা ছিল 'জীবন্ত বুদ্ধের' এবং স্বয়ং দলাই লামা ছিলেন মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধের অবতার স্বরূপ। তিনি স্বয়ং দেবতার তুল্য এবং তাঁর মলমূত্র পর্য্যন্ত পবিত্র বিবেচিত হইত। তিব্বতে আধুনিক হাসপাতাল ও চিকিৎসাপদ্ধতি কিছুই ছিল না এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, রাজধানী লাসাতে পর্য্যন্ত যৌনব্যাধির অভাব ছিল না!—স্বয়ং ইউরোপীয় পর্য্যবেক্ষকগণ, যাঁরা তিব্বতে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

তিব্বতের সাধারণ মানুষ একেবারে রিক্ত। শতকরা ৮০ জন ভয়াবহ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নোংরামিপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য ছিল। কৃষিপ্রধান ও পশুপালন-প্রধান এই দেশে মুষ্টিমেয় অভিজাত ও মুষ্টিমেয় ধনী লামা সমাজের বাকী লোকগুলিকে শাসন ও শোষণ করিত।

কমিউনিষ্ট চীন এই অবস্থার সুযোগ লইয়া এবং চাতুর্য্য, বলপ্রয়োগ ও প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা নিজেদের মুঠিতে আনিতে চাহিল। ফলে, ১৯৫১ সালের পর হইতেই চীনের সঙ্গে তিব্বতীদের বিরোধ চলিতে থাকে এবং ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালেই

ছোটখাটো সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১০ই মার্চ্চ রাজধানী লাসাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহে মুখ্য অংশ গ্রহণ করে খাম্পা উপজাতীয়গণ। অনুমান তিব্বতে যারা বিদ্রোহ বাধাইয়াছিল এবং পাহাড়ে জঙ্গলে দীর্ঘকাল চীনাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়াছিল তাদের সংখ্যা অন্ততঃ ২০ হাজারের কম নয়। বলা বাহুল্য যে, কমিউনিষ্ট চীন অত্যন্ত কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছে এবং ১৯৫৯ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ১৫ হাজার তিব্বতী ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছে আশ্রয়প্রার্থী রূপে। ১৯৫৯ সালের এই বিদ্রোহের পর হইতে পাঞ্চেন লামাকে (অল্পবয়সী এই তরুণ একজন 'জীবন্ত বুদ্ধ' এবং কমিউনিষ্টদের ইনি করধৃত পুত্তলিকা) খাড়া করিয়া তিব্বতের 'আধুনিকীকরণ' সুরু হইয়াছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হইয়াছে এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস যে আফিংয়ের নেশার মত মোহ ও বুদ্ধিভ্রংশতা সৃষ্টি করে, এই প্রচারকার্য তিব্বতে নিয়মিত ভাবে করা হইয়াছে। অর্থাৎ চৈনিক কমিউনিজমের ডাণ্ডাবাজীতে তিব্বতের সমগ্র অতীত জীবনধারা নিশ্চিহ্ন ও 'রহস্যাচ্ছন্ন গুহার অন্ধকার' একেবারে 'ফর্সা' হইতে চলিয়াছে!

আশ্চর্য্য এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া যতই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করুন না কেন, ধর্ম্মনেতাদের ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু ইতিহাসে ফলিয়া যাইতে দেখা যায়। এখানে ত্রয়োদশ দলাই লামার একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দলাই লামা বলিয়াছিলেন:

"......It may happen that here in the centre of Tibet the religion and the secular administration will be similarly attacked from without and within, and the holders of the Faith, the glorious Rebirths, will be broken down and left without name. As regards the monasteries and the the priesthood, their lands and properties will be destroyed. The officers of State, ecclesiastical and lay, will find their lands seized and their other property confiscated, and they themselves made to serve their enemies or wander about the country as beggars do. All things wil be sunk in hardship and fear, and the nights will drag on slowly in suffering......"

—From the Political Testament of the thirteenth Dalai Lama (d. 1933). Sir Charles Bill, 'Portrait of the Dalai Lama' (1946), P. 380.*

*১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে জেনেভাব আন্তর্জাতিক আইন কমিশনেব রিপোর্ট সম্বলিত গ্রন্থ 'Tibet and the Chinese People's Republic' হইতে উদ্ধৃত।

১৯৩৩ সালের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৫৯-৬০ সালে কিম্বা ২৬।২৭ বছর পর কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন বর্ত্তমান তিব্বতের ঘটনাবলীর কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী! কারণ, তিব্বতের ধর্ম্মনাশ, সম্পত্তিনাশ হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি সম্পর্কে এমন নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। মনে হয় যেন ত্রয়োদশ দলাই লামা কমিউনিষ্ট চীনের তিব্বত গ্রাসের একজন সহযাত্রী ছিলেন!

চীন-ভারত সীমানা বিরোধ

তিব্বতের বিদ্রোহ এবং সীমান্তের ঘটনাবলী ভারতবর্ষকে নানা কারণে আলোড়িত করিয়া তোলে। নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। সুতরাং এই দুই দেশের রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনের ফলে ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি না হইয়া পারে না। ভারতবর্ষে দলাইলামার আশ্রয় লাভ লইয়া রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। ফলে, পিকিং সরকার ধরিয়া লইলেন যে, নেহরুর গবর্ণমেণ্ট এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা একই পর্য্যায়ভূক্ত। তারা তিব্বতকে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে চায় এবং ভারতবর্ষ রাজ্য-বিস্তারকামী হইয়া পড়িয়াছে! ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই অপব্যাখ্যার সঙ্গে হিমালয় সীমানা লইয়া চীন সরকার নিত্য নূতন দাবী করিতে থাকেন এবং বার বার নিজেদের ইচ্ছামত মানচিত্র বদল করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল ভূমি নিজেদের বলিয়া দাবী করিতে থাকেন। ১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভারত সরকার এই সীমানা বিরোধ শান্তি-পূর্ণ উপায়ে মিটাইবার জন্য বার বার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু চীনের দিক হইতে তেমন কোন আন্তরিক গরজ ছিল না। ফলে, নানাছুতায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব কার্যকরী হইল না এবং ১৯৬২ সালের ২০ শে অক্টোবর হইতে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে "অঘোষিত যুদ্ধ" (undeclared war) সুরু হইল। ঐ দিন চীন পশ্চিম দিকে লাডাক অঞ্চলে এবং পূর্ব্ব দিকে নেফা অঞ্চলে যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে প্রভূত সৈন্য ও সমরোপকরণ সহ প্রবল আক্রমণ চালায়।

চীন-ভারত সংগ্রামের বিষয় পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু তার আগে সীমান্তবিরোধ সম্পর্কে আগেকার অবস্থা তিন বছর ধরিয়া কি প্রকারের ছিল, ইতিহাসের পারম্পর্যের খাতিরে তাহাও উল্লেখ করা দরকার। ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালের লেখা দুইটি প্রবন্ধ এখানে দেওয়া গেল। মনে রাখা দরকার

যে, সেদিনের পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অবস্থার আলোকেই এই প্রবন্ধ দুইটি লিখিত হইয়াছিল এবং সেভাবেই এগুলির বিচার করিতে হইবে। চীন-ভারত যুদ্ধের দিক হইতে প্রবন্ধ দুইটি অনুধাবন করিলে ভুল করা হইবে।……

১৯৫৯ সালের নভেম্বরে লেখা হইয়াছিল :—

হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষের 'চিরন্তন' উত্তর সীমানারূপে পরিচিত। কেবল পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীররূপে স্বাভাবিক সীমানা বলিয়াই নহে, হাজার হাজার বছর ধরিয়া হিমালয় ভারতীয় জনজীবনে পবিত্রতার এবং 'ধ্যানগম্ভীর' ভূধরের প্রতীকরূপে সম্মানিত। অর্থাৎ সাধারণ ভৌগলিক সীমানার স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা একমাত্র আত্মরক্ষার প্রশ্নরূপেই যেমন বিবেচিত, হিমালয়ের স্থান তার চেয়েও অনেক উচ্চে। ভারতীয় দর্শন, কাব্য, পুরাণ, নানা সাহিত্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে হিমালয়ের বন্ধন অচ্ছেদ্য। মুনি-ঋষি এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের গুহা হইতে সুরু করিয়া অজস্র মঠ, মন্দির, আশ্রম, তপোবন ও তীর্থস্থানের মহিমার দ্বারা হিমালয় যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর কাছে বন্দিত। তীর্থযাত্রী, পর্যটক ও অভিযাত্রীদের কাছে হিমালয়ের প্রেরণা অসাধারণ। সুতরাং এমন একটি স্থান লইয়া যখন চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ বাধিয়াছে, তখন সাধারণ মানুষের কাছে উহার 'সেন্টিমেণ্টের' বা ভাবাবেগের মূল্য কম নয় এবং এজন্যই দেখা যাইতেছে যে, সময় সময় এই বিরোধিতা রাজনৈতিক সীমানা ছাড়াইয়া তীর্থস্থানগুলিকে, যেমন মানস সরোবর ও কেদার বদ্রীকে পর্যন্ত সংক্রামিত করিতেছে। ফলে, মাঝে মাঝে প্রভূত উত্তেজনা-বোধের কারণ ঘটে। তথাপি স্থিরচিত্তে কতকগুলি গোড়াকার কথা চিন্তা করা দরকার।

সাধারণত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোন দেশের সীমান্ত অতিক্রান্ত হইলে উহাকে নিশ্চয়ই পুরাপুরি 'আক্রমণ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু চীন-ভারত সীমানা বিরোধ এখনও (১৯৫৯ সালে) সেই আইনগত-'আক্রমণ'সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে কিনা, এ বিষয়ে সংশয় আছে। তবে ইহাকে 'বে-আইনী অনুপ্রবেশ' ও জবর দখল বলিয়া নিশ্চয়ই অভিহিত করা যায়। সমসাময়িক ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কোন দেশ নতুন স্বাধীনতা অর্জন করিলে কিম্বা সম্পূর্ণ কোন নতুন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়া থাকে—যদি না সেই রাজ্যগুলির সঙ্গে আগে হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা সরকারীভাবে স্বীকৃত, জরীপীকৃত ও চিহ্নিত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন সময় রাজনৈতিক বিসম্বাদের জন্যও সীমান্ত সংকট ঘটিয়া থাকে।

গত ত্রিশ দশকে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের পর মাঞ্চুকো সরকারের সৈন্যদের সঙ্গে সাইবেরিয়া-মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ঘটিত। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী এবং রুমানিয়ারও সীমানাঘটিত বিরোধ ও দাবীদাওয়া ছিল, যার অবসান হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়া। আমাদের দেশকে কাটিয়া যে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হইল. তার সঙ্গে পর্য্যন্ত আমাদের সীমানাবিরোধ প্রায় ১২ বছর ধরিয়া অব্যাহত ছিল এবং এখনও পশ্চিম দিকে সেই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই। পূর্বদিকে মাত্র সেই দিন আমরা টুকেরগ্রাম ফেরৎ পাইয়াছি, আবার পাথারিয়া (আসাম-কাছাড় সীমানা) অঞ্চলের যে পাঁচটি গ্রাম ভারতবর্ষ দখল করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলি পাকিস্তানকে ফেরৎ দিতে হইয়াছে। সুতরাং বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসারও একটা দিক আছে।

আর একটি কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সীমানা বিরোধের প্রশ্নটিকে কোন "ইডিওলজি" বা রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়া বিচার করা ঠিক নহে। বিতর্কিত সীমানার কাহার কতটুকু প্রাপ্য তার সঙ্গে ক্যাপিটালিজম্ ও কমিউনিজমের প্রশ্ন জড়িত নহে। ইহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ভূমিগত আইন-সম্মত অধিকারের প্রশ্ন মাত্র—রাজনৈতিক মতবাদের অন্তর্গত প্রশ্ন নয়। এমন কি, এই বিরোধ দুইটি কমিউনিষ্ট রাজ্যের মধ্যেও দেখা দিতে পারে—যদি সীমানা পূর্বেই চিহ্নিত হইয়া না থাকে। আবার সাধারণত এই ধরণের প্রশ্নে জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন গভর্ণমেন্টের পক্ষেই জনমত প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষকরূপে গবর্ণমেন্ট যখন কোন সীমানার উপর নিজের দাবী প্রয়োগ করেন, তখন উহা জাতীয় সম্পত্তি ও জাতীয় মর্য্যাদার প্রশ্নরূপে দেখা দেয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে আপন রাষ্ট্রের সম্মান ও সার্ব্বভৌম অধিকারের দিকে তাকাইয়া জনগণকে গবর্ণমেন্টের প্রতি সমর্থন জানাইতে হয়—বিশেষতঃ সেই গবর্ণমেন্ট যদি জনগণের অধিকাংশের বা মেজরিটির ভোটের দ্বারা নির্বাচিত ও গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং চীন-ভারত সীমানার প্রশ্নে ভারতীয় জনমতের বৃহত্তম অংশ যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও তাঁর গবর্ণমেন্টকে পূর্ণ সমর্থন জানাইবেন, ইহা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

কমিউনিষ্ট চীনের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ ও চীন উভয়েই বৈদেশিক শক্তির কবলিত ছিল এবং উভয়েই নতুন সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন হাল আমলে। এই দুই দেশের মধ্যে দুই হাজার মাইল দীর্ঘ হিমালয়ের সীমানা সঠিক চিহ্নিত নাই, বৈজ্ঞানিকভাবে জরীপের দ্বারা সুনির্দিষ্টও

নাই এবং ইতিপূর্বে চীনের কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের সঙ্গে একমত হইয়া সরকারীভাবে এই সীমানা স্বীকার করিয়া কোন চুক্তিপত্রেও স্বাক্ষর করেন নাই এবং আগেকার চিয়াং কাইসেকের গবর্ণমেণ্টও স্বেচ্ছায় এগুলি স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং যেহেতু সেই গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিল, সেজন্য প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পারে নাই। কিন্তু সীমান্ত বিতর্কে চীনের এই সমস্ত 'যুক্তি' আদৌ টিকিতে পারে না। ভারত সরকার বহু প্রমাণিত দলিলপত্র, সন্ধি ও চুক্তির দ্বারা চীন সরকারের মন্তব্যকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের চিরাচরিত উত্তর সীমানার অক্ষুণ্ণতা ও অখণ্ডতা প্রমাণ করিয়াছেন।

অপর পক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতেও নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, 'ট্রাডিশন' বা ঐতিহ্যের দ্বারা অতি প্রাচীনকাল হইতে চীন ও ভারতের মধ্যে হিমালয়ের সীমানা স্বীকৃত এবং পুরুষানুক্রমে 'ব্যবহারের' দ্বারা ইহা সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত এবং ভৌগোলিক সংস্থান ও জলবিভাজিকা নীতির দ্বারা ইহা নির্দিষ্ট। গত ১০০ বছরের নানা চুক্তিপত্রের দ্বারা যে সমস্ত আইনগত অধিকার বৃটিশের হাত হইতে বর্তমান ভারত সরকার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন, তার গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্র নিশ্চয়ই তার সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে এবং বৃটিশ আমলের সন্ধি ও চুক্তিপত্র-সঞ্জাত সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতাও ভারতবর্ষের উপর বর্তাইয়াছে। এবং এই কারণেই তিব্বতে বৃটিশ শাসন হইতে ভারতবর্ষের যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ছিল, চীন গবর্ণমেণ্টও তাহা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ১৯৫৪ সালে নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দ্বারা সেই সমস্ত বিশেষ অধিকারের বিলিব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ম্যাকমেহন লাইন ও লাদাক অঞ্চলের সীমানাও ইতিহাস এবং চুক্তিপত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত। অর্থাৎ বৃটিশ আমলের আইনগত অধিকার ভারতবর্ষেরও প্রাপ্য। চীন বর্তমানে শক্তিশালী, অতএব এই পুরাণো আমলের অবস্থা তাঁরা মানিয়া লইতে না পারেন; কিন্তু ভারতবর্ষের আইনগত, আচরণগত এবং ঐতিহ্যময় সীমানার দাবীকে তাঁরা অসার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। যদি তাঁরা আগেকার সমস্ত কিছুই উড়াইয়া দিতে চান, তবে, প্রশ্ন উঠে চীনের এতবড় সাম্রাজ্যের কিভাবে উদ্ভব হইল এবং অতীতের রাজ্যবিস্তারকামী রাজা ও সম্রাটগণ কি জোরপূর্বক পরের দেশ দখল করেন নাই? তাঁদের আগেকার মানচিত্র অনুসারে ভারতবর্ষের অন্তর্গত (অন্ততঃ আমাদের মানচিত্র অনুযায়ী) ৫০ হাজার বর্গ মাইল জমি তাঁরা দাবী করিতেছেন! হিমালয়ের প্রায় আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ সীমানাই

চীনাদের দাবীর অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, উত্তর-পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম সীমানার এই তিন অংশ চীনা মানচিত্রে দাবী করা হইতেছে। যেমন, পূর্বে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বা নেফায় ৩২,৫০০ বর্গমাইল, মধ্যস্থলে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে ৫০০ বর্গমাইল, আর পশ্চিমে লাডাকে (কারাকোরামের পূর্বে) ১২,০০০ বর্গমাইল এবং কারাকোরামের পশ্চিমে (পাক-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে) ৫০০০ বর্গমাইল। নিঃসন্দেহে ইহা আজগুবী। বৃটিশ সাম্রাজ্য যেমন জোর-জবরদস্তির দ্বারা প্রায় অর্দ্ধপৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল, অতীতের চৈনিক সাম্রাজ্যও তেমনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় অপরের ভূমির উপর দখলদারি বিস্তার করিয়াছিল। অন্যথা এতবড় সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারে না এবং এত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিও সেই সাম্রাজ্য-সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

সুতরাং এই বিতর্ক জটিল এবং অন্তহীন। ইহার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে—উভয় দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিগণের মধ্যে একটি গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পরের দাবীর সম্মানজনক মীমাংসা করা।

আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নীতি হইতেছে আজিকার দিনের সর্বজন-অনুমোদিত নীতি। বিশেষভাবে ভারতবর্ষ ও চীন পঞ্চশীলের স্বাক্ষরের দ্বারা সেই নীতিকে অন্তত এশিয়া মহাদেশে আরও জোরদার করিয়াছেন। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ক্ষেত্রেও চীনের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এবং ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নীতিকে অগ্রাহ্য করেন নাই। কারণ, পঞ্চশীলের এই ঘোষণার দ্বারা চীন ও ভারতবর্ষ উভয়েই কেবল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি মানিয়া লন নাই, উপরন্তু উভয় দেশ পরস্পরের ভূমিগত অখণ্ডতা ও অক্ষুণ্ণতা মানিয়া চলিবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই বিরোধের মীমাংসা করা হইবে, এমন ঘোষণাও উভয়ের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করিতে, এমন কি দাবী করিতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এক বৈঠকে মিলিত হউন এবং সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনা করুন। সৌভাগ্যক্রমে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীই এই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে কি ভিত্তির উপর এই বৈঠকের অনুষ্ঠান হইবে। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের একটি প্রস্তুতিপর্ব দরকার

এবং তার জন্য প্রয়োজন বিতর্কিত সীমান্তের এলাকাগুলি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক কিম্বা অন্তবর্তীকালীন বিলিব্যবস্থার প্রস্তাব। গত ৯ই নভেম্বর চৌ এন-লাই তাঁর চিঠিতে ম্যাকমেহন লাইন ও লাডাকে উভয়ের সৈন্যবাহিনীকে সাড়ে বারো মাইল করিয়া হটিয়া আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে মীমাংসা বৈঠকে মিলিত হইবারও অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মীমাংসা বৈঠকে মিলিত হইবার কিম্বা শান্তিপূর্ণ আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন নাই, বরং এই মনোভাবকে স্বাগত জানাইয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হইবার পূর্বে একটা অন্তবর্তীকালীন বুঝাপড়ার দরকার। এজন্য শ্রীনেহরু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কয়েকটি পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন, যার অর্থ এই যে, সীমান্ত অঞ্চলে সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কোন পক্ষেরই টহলদারি বাহিনী পাঠানো উচিত হইবে না। দ্বিতীয়ত লাডাক অঞ্চলে উভয়ে উভয়ের প্রদর্শিত মানচিত্রের আন্তর্জাতিক সীমারেখা হইতে সরিয়া আসিবে এবং এভাবে যে 'no man's land' বা নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী অঞ্চলের সৃষ্টি হইবে, কোন পক্ষই চূড়ান্ত মীমাংসার আগে সেই অঞ্চলকে দখল করিবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই পাল্টা প্রস্তাব ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মনোভাব ভারতীয় পার্লামেণ্টে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে এবং সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

যদি সমস্যাটি আমাদের এই আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তা'হলে ভারত-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা এত উদ্বিগ্ন হইতাম না। কিন্তু সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। কারণ, প্রথমে তিব্বত এবং তারপর চীন-ভারত সীমান্ত উপলক্ষ করিয়া গত ৮।৯ মাসে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। যে পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তির উপর নেহরু সরকার এতদিন দণ্ডায়মান ছিলেন সেই ভিত্তি আজ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সারা দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে, সংবাদ সংগ্রহে ও প্রচারে এবং শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের এক বিপুল অংশে নেহরুর বিরুদ্ধে, কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে এবং বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল মতবাদের বাহকগণের বিরুদ্ধে এক নিদারুণ প্রোপাগাণ্ডার ঝড় বহিতেছে। ভারতবর্ষে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জোট বাঁধিয়া এবং একটি পূর্ব পরিকল্পিত নক্সা ধরিয়া নেহরু-নীতির বিরুদ্ধে এমন অভিযানে মত্ত হইয়াছে যে, মনে হইতেছে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যেন যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। যদিও এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি (এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামপন্থীর ছদ্মবেশে) নানা দল, উপদল, গ্রুপ ও

ব্যক্তি লইয়া গঠিত, তথাপি কতকগুলি মূল বিষয়ে ইহারা একমত। যেমন—

(১) চীন ও ভারতের মধ্যে মিত্রতার অবসান ও পঞ্চশীল ঘোষণার প্রত্যাহার।

(২) তিব্বত সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের চুক্তিকে অস্বীকার এবং তিব্বতকে 'স্বাধীন' রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দান ও 'বাফার ষ্টেট' রূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্যে দলাই লামার মারফৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের আনুকূল্য সংগ্রহ করা।

(৩) ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির বর্তমান নিরপেক্ষতা বর্জন।

(৪) পশ্চিমীগোষ্ঠী ও আমেরিকার সঙ্গে নূতন মিত্রতা ও প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্যের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর।

(৫) পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সঙ্গে হাত মিলানো এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একত্রে যৌথ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্মিলিত মিলিটারী কমাণ্ড তৈয়ার করা।

(৬) প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেননের পদত্যাগ এবং

(৭) সীমান্ত হইতে চীনা সৈন্য অপসারণের একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডী ঠিক করিয়া চীনকে চরমপত্র প্রদান।

সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দাবী এবং মতলব। এই মতলব হাসিল করিবার জন্য যত রকম প্রচারকার্য ও কৌশল প্রয়োজন, সেগুলিই আজ সর্বস্তরে অনুসৃত হইতেছে। মাঝে মাঝে অবস্থা এমন পাগলামির পর্যায়ে পৌছিতেছে যে, স্বয়ং নেহরুকে পর্যন্ত বাধ্য হইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হইতেছে। সংবাদপত্র ও বিভিন্ন দলকে মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য তিনি অনেকবার আবেদন জানাইয়াছেন। কারণ, তিনিও বোধহয় অনুভব করিতেছেন যে, যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ ভারতবর্ষে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যদি সেই শক্তিকে প্রতিহত করা না যায়, তবে স্বয়ং নেহরুকেও উহা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি পাল্টাইবার জন্য যাঁরা বার বার দাবী করিতেছেন, প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন যে, এই নীতির পরিবর্তন করা চলে না। কারণ, ইহা সুস্থ এবং যুক্তিসম্মত নীতি। বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ, উত্তেজনা হ্রাস, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অধিকতর সদ্ভাব সৃষ্টির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া যে চেষ্টা করিতেছে এবং ক্রুশ্চেভ ও

আইসেনহাওয়ার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে নূতন উদ্যম দেখাইতেছেন. ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পণ্ডিত নেহরু আরও বলিয়াছেন যে, যাঁরা বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি পাল্টাইয়া একটি বিশেষ শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধিতে বলিতেছেন, তাঁরা ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছেন। নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বিদেশী শক্তিকে সাহায্যেব জন্য ডাকিয়া আনিলে নূতন পরাধীনতার বন্ধন সৃষ্টি হইবে। এই ভারতবর্ষের ইতিহাসেই অতীতে বিদেশী শক্তিকে ডাকিয়া আনিবার ফলে বিপদ দেখা গিয়াছে এবং এর ফলে ভারতে বৈদেশিক রাজ কায়েম হইয়াছে। সুতরাং চীনের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য যদি কোন সামরিক গোষ্ঠীকে ডাকিয়া আনা হয়, তবে উহার পরিণতিতে ভারতবর্ষ আবাব পরাধীনতা বরণ করিতে বাধ্য হইবে। প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্কবাণী কেবল যুক্তিসম্মত নয়, ইতিহাসসম্মত। আমরা ভারতবর্ষের মর্যাদা নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে চাই এবং এ বিষয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীব সঙ্গে একমত।

—১৯৫৯ নবেম্বর।

ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে লেখা হইয়াছিল :—

দীর্ঘ আলোচনা এবং দূরবর্তী দুই দেশের মধ্যে অজস্র চিঠিপত্র, নোট ও বাদ-প্রতিবাদের বিনিময়ের পর চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের উগ্রতা ইদানীং বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া এই উপলক্ষে যাঁরা গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁদের চীৎকার ও আস্ফালনও ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। ইহার একটি বড় কারণ এই যে, ভারতেব প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াচীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাইকে ফেব্রুয়ারী মাসে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে আসিবার জন্য। মিঃ চৌ এন-লাই ও এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতবর্ষে একদল উগ্র মতবাদী রহিয়াছেন, যাঁরা এই আমন্ত্রণে আদৌ খুসী হন নাই, বরং চৌ এন-লাইকে এভাবে অকস্মাৎ আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উপর ইঁহারা চটিয়া গিয়াছেন। এমন কি, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের 'অসম্মান' করা হইয়াছে, এমন উক্তি পর্যন্ত তাঁরা করিয়াছেন।

তথাপি আসল কথা এই যে, ভারত ও চীনের দুই সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী একত্র মিলিত হইতেছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর নূতনতম পত্রে শ্রীচৌ এন-লাইকে আগামী ২০শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে আগমনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। চীন-ভারত সীমান্তের বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় ও আলোচনা করার জন্যই নেহরুজী দুই

প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোন সর্ত আরোপ করা হয় নাই। ভারতবর্ষে একদল রাজনীতিক এই সর্ত আরোপের উপরেই বিশেষ জোর দিতেছিলেন। তাঁদের দাবী ছিল এই যে, আগে চীনা সৈন্যরা দখলীকৃত ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া যাইবে, পরে দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু নেহরুজী ইহাতে সম্মত হন নাই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ খোলা মন লইয়া নিঃসর্তভাবেই এই মিটিংয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

যদিও চীন-ভারত বিরোধ অত্যন্ত তিক্ত পর্যায়ে পৌছিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু সময় সময় অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, তথাপি লক্ষ্য করিবার এই যে, প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যাকে কখনও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অতীত বলিয়া মনে করেন নাই। বরং চীনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া বক্তৃতা সত্ত্বেও তিনি এই আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উপযুক্ত সময় আসিলেই তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রীর সহিত একত্র বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। প্রকৃত পক্ষে আলোচনার প্রশ্নটিকে তিনি সর্বদাই প্রাধান্য দিয়াছেন —যদিও চীন কর্তৃক সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তিনি অত্যন্ত চড়া সুরে প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারত সীমান্ত লঙ্ঘনের জন্য চীনকেই দায়ী করিয়াছেন।

অপর পক্ষে চীন সরকার ও চৌ এন-লাই ভারত সীমান্ত লঙ্ঘনের কিম্বা আক্রমণের অভিযোগ কখনও স্বীকার করেন নাই। তাঁরা বিতর্কিত অঞ্চল-গুলিকে "চীনের ভূমি" বলিয়াই দাবী করিয়াছেন। এমন কি লাডাকের কঙ্কা গিরিবর্ত্মের ঘটনার (যাহাতে ৯ জন ভারতীয় পুলিশ নিহত হইয়াছেন) জন্য 'প্রথম আক্রমণের' দায়িত্ব ভারতীয় পুলিশবাহিনীর উপর চাপাইয়াছেন এবং ঘটনাস্থলকে চীনের অঞ্চল বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বলা বহুল্য যে, ভারত সরকার ও ভারতীয় জনমত চীনের এই বক্তব্য মানিয়া লন নাই, বরং চীনই এই ব্যাপারে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। নিঃসন্দেহে এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত বর্বর ছিল এবং দুই হাজার বছরের শান্তিপূর্ণ চীন-ভারত সীমান্তে এই প্রথম রক্তপাত হইল। চীনাদের মত এই যে, সশস্ত্র ভারতীয় পুলিশবাহিনীই 'প্রথম আক্রমণ' করিয়াছিল। কিন্তু যারা প্রথম আক্রমণ করে, তারাই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় কি ভাবে মারা পড়ে? অপরপক্ষে 'আত্মরক্ষাকারী' চীনাদের মাত্র একজন নিহত হইয়াছে। সুতরাং 'প্রথম আক্রমণের' অভিযোগ কি অবিশ্বাস্য নহে? কারণ, ইহা রণবিজ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু এই সমস্ত মর্মান্তিক এবং

শোচনীয় ঘটনা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী বরাবরই এই বিরোধকে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছেন। যদিও চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যার গোড়ার দিকে চীনের মনোভাব অনেকটা উগ্র এবং অনমনীয় ছিল. এমন কি ভারত সরকারের চিঠিপত্রের জবাব দিতে পর্যন্ত অহেতুক অতি দীর্ঘ বিলম্ব করা হইতেছিল, তথাপি গত ৪।৫ মাস যাবৎ চীনের এই মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং চৌ এন-লাইয়ের চিঠিপত্রের স্থর নরম হইয়াছে। গত নভেম্বর মাস হইতে তিনি চীন-ভারত সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতা, পঞ্চশীলের আদর্শ ও বন্ধুতা এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছিলেন। এবং চৌ এন-লাই সরকারীভাবে নেহরুকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন পিকিংয়ে কিম্বা রেঙ্গুনে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য (১৭ই ডিসেম্বরের চিঠি)। কিন্তু নেহরু তখন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদিও তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহার অর্থ শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করা নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা। যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, তখন চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে একত্র বৈঠকে মিলিত হইতে তাঁর কোন আপত্তি নাই।

ইতিমধ্যে আরও পট-পরিবর্তন হইয়াছে। যেমন (১) ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক ভারত পরিদর্শন (২) চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা এবং (৩) সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহ্যতঃ চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের কোন 'স্থযোগ' গ্রহণ করেন নাই, এমন কি ম্যাকমেহন লাইনের উপর ভারতের দাবী পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন নাই, তথাপি চীনের সহিত ভারতের বিরোধ পশ্চিমী জগতে স্বভাবতঃই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার ভারতবর্ষের মাটিতে মোটামুটি শান্তির বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ নয়, এশিয়ার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট 'শান্তির বাণী' লইয়া সরকারী অতিথিরূপে আগমন করিলেন এবং সেদিক হইতে এই ঘটনাটির বিশেষ তাৎপর্য ছিল। মোটামুটি মিঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতা ও মনোভাব ইত্যাদি আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের আবহাওয়াকেই শক্তিশালী করিয়াছিল।

ইহার পর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রহ্মদেশ ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত মীমাংসার চুক্তি। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইন এই

সমস্যা আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া পিকিং গিয়াছিলেন এবং সেখানে দুই গবর্ণমেন্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর প্রথমতঃ চীন ও ব্রহ্মের মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মের কতকগুলি এলাকা লইয়া চীনের সঙ্গে যে বিরোধ চলিতেছিল উহার মীমাংসার জন্যও ২৮শে জানুয়ারী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই ঘটনাটিরও কিছু কল্যাণকর প্রভাব ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছে।

তারপর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরও (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০) সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। মিঃ ক্রুশ্চেভ যেন ঝড়ের গতিতে শান্তি প্রচারের ব্রত লইয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতেছেন। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনের পর তিনি আফগানিস্থান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং বহু সভায় ও অনুষ্ঠানে এবং সাক্ষাৎকারে ও সম্বর্দ্ধনায় অদম্য উৎসাহের সঙ্গে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য জোর দিয়াছেন। যদিও আগামী মে মাসে প্যারিসে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবেই এশিয়ার সদিচ্ছা ও সহযোগিতা লাভের জন্য মিঃ ক্রুশ্চেভ এই সমস্ত সফরে আসিয়াছিলেন, তথাপি চীন-ভারত সম্পর্কের সঙ্গে ইহা সম্পর্কহীন, একথা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন না। কারণ, লক্ষ্য করা যায় যে, চীনের সঙ্গে যে কয়টি দেশের বিশেষ সদ্ভাব ও বন্ধুতা ছিল এবং যে কয়টি দেশের সহযোগীতায় ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দেশগুলির সঙ্গেই সাম্প্রতিক কালে চীনের বিরোধ দেখা দিয়াছিল—ভারতবর্ষের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ, ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও অনুরূপ বিরোধ এবং ইন্দোনেশিয়ার চীনা নাগরিকদের ব্যবসায় লইয়া বিরোধ। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণ-তালিকা বিশেষভাবে এই তিনটি দেশকেই গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা শক্ত নহে যে, পর্দার আড়ালে যে সমস্ত কূটনৈতিক আলোচনা হইয়াছে, সেগুলির সঙ্গে চৈনিক সমস্যারও যোগ ছিল। একথা বলাই বাহুল্য যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রখর ব্যক্তিত্বশালী প্রধানমন্ত্রীর এই শান্তি দৌত্য ও সহৃদয়তা এবং আচরণ ও ব্যগ্রতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তেজনা প্রশমনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। এমন কি, চীনের সঙ্গে বিরোধের জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে জনমনস্তত্ত্বে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাও কিছুটা দূর হইয়াছে। এদিক দিয়া সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সফর সার্থক হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পশ্চিমের কূটনৈতিক এবং সংবাদপত্র মহলে এমন গবেষণাও হইয়াছে যে,

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ভিতরে ভিতরে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় চীনের উপর তাঁর 'বন্ধুতাপূর্ণ প্রভাব' খাটাইয়াছেন এবং আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের জন্য এই মীমাংসা যে অপরিহার্য একথা বুঝাইয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। তবে, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন-দেশের শান্তি ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য মিঃ ক্রুশ্চেভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

আশা করা যায় যে, আগামী ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে চীনের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় চৌ এন-লাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জওহরলাল নেহরু একত্র হইবেন এবং এই তিক্ত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার একটী সম্মানজনক উপায় উভয়ে গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব হইবে, এমন প্রত্যাশাই আমরা করি। উভয় দেশই ইতিহাস-বিখ্যাত পঞ্চশীলের উদ্ভাবক এবং উভয়ে মিলিয়াই এশিয়াতে ও সমসাময়িক পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক আচরণ ও সম্পর্কের একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিব্বত ও হিমালয় সীমান্ত উপলক্ষে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তীব্র নিন্দা ও আক্রমণের মুখে পড়িয়াছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষই প্রার্থনা করিবেন যে, এই বিভ্রান্তি এবং অশান্তির মেঘ কাটিয়া যাইবে এবং প্রাচ্যখণ্ডে আবার নতুন আশা ও নব জীবনের সূর্য উদিত হইবে।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০।

* *

*

কিন্তু উপরের লেখাগুলিতে যে আশাই ব্যক্ত করা হউক না কেন, চীন ও ভারতের মধ্যে সীমানা বিরোধের কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইল না। ১৯৬০ সালের ১৯শে এপ্রিল হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের মধ্যে নয়াদিল্লীতে সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও এই সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না। তবে, আলোচনার দুয়ার যাতে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া না যায়, তার জন্য দুই পক্ষের সরকারী অফিসারদের উপর ভার দেওয়া হইল দলিল-দস্তাবেজ মানচিত্র ইত্যাদি আরও অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণপূর্বক 'সীমানা সম্পর্কে রিপোর্ট রচনার জন্য। দীর্ঘকাল আলোচনা ও দলিলপত্র ইত্যাদি অনুসন্ধানের পর যে রিপোর্ট অফিসারবৃন্দ তৈরী করেন, তা'তে

ভারতবর্ষের দাবীই সমর্থিত হইয়াছিল। কারণ, ভারতের বক্তব্যের পিছনে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই রিপোর্ট ভারতীয় পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, সারা ১৯৬১ সাল পার হইয়া গেল, চীন সেই রিপোর্টের এক লাইনও বাহির করিল না। পরে ১৯৬২ সালের মে মাসে চীন যে রিপোর্ট প্রকাশ করিল, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যেও ইচ্ছামত বাছাই করা ও প্রসঙ্গচ্যুত বিবরণ ছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অফিসারদের বৈঠকে ও আলোচনায় চীনের দাবীর স্বপক্ষে জোর প্রমাণপত্র পাওয়া যায় নাই। অন্যথা তাঁরা এই রিপোর্ট বছরখানেক চাপিয়া রাখিলেন কেন এবং কেনই বা কতকগুলি 'নির্ব্বাচিত অংশ' বাহির করিলেন ?

যদিও ১৯৫৯ সালের তিব্বতের বিদ্রোহের পর চীন ভারতের বিরুদ্ধে সীমানা লইয়া জেহাদের মনোভাব অবলম্বন করে, তথাপি দুই দেশের মধ্যে গত ১২।১৩ বছর ধরিয়া যে অজস্র চিঠিপত্র, নোট্ ও স্মারকলিপি ইত্যাদির বিনিময় হইয়াছে, তা'তে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সাল হইতেই কিম্বা চীন কর্ত্তৃক 'তিব্বতের মুক্তি' ঘোষণার পর হইতেই সীমান্তের প্রশ্ন অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কারণ, সীমানা সম্পর্কে চীন তখন পর্য্যন্ত এমন মনোভাব দেখাইতেছিল যে, ওটা কিছু গুরুতর ব্যাপার নয় এবং চীনের পুরাতন মানচিত্রের ভুল সীমানা সম্পর্কে মিঃ চৌ এন-লাই বলিয়াছিলেন যে, ঐগুলি পুরানো আমলের আঁকা এবং যথা সময়ে ঐগুলির সংশোধন করা হইবে।

এভাবে চীন ভারতবর্ষের সরল বিশ্বাস ও বন্ধুতার সুযোগ লইয়া ক্রমে-ক্রমে ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে ঢুকিতে থাকে। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আকসাই চিনে (লাডাকের উত্তরাংশে) চীনারা একটি সামরিক সড়ক নির্ম্মাণ করে এবং পরবর্তীকালে লাডাকের ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার বর্গ মাইল ভূমি চীনা সৈন্যেরা বে-আইনীভাবে দখল করিয়া লয়। লাডাকের এই অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম, কোন জনবসতি এখানে নাই এবং এখানকার পর্বতগুলির উচ্চতা ১৪ হাজার হইতে ২৫ হাজার ফুট পর্য্যন্ত। অধিকাংশ পর্বতই নেড়া পাথর মাত্র। কিন্তু ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সৈন্যেরা লাডাকের আড়াই হাজার বর্গ মাইল ভূমি চীনাদের হাত হইতে উদ্ধার করে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকের নেফা অঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইনের লংজুতে চীনারা ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করে এবং ঐ ঘাঁটি দখল করিয়া লয়। কয়েক মাস পরে অবশ্য তারা ঐ ঘাঁটি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে বড়হোতি এলাকায়ও (উত্তর প্রদেশ) চীনারা হামলা করিয়াছিল। তবে, সেই সমস্ত ঘটনা খুব গুরুতর আকার ধারণ করে নাই।

গত কয়েক বছর ধরিয়া চীন ভারতীয় সীমানায় যে সমস্ত হামলা করিতেছিল, তার ফলে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। এমন কি, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কাও করিতেছিলেন। ১৯৬২ সালের মধ্যভাগে কিম্বা জুলাই-আগষ্টে চীনের পক্ষ হইতে পুনরায় আপোষ-মীমাংসার জন্য আলোচনার কথা উঠে। ভারত সরকার সর্বদাই আলাপ-আলোচনায় রাজী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জুলাই মাসে লাডাকের চিপচ্যাপ উপত্যকা ও পাঙ্গুংহ্রদ এলাকায় চীনা সৈন্যেরা আবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের উপর গুলী চালায়। সুতরাং ভারত গভর্ণমেণ্ট ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবী করেন যে, আগে সীমান্তের উত্তেজনা বন্ধ করা হউক এবং আলোচনা বৈঠকে বসিবার উপযোগী আবহাওয়া তৈয়ার করা হউক। কিন্তু চীন সরকার ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে আলোচনা বৈঠক আরম্ভের জন্য প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু পর পর এমন অভদ্র ভাষায় এবং শাসানিপূর্ণ চিঠি দিলেন যে, চীন যেন জমিদার, আর ভারতবর্ষ যেন তার প্রজা! সুতরাং ভারত সরকারের পক্ষে এমন উদ্ধত ও বলদর্পী মনোভাবের নিকট নত হওয়া সম্ভব ছিল না। তথাপি, ভারত গবর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ আলোচনার দুয়ার একেবারে বন্ধ করিয়া দেন নাই। পুনরায় উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু চীনের পক্ষ হইতে শেষ জবাব আসিল একেবারে আক্রমণ ও গুলী বর্ষণের মারফৎ। ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) নেফা অঞ্চলের ভূটান, তিব্বত ও ভারত সীমান্ত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে থাগ্‌লা পাহাড়ের নিকটবর্তী ভারতীয় ঘাঁটি ঢোলার উপর চীনারা নূতন করিয়া আক্রমণ চালাইল। বাধ্য হইয়া ভারতীয় সৈন্যেরা পাল্টা আঘাত হানিল এবং এই অঞ্চল হইতে চীনাদিগকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী হুকুম জারি করিলেন। ২০শে অক্টোবর হইতে চীনারা বহু সহস্র সৈন্য ও সমরোপকরণসহ লাডাক এবং নেফা দুই রণাঙ্গনে এক যোগে প্রচণ্ড আক্রমণ

চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণে ভারতীয় সৈন্যেরা কয়েকটি ঘাঁটি ছাড়িয়া দিল এবং পিছু হটিতে বাধ্য হইল।

এভাবে চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হইল।

চীন-ভারত সম্পর্কের ঘটনাপঞ্জী

ভারতবর্ষ ও চীন উভয়ের স্বাধীনতা লাভের পর উভয়ের সম্পর্কের এবং তিব্বতের ঘটনাপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে উল্লেখ করা গেল। এই ঘটনাপঞ্জী অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, চীন কিভাবে কূটনৈতিক কপটতার আশ্রয়ে ভারতের মৈত্রী ও সরল বিশ্বাসের সুযোগ লইয়াছে।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭: ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিব্বত সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার লাভ।

১লা অক্টোবর, ১৯৪৯: চীনা গণসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৯: পিকিং রেডিও'র ঘোষণায় প্রকাশ যে, ১৩ বছর বয়স্ক পাঞ্চেন লামা মাও সে-তুঙ্‌কে অনুরোধ করিয়াছেন তিব্বতকে 'মুক্ত' করিবার জন্য।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯: নূতন চীনকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দান। যে কয়টি দেশ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল, ভারত ছিল তাদের অন্যতম।

১লা জানুয়ারী, ১৯৫০: চীন সরকার কর্তৃক তিব্বতের 'মুক্তি বিধানের' এবং চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৫০: ভারত সরকার চীন সরকারকে জানান যে, সীমান্তের পরপারে অস্থির পরিস্থিতির আশঙ্কায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পথে চীন-তিব্বত সম্পর্ক সুবিন্যস্ত করা হোক।

২১শে আগষ্ট, ১৯৫০: চীন সরকার জানান যে, শান্তিপূর্ণ পথেই তাঁরা তিব্বতের সমস্যার সমাধান করবেন এবং "ভারত-চীন সীমান্তেরও স্থিতিবিধান করা হবে।"

২৪শে আগষ্ট, ১৯৫০: তিব্বত সম্পর্কে চীনের মনোভাবে ভারত সরকার সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জানান যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে স্বীকৃত সীমানা পূর্ববৎ বজায় রাখতে হবে।

---

* বইয়ের শেষের দিকে চীন-ভারত যুদ্ধ লইয়া আরো আলোচনা করা হইয়াছে।
—লেখক।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০: রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করেন যে, চীনা গণ-সাধারণতন্ত্রের সরকারকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া উচিত।

৭ই অক্টোবর, ১৯৫০: চীনা সৈন্যদের তিব্বতে প্রবেশ।

২১শে অক্টোবর, ১৯৫০: সামরিক বলপ্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতি চীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারত সরকার জানান যে, এর ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের আসনলাভে অসুবিধা হবে এবং ভারতের সীমান্তে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫০: চীন অভিযোগ করে যে, তিব্বতের ব্যাপারে ভারত চীন-বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১লা নভেম্বর, ১৯৫০: ভারত সরকার এই অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং জানান যে, তাঁরা শান্তির পথে সমস্যার সমাধানেরই পক্ষপাতী।

ডিসেম্বর, ১৯৫০: দলাই লামার লাসা পরিত্যাগ এবং ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী ইয়াতুংয়ে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১: কোরিয়ায় চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, ভারত তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

২৩শে মে, ১৯৫১: তিব্বত ও চীনের মধ্যে ১৭ দফা চুক্তি সম্বলিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১: সানফ্রান্সিসকোয় ৪৯টি রাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারত যে সব কারণে এই সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো যে, চীনকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান জানান হয় নি।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩: ভারত সরকারের উদ্যোগে পিকিংয়ে ভারত-তিব্বত সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা সুরু হয়।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৪: তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে আট বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর। তিব্বত সম্পর্কে ভারত বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব অধিকার পেয়েছিল, সেগুলি ত্যাগ করে এবং 'তিব্বত চীনা এলাকার অন্তর্গত' বলে স্বীকার করে। এই চুক্তিরই মুখবন্ধরূপে সহ-অবস্থান সম্পর্কে বিখ্যাত পঞ্চশীলের জন্ম হয়।

২৫শে জুন, ১৯৫৪: রাষ্ট্রীয় সফরে চৌ এন-লাইয়ের দিল্লী আগমন।

২৮শে জুন, ১৯৫৪ : ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রিদ্বয়ের যুক্ত ইস্তাহারে পঞ্চশীলের পুনরুল্লেখ।

১৭ই জুলাই, ১৯৫৪ : উত্তরপ্রদেশের বড়হোতি নামক স্থানে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থিতির বিরুদ্ধে চীন সরকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর পূর্বে চীন সরকার ভারতের কোনো এলাকার উপর দাবী জানান নি, বরং ঐ বছরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভারতের অখণ্ডতা তাঁরা কখনোই লঙ্ঘন করবেন না। স্থতরাং ভারত সরকারের ধারণা হয় যে, অজ্ঞতাবশতঃই চীন বড়হোতির উপর দাবী জানিয়েছে।

২৭শে আগষ্ট, ১৯৫৪ : চীনের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং চীনা কর্মচারীদের বড়হোতি প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ভারত সরকার একটি পত্র পাঠান।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৪ : শ্রীনেহরুর চীন গমন। ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকা চীনের অন্তর্গত বলে দেখিয়ে চীনে যে সকল মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতি শ্রীনেহরু চীনা নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চৌ এন-লাই উত্তরে বলেন যে, এই সব মানচিত্রের খুব গুরুত্ব নেই। কারণ, এগুলি কুয়োমিনটাং আমলের পুরানো মানচিত্রের প্রতিলিপি মাত্র: নতুন চীনের সরকার এগুলি সংশোধনের সময় পান নি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ : আফ্রো-এশীয় (বান্দুং) সম্মেলনে চীনের অংশ গ্রহণ। গণ-সাধারণতন্ত্রী সরকারই যে চীনের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী, শ্রীনেহরু এই দাবীর সমর্থন করেন এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে চৌ এন-লাইকে সাহায্য করেন।

২৮শে জুন, ১৯৫৫ : বড়হোতিতে এক দল চীনার অনধিকার শিবির স্থাপনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানান।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ : উত্তরপ্রদেশে সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তরে দমজান এলাকায় চীনা সৈন্যদের প্রবেশ।

২৬শে জুলাই, ১৯৫৫ : বড়হোতি চীনা এলাকায় অবস্থিত বলে চীন দাবী করে।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ : একটি টহলদার চীনা দল ভারতের অন্তর্গত শিপকি গিরিপথে প্রবেশ করে এবং হুপসাং কুদ পর্যন্ত আসে। একটি ভারতীয় টহলদার দলের সম্মুখীন হয়ে তারা অস্ত্র ব্যবহারের ভয় দেখায়।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৫ : চৌ এন-লাইয়ের ভারত আগমন। ঐ সময়

স্থির হয় যে, দুই সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সীমান্ত সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যার মীমাংসা করা হবে। চৌ বলেন যে, ভারত-চীন সীমান্তের পূর্বাংশের সীমারেখা হিসাবে তিনি ম্যাকমেহন লাইন মেনে নেবেন।

২রা মে, ১৯৫৬ : নেপালের রাজার অভিষেকের সময় জোর গুজব রটে যে, তিব্বতে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

১৭ই মে, ১৯৫৬ : উত্তর-পূর্ব তিব্বতের গোলাক জেলায় চীনা সৈন্য-শিবিরের উপর একশ্রেণীর তিব্বতীয় বিদ্রোহীর আক্রমণ।

১৭ই জুলাই, ১৯৫৬ : তিব্বতে প্রচুর সংখ্যক বড় ট্যাঙ্ক আমদানির সংবাদ।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৬ : চীনের জাতীয় কংগ্রেসের খণ্ড জাতিসমূহের কমিটির চেয়ারম্যান লিউ কে-পিঙ্ কর্তৃক পশ্চিম যেচোয়ানে বিদ্রোহের সংবাদের সত্যতা স্বীকার।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ : চীন ও নেপালের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর। নেপাল কর্তৃক তিব্বতের উপর চীনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার এবং ১৮৫৬ সালের নেপাল-তিব্বত সন্ধি অনুযায়ী তিব্বতে নেপালের যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা পরিত্যাগ।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৬ : দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামার নয়াদিল্লী আগমন এবং গৌতম বুদ্ধের ২৫০০ তম মহাপরিনির্বাণ বার্ষিকীতে যোগদান।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ : চৌ এন-লাইয়ের ভারত পরিদর্শন, পশ্চিম যেচোয়ানে বিদ্রোহ এবং উহার অবসানের কথা স্বীকার। তিব্বতে জোরপূর্বক সাম্যবাদ চাপিয়ে দেওয়া হবে না এবং তিব্বতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় রাখা হবে বলে নেহরুকে আশ্বাস দান।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ : নেপালে এই মর্মে খবর পৌছে যে, চীনা সামরিক বিমান থাম চিরি গাওয়া নামক তিব্বতী গ্রামে বোমা বর্ষণ করেছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ : মাও সে-তুঙ্ ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৮-৬২ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলেও তিব্বতে কমিউনিষ্ট সংস্কারগুলি প্রবর্ত্তন করা যাবে না।

২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ : পিকিং রেডিওর ঘোষণায় প্রকাশ যে, ১৮ই মার্চ তারিখ তিব্বত হইতে নেপালী সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১লা এপ্রিল, ১৯৫৭ : ভারতবর্ষ হতে দলাই লামার লাসায় প্রত্যাবর্ত্তন।

১লা ও ২৩শে আগষ্ট ১৯৫৭ : তিব্বতে বিদ্রোহীদের ধ্বংসাত্মক কার্য ও সশস্ত্র বিদ্রোহের সংবাদ লাসায় প্রকাশিত।

এপ্রিল-মে ১৯৫৮ : ভারত সরকারের উদ্যোগে দুই সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে বড়হোতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। চীনা সরকার জানান যে, তাঁরা যে এলাকা দাবী করছেন সে বিষয়ে তারা সঠিক খবরাখবর রাখেন না।

২রা জুলাই ১৯৫৮ : লাদাকে চীনা সৈন্যদল কর্তৃক খুরনাক দুর্গ অধিকারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

২৭শে জুলাই ১৯৫৮ : নয়াচীন সরকারের পরামর্শ ক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) তিব্বত পরিদর্শনের প্রস্তাব বাতিল।

১লা আগষ্ট ১৯৫৮ : তিব্বতে ব্যাপক বিদ্রোহ স্থরু হয়েছে বলে ভারতবর্ষে নির্ভরযোগ্য খবর প্রকাশিত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ : চীনের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলির প্রতি চীনের দাবী শ্রীনেহরু সমর্থন করেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ : লাদাকে আকসাই চিনে কর্তব্যরত একটি ভারতীয় টহলদার দলকে চীনা সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে এবং পাঁচ সপ্তাহ ধরে আটক রেখে তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে।

১৮ই অক্টোবর ১৯৫৮ : আকসাই চিনে চীন সরকার কর্তৃক একটি সড়ক নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানান।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ : চীনের একটি সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত মানচিত্রে ভারত-চীন সীমান্ত সঠিকভাবে অঙ্কিত না হওয়ায় শ্রীনেহরু মিঃ চৌ এন-লাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৯ : মিঃ চৌ উত্তরে জানান যে, ভারত-চীন সীমান্ত-রেখা কখনোই সরকারীভাবে চিহ্নিত হয় নি এবং ম্যাকমেহন লাইনও চীন কখনও স্বীকার করে নি। ১৯৫৪ সালে যে, এই প্রশ্ন তোলা হয় নি, তার কারণ, তখন এই সমস্যা মীমাংসার 'উপযোগী আবহাওয়া' তৈরি হয় নি।

৯ই মার্চ ১৯৫৯ : চীনা সামরিক কমিশনার (লাসাস্থিত) কর্তৃক দলাই লামাকে পরদিন বেলা ১টায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ। কোন মন্ত্রী বা দেহরক্ষীকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ।

১০ই মার্চ ১৯৫৯ : লাসার জনতা কর্তৃক দলাই লামার প্রাসাদ ঘেরাও এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হবে না বলে দলাই লামা কর্তৃক জনতাকে আশ্বাস দান।

১১ই মার্চ ১৯৫৯ : দলাই লামার প্রাসাদে পদস্থ সরকারী অফিসারদের সভা এবং মন্ত্রিসভার নামে 'তিব্বতের স্বাধীনতা' ঘোষণা।

১২-১৭ই মার্চ ১৯৫৯ : পোটালা প্রাসাদের নীচে শোলয়ে ক্রমাগত সভা অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতার ঘোষণা কার্য্যকরী করার বিষয়ে আলোচনা।

১৭ই মার্চ ১৯৫৯ : চীনা সৈন্যগণ কর্তৃক প্রাসাদের উপর ২টি গোলাবর্ষণ।

১৮ই মার্চ ১৯৫৯ : ভারত অভিমুখে যাত্রার জন্য দলাই লামা কর্তৃক গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ।

১৯শে মার্চ ১৯৫৯ : রাত্রি ১টায় চীনা সৈন্যদল কর্তৃক নরবু-লিঙ্কা প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ সুরু এবং তিব্বতীদেরও আক্রমণ আরম্ভ।

২৩শে মার্চ ১৯৫৯ : দলাই লামার নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বেগ প্রকাশ।

২৮শে মার্চ ১৯৫৯ : ২২শে মার্চের মধ্যে তিব্বতের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে বলে পিকিংয়ের ঘোষণা। প্রকাশ যে, ২০ হাজার বিদ্রোহী এতে যোগ দিয়েছিল। স্থানীয় তিব্বতীয় সরকার বাতিল করা হলো বলে নির্দেশ জারী।

৩১শে মার্চ ১৯৫৯ : দলাই লামার ভারতে প্রবেশ ও রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ।

২৬শে এপ্রিল ১৯৫৯ : দলাই লামাকে আশ্রয় দানের জন্য চীনের দায়িত্বশীল লোকেরা যেভাবে ভারতের প্রতি অসঙ্গত ও অশোভন আক্রমণ চালাচ্ছেন, ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

১১ই জুলাই ১৯৫৯ : তিব্বতে ভারতীয় ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী ও নাগরিকদের যে বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার প্রতি ভারত সরকার চীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২৫শে আগষ্ট ১৯৫৯ : একটি চীনা সৈন্যদল নেফায় সুবনসিরি বিভাগে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণের পর লংজু অধিকার করে।

২০শে অক্টোবর ১৯৫৯ : চীনা সৈন্যরা ভারতীয় এলাকায় ৪০ মাইল অভ্যন্তরে লাদাকের কোংকা গিরিপথে প্রবেশ করে এবং নয়জন ভারতীয়কে হত্যা করে। অপর দশজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে।

১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯ : অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারত সরকার লাদাকে পারস্পরিক মানচিত্র অনুযায়ী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব করেন।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ : চীন সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ : সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য শ্রীনেহরু মিঃ চৌ এন-লাইকে ভারতে আমন্ত্রণ জানান।

১৯শে এপ্রিল ১৯৬০ : মিঃ চৌ-এর দিল্লী আগমন এবং শ্রীনেহরুর সহিত অ-সফল আলোচনা। আলোচনাকালে স্থির হয় যে, এ বিষয়ে আরো আলোচনার জন্য দুই দেশের পদস্থ অফিসারেরা বৈঠকে মিলিত হইবেন।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০ : জেলেপলা গিরিপথের কাছে একটি চীনা টহলদার দল সিকিমে প্রবেশ করে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ : ভারত সরকার দুই দেশের অফিসারদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে সীমান্ত সম্পর্কে ভারতের দাবীই সপ্রমাণ হয়। চীন সরকার দীর্ঘ দিন এই রিপোর্ট চেপে রাখার পর ১৯৬২ সালের মে মাসে রিপোর্টের চীনা অংশের কিছুটা প্রকাশ করে।

৩রা মে ১৯৬২ : পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এবং চীনের মধ্যে 'সীমানা' চিহ্নিত করণের জন্য পাকিস্থান ও চীনের উদ্যোগ।

২১শে জুলাই ১৯৬২ : লাদাকের চিপ চ্যাপ উপত্যকা ও পাঙ্গুং হ্রদ এলকায় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের উপর চীনাদের গুলীবর্ষণ।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ : ভারত-তিব্বত-ভূটান সীমান্তে নেফা অঞ্চলের ঢোলা পোষ্টে চীনাদের আক্রমণ ও ভারতীয় সৈন্যের প্রতিরোধ।

২০শে অক্টোবর ১৯৬২ : নেফা ও লাদাক দুই সীমান্তের রণাঙ্গনে বিরাট চীনা বাহিনীর আক্রমণ সুরু ও চীন-ভারত যুদ্ধারম্ভ।*

---

* 'যুগান্তরে' প্রকাশিত এই ঘটনাপঞ্জী 'এখানে প্রভূত পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রকাশ করা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

পাকিস্থান, নেপাল ও ভারত

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্থান নামে যে নতুন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল, এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন ইতিহাস তার নাই এবং কোন মহৎ আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কোন ঐতিহ্যও তার নাই। কারণ, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের আগে পাকিস্থানের কোন অস্তিত্বই ছিল না। হিন্দু-মুস্লিম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, মেজরিটি হিন্দু-কর্ত্তৃক মাইনরিটি মুস্লিমদের উপর একাধিপত্যের আশঙ্কা, আর সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ভেদনীতির চাতুর্য্য ('divide and rule') ইত্যাদি একত্র হইয়া এবং কৃত্রিম উপায়ে ভারতবর্ষকে খণ্ডন (পার্টিশান) করিয়া এশিয়াতে এই নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। কিন্তু ১৯৪৭ সাল হইতে আজ (১৯৬২ সাল) পর্য্যন্ত পাকিস্থান কখনও সংহত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে দেখা দিতে পারে নাই। উহার আভ্যন্তরীণ জীবনে ক্রমাগত সমস্যার জটিলতা ও সংকট চলিতেছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেই যেমন গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারি শাসন এবং সংবিধান রচনা ও প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে, পাকিস্থান তেমন কিছু পারে নাই। প্রথমতঃ পাকিস্থান সৃষ্টির পিছনে কোন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মুস্লিম জনতার শতকরা ৯০ ভাগই ছিল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তৃতীয়তঃ ক্রমাগত হিন্দু-বিরোধীতার দ্বারা এই জনতাকে ক্ষেপানো হইয়াছিল এবং চতুর্থতঃ পাকিস্থান ছিল একান্তরূপে ব্যক্তিনির্ভর। অর্থাৎ ব্যক্তিগত নেতৃত্বই সেখানে প্রধান ছিল এবং এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের নিজস্ব স্বার্থ, ক্ষমতালিপ্সা ও দলগত স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির দ্বারা কলুষিত ছিল। ফলে, সকলে একমত ও একপথ ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন সংবিধান রচনা করিতে পারে নাই। ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত তারা পুরাতন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযারী চলিয়াছিল এবং ১৯৫৬ সালেও যে সংবিধান গৃহীত হইল, তারও পরমায়ু ছিল কয়েক মাস মাত্র। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্ব-পাকিস্থান নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিল। সেখানে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি একত্রে পাকিস্থানের স্রষ্টা মুস্লিম লীগকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। এক কথায় পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় 'নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব' ঘটিয়া গেল। কিন্তু ইহার ফল দাঁড়াইল বিপরীত।

পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় অ-বাঙ্গালী-প্রধান কেন্দ্রীয় পাকিস্থানী সরকার পূর্ব্ববঙ্গের বিধিসঙ্গতভাবে গঠিত আইনসভা, মন্ত্রিসভা ও সরকারকে দমন করিলেন।

মিঃ গ্যে উইন্ট্ একটি পুস্তকে পাকিস্থানের এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন:

"The Moslem League, the party by whose efforts the state had been created, lost its authority and its mass support. There was economic crisis in the time of falling prices after the Korean war. There was a mysterious conspiracy against the government in the army. There were dangerous riots in the Punjab, organized by mullahs who thought the Government not sufficiently obscurantist. East Bengal, the eastern part of the state—which contains a majority of the population and pays more than half the revenue—became increasingly hostile to the western half and to the Central Government. In a general election in East Bengal, the Moslem League was swept away. The Cabinet which succeeded it talked so openly of secession that the central Gevernment stepped in and suspended its newly-elected legislature and government."*

এই উদ্ধৃত অংশের মধ্যে কেবল পাকিস্থানী সঙ্কটের চেহারাই নয়, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশও লক্ষ্য করার মত—"There was a mysterious conspricay against the Government in the army," অর্থাৎ গবর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এই সময় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা রহস্যজনক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। গ্রন্থকারের এই মন্তব্য তিন বছরের মধ্যেই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কারণ, ১৯৫৮ সালে পাকিস্থানে পুরাপুরি সামরিক শাসন কায়েম হইল।

কিন্তু উহার আগেই পাকিস্থানে ব্যক্তি-শাসন ও ব্যক্তি-প্রাধান্য বড় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৫৭ সালে আর একজন বিদেশী পর্য্যবেক্ষক (Prof Keith Callard) মন্তব্য করিয়াছেন:

"In Pakistan, politics is made up of a large number of.

* 'Spotlight on Asia', by Guy Wint, 1955.

leading persons, who with their political dependents, form loose agreements to achieve power and to maintain it."

এই ব্যক্তি-শাসনের রূপ কতদূর ছিল, সেই সম্পর্কে মিঃ মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর পুস্তকে ('Asia in the Balance') লিখিয়াছেন :

"In the continuing crisis which afflicted Pakistan, the governor-general was the dominant figure, dismissing and appointing ministers, and legislating by decree. Governments were thus responsible to an individual rather than to any expression of popular opinion. Even when the 1956 constitution came into force, it still left the president—who succeeded the governor-general—the most powerful figure in the government, despite the theoretical reduction of his powers. So powerful was he, in fact, that in 1957 the president, General Mirza, abolished the republic by his own unilateral action, and turned power over to the army. In 1958, the general was himself over-thrown, and power devolved into the hands of the army commander-in-chief General Ayub Khan......"

জেনারেল আয়ুব খানের ক্ষমতালাভের আগে পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই সময় রাজনৈতিক সংশ্রবশূন্য হইয়া একমাত্র স্থির ছিল পাকিস্থানী আর্মি বা সৈন্যবাহিনী।

"Only one element stood outside the dangerous fluidity of politics in Pakistan at this time, and that was the army, faithful to 'Pakistan' and not to personal leaders. Its very 'non-political' character was to make it a decisive force in the State."

(মাইকেল এডওয়ার্ডস)

সুতরাং পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সামরিক শাসনের অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই সময় কেবল পাকিস্থানেই নহে, এশিয়ার ও আফ্রিকার বহু দেশে পার্লামেণ্টারি শাসন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং মিলিটারির হাতে ক্ষমতা চলিয়া যাইতেছিল।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিম্নলিখিত প্রবন্ধে সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছিল।......

পাকিস্থানে সামরিক রাষ্ট্র

এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে অকস্মাৎ সামরিক অভিযানের এক নতুন জোয়ার দেখা দিয়াছে। বিশেষভাবে গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পর পর কয়েকটি দেশ যেভাবে মার্শাল ও জেনারেলদের হাতের মুঠিতে আসিয়াছে, তাতে স্বভাবতই প্রাচ্যখণ্ডে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়া নানা উদ্বেগ ও জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও সুদান এই কয়টি রাজ্য পর পর অতি দ্রুত সমর বিভাগের এবং সেনাপতিদের শাসনাধীনে চলিয়া গিয়াছে। ইহার আগে গত ৫।৬ বছর ধরিয়া পশ্চিম এশিয়ার কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যের রাজ্যগুলিতে নানা সামরিক অভ্যুত্থান, রক্তপাত এবং গুপ্ত হত্যা ও হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায়ও কোনও না কোন আকারে সামরিক দৌরাত্ম্য ও বিদ্রোহের চেষ্টা দেখা দিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় কার্যত মিলিটারির একটি শক্তিশালী অংশ ক্ষমতা দখলের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই অপচেষ্টা সার্থক হয় নাই। অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের কয়েক কোটি মানুষের সমাজ জীবন এক নতুন অস্থিরতার মধ্যে পড়িয়াছে।

এই সমস্ত সামরিক 'অভিযানের' মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন হইতেছে পাকিস্থানের ঘটনাবলী—এশিয়া মহাদেশের বিবেচনায়ও বটে এবং প্রতিবেশী হিসাবে ভারতবর্ষের বিবেচনায়ও বটে। গত ৭ই অক্টোবর রাত্রে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা অকস্মাৎ সমগ্র পাকিস্থানে সামরিক আইন ঘোষণা করেন এবং কেন্দ্রের ও প্রদেশের সমস্ত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেন। পাকিস্থানে সমস্ত আইন-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এমন কি, পাকিস্থানী সংবিধান ও শাসনতন্ত্রও বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়ুব খানকে সারা পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসকের পদে নিয়োগ করেন। ৭ই অক্টোবর রাত্রে সামরিক আইন ও সামরিক শাসন প্রবর্তনের আগে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। কারণ, আওয়ামি লীগ হইতে সদ্য নিযুক্ত ৬ জন মন্ত্রী মাত্র চারদিন দপ্তর চালাইবার পর পদত্যাগ করেন। ফলে, মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের (রিপাব্লিকান দলভুক্ত) কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার পতন প্রায় সুনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহারই অব্যবহিত পর রাত্রিবেলা প্রেসিডেণ্ট মীর্জা

সমগ্র পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া উহার পরিচালনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব মূল সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আয়ুব খানের হাতে তুলিয়া দেন। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণায় বলা হয় যে, পাকিস্থানে ঘুষ, দুর্নীতি, চোরা-কারবার, বে-আইনি কারবার ইত্যাদি সমাজকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি অপদার্থ, অক্ষম, স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণ দলাদলি নিয়া ইহারা মত্ত, দেশকে গোল্লায় দিয়াছে এবং দিতেছে। সুতরাং ইহাদের হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া সুস্থ শাসননীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট মীর্জার বক্তব্য হয়ত যুক্তিহীন ছিল না, কিম্বা তাঁর ঘোষণায় পাকিস্থানের যে আভ্যন্তরীণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অসত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে ১১ বছরের শাসনে পাকিস্থানী রাজনৈতিক দলগুলি চরম ব্যর্থতা এবং ঘোরতর কেলেঙ্কারির পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য ইস্কান্দার মীর্জাও কম দায়ী ছিলেন না। তিনি নিজেই ছিলেন রিপাব্লিকান দলের সংগঠক এবং রাজ-নীতির কলকাঠি তিনি নিজেও কম নাড়েন নাই। সুতরাং মীর্জা সাহেব তাঁর দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দল ও সংবিধান উচ্ছেদ করিয়া এবং পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের সমাধি দিয়া সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হইলেই কি দুর্নীতিদুষ্ট রাজনৈতিক শাসন কলঙ্ক ও কলুষমুক্ত হইবে? অর্থাৎ পার্লামেণ্টারি শাসনের চেয়ে মিলিটারি একনায়কত্ব কি শ্রেয়ঃ? তৃতীয়ত পাকিস্থানের এই শোচনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার মূলগত কারণগুলি কি? কি কি ঘটনা ও অবস্থার সমাবেশে পাকিস্থানের এই অধঃপতন ঘটিল? একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, পাকিস্থানের শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক অত্যন্ত পশ্চাৎ-গামী। তারা অধিকাংশই নিরক্ষর ও সরল চাষী, জমি ও কৃষির উপর তাদের জীবন নির্ভর। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা তাদের জীবনের অন্যতম অভিশাপ। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এই যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা হইতে তারা বঞ্চিত। দীর্ঘকাল মোল্লাতন্ত্র এবং অখণ্ড ভারতে কংগ্রেস বিরোধিতা ও মুস্লিম লীগের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তাদের এক বৃহৎ অংশের দৃষ্টিভঙ্গীকে কলুষিত করিয়াছে। সমস্ত দুর্গতির মূল হিন্দুরা এবং ভারতবর্ষ— রাজনৈতিক মতলবাজদের এই দুষ্ট প্রচারকার্য তাদের মনকে বিষাইয়া রাখিয়াছে। মানবিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের শিক্ষা এবং মানুষের জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধের ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাদের সম্মুখে ব্যাপকভাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই। তাদের কোন স্বতন্ত্র দেশ ও স্বাধীন সত্তা ছিল না। এই ভারতবর্ষেরই ছিল তারা অন্যতম অঙ্গ ও অংশীদার। কিন্তু হিন্দুরা যেমন

মোটামুটিভাবে মুস্লিম জনগণকে আপন জন ভাবে নাই, মুসলমানরাও তেমনি হিন্দুকে আপন ভাই হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। (অবশ্য ইহার ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ বহুবিধ)। ফলে, বৈদেশিক শাসনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চরমে উঠিয়াছে এবং সংগঠনের বদলে সংহার এবং একাত্মতার বদলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত প্রচুর হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ভারতবর্ষকে কাটিয়া পাকিস্থান সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া কোনও জাতি অগ্রসর হইলে তার চিন্তা ও চরিত্রের উন্নতি ঘটে, কিন্তু মুস্লিম লীগের প্রভাবাধীন মুসলমান-দিগকে চরিত্র ও চিন্তার এই উন্নততর অগ্নিশুদ্ধির মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোন সংগ্রাম নয়, উহা গুণ্ডামী। মাত্র এই গুণ্ডামীর দ্বারা কোন নৈতিক মান ও চারিত্রিক মানের উন্নতি ঘটা দূরে থাকুক, বরং অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্থান অতীতের আবর্জনা মুক্ত করিয়া নূতন গণতান্ত্রিক জীবন গঠনের আন্তরিক উদ্যম ও চেষ্টা করে নাই। বরং ক্রমাগত কাশ্মীর, খালের জল, অপহৃতা নারী, উদ্বাস্তু, দেনা-পাওনার হিসাব এবং সীমান্তের জমি ইত্যাদি লইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে অতি তীব্র ও তিক্ত শত্রুতার সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই উপলক্ষে একদিকে যেমন জনসাধারকে ক্ষেপাইয়াছে, জেহাদের জিগীর তুলিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক সাহায্যের প্রার্থী হইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ যুদ্ধজোটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। রণনীতি যেমন গিয়াছে বিদেশীর হাতে, তেমনই অর্থনীতি বাণিজ্যনীতি এবং শ্রমশিল্পের নীতিও বৈদেশিক শক্তির স্বদেশী এজেণ্টদের কুক্ষিগত হইয়াছে। জনস্বার্থ, শ্রমিকস্বার্থ ও কৃষকের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইয়াছে। একদল হাঙ্গর-কুমীর পাক-অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতিকে গ্রাস করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান কার্যত পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশে পরিণত। ইহার সঙ্গে ভাষাগত বিরোধ, বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অবসান, মুস্লিম সমাজের অভ্যন্তরে নানা সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে এবং বিশেষভাবে গণতন্ত্রবাদী ও প্রগতিবাদী শক্তিগুলিকে 'ভারতের চর' হিসাবে প্রচার করা, বামপন্থীদিগকে নির্বিচারে নির্যাতন করা ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। পাকিস্থানে মন্ত্রিত্ব হইতে নেতৃত্ব পর্যন্ত সমস্ত তাসের ঘরের মত পর পর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং হত্যা ও হত্যার চক্রান্ত মাঝে মাঝে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের নাটকীয় ঘটনা-বলী এদিক দিয়া আবার উত্তেজনার বন্যা আনিয়াছে। পাকিস্থানে বন্যা,

দুর্ভিক্ষ, অনশনে মৃত্যু ও মহামারীতে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাও কম শোচনীয় ছিল না। বৈদেশিক সামরিক সাহায্য এই সমস্ত ব্যাধির কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই, অথচ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মাত্রা বাড়াইয়াছে প্রচুর। কিন্তু এত হাঙ্গামা করিয়াও পাকিস্থান একটি মাত্র সমস্যারও মীমাংসা করিতে পারে নাই—কাশ্মীর হইতে কৃষকের প্রশ্ন পর্যন্ত সমস্তই দিন দিন জটিলতর এবং অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, গত ১১ বছরের পাকিস্থানী রাজনৈতিক শাসন জনগণের বিরোধী এবং গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। এজন্যই ত্যক্তবিরক্ত ও হতাশ জনগণের পক্ষ হইতে জেনারেল আয়ুব খানের ক্ষমতালাভের বিরুদ্ধে কেহ একটি অঙ্গুলিও তোলে নাই।

প্রেসিডেন্টের পদ হইতে ইস্কান্দার মীর্জার বিতাড়ন, লণ্ডনে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ এবং আয়ুব খান কর্তৃক প্রেসিডেন্টের গদীতে আরোহণ ও তথাকথিত মন্ত্রিসভার নামে একটি আধা মন্ত্রীজোট গঠন ইত্যাদি ঘটনা এত সুবিদিত যে, এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে, বিশেষভাবে 'যুগান্তর' ও অন্য একটি পত্রিকায় পাকিস্থানী সামরিক শাসনের অন্তরালবর্তী কতকগুলি ঘটনা ও কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে এবং এগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কিছুকাল যাবৎ ক্ষমতা দখলের জন্য একটি চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছিল (স্বয়ং আয়ুব খানও ইহা স্বীকার করিয়াছেন) এবং কার্যত ইস্কান্দার মীর্জাকে জোর করিয়াই সমস্ত কাগজপত্রে সহি করানো হইয়াছে। এই ক্ষমতা দখলের অন্যতম লক্ষ্য হইতেছে পাকিস্থানের নূতন প্রগতিশীল জনমতকে সায়েস্তা করা এবং এই জনমতের বাহকদিগকে দমন ও শাসন করা। সারা পাকিস্থানে এই দমননীতির বেড়াজাল ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই দমন ও শাসন হইতে মুস্লিম লীগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট-ভাবে ধরপাকড় ও শাস্তি চলিতেছে তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা পাকিস্থানে সত্যকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অর্থ নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে যাঁরা অনবরত 'মুক্ত দুনিয়া' ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের গুণকীর্তন করিতেন, তাঁরা পাকিস্থান, সুদান, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডের এই সমস্ত সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে নীরব। অন্তত মিশর, ইরাক, লেবানন ইত্যাদি লইয়া তাঁরা যে পরিমাণ সোরগোল বাধাইয়াছিলেন, পাকিস্থানের বেলায় কিন্তু তেমন কিছুই শুনা যাইতেছে না। সুদান, পাকিস্থান, থাইল্যাণ্ডের

এগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র—কেবল এইটুকু বলিয়াই লণ্ডন-ওয়াশিংটনের প্রচারকর্তারা পাশ কাটাইয়া থাকেন। তবে, সানন্দে এইটুকু তাঁরা স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত এই সমস্ত দেশের সদ্ভাব আগের মতই বজায় থাকিবে। অবস্থার এই লক্ষণ দেখিয়া কোন কোন বামপন্থী মহল সন্দেহ করিতেছেন যে, এই সমস্ত সামরিক শাসন প্রবর্তনের পিছনে বৈদেশিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিভাগের গোপন হস্তের ক্রিয়া আছে। এই সন্দেহ একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কারণ. পাকিস্থান এমনভাবে মার্কিণ রণনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কেবলমাত্র নিজের একার ইচ্ছায় এত বড় পরিবর্তন পাকিস্থানে ঘটানো সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতই সন্দেহ জাগিতে পারে। সেই সন্দেহের একটা বড় কারণ এই যে, আফ্রিকা-এশিয়ার নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি আগে ছিল পশ্চিমী শক্তি-বর্গের জমিদারী। এই জমিদারী হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় তারা আদৌ সুখী নয়। বিশেষভাবে এই সমস্ত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ও সাম্যবাদের প্রচুর সহানুভূতি ছিল এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই সহানুভূতির প্রভাব পড়িতেছে জনগণের অর্থ-নৈতিক মুক্তির দাবীতে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের শাসক সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া তাঁরা এই অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীকে প্রতিহত করিতে চাহেন। এই দিক দিয়া বৈদেশিক ধনতন্ত্রবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁরা একজোট। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির শাসনের প্রতি জনসাধারণ ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হওয়ার ফলে একদিন 'বামপন্থী বৈপ্লবিক' বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। সুতরাং উহা ঘটিবার আগেই যদি মিলিটারি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই একনায়কত্ব সমস্ত প্রগতিমূলক চেষ্টার টুটি চাপিয়া ধরিয়া যদি প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিষ্ট বা আধা-ফ্যাসিষ্ট শাসন চালু করিতে পারে, তবে উহা দ্বারা আপাতত কায়েমী স্বার্থই লাভবান হইবে। সুতরাং পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র টিকিল কিম্বা গোল্লায় গেল, তাহা লইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক বা আধা-সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর ইউরোপে বা আমেরিকায় "বিপন্ন গণতন্ত্রের" জন্য কোন আর্তনাদ উত্থিত না হওয়ার অন্যতম কারণ ইহাই। কিন্তু অবস্থা যদি বিপরীত হইত—অর্থাৎ পাকিস্থানে, ব্রহ্মদেশে, থাইল্যাণ্ডে, সুদানে কিম্বা ইন্দোনেশিয়ায় যদি এভাবে অকস্মাৎ কমিউনিষ্ট ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে "বিপন্ন গণতন্ত্রকে" উদ্ধার ও রক্ষা করিবার জন্য এতদিনে পশ্চিমী জগতে তুমুল সাজো সাজো

রব পড়িয়া যাইত। সারা জগৎ প্রচারকার্যের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত।

কিন্তু এভাবে অ-সামরিক শাসনে ও রাষ্ট্রপরিচালনায় সামরিক বাহুর বিস্তার আর একটি দিক দিয়াও বিপজ্জনক। সমর নেতা ও সামরিক অফিসারগণ সাধারণত রাজনৈতিক দর্শনে দীক্ষিত নহেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারা মিলিটারি শাস্ত্র এবং অনুরূপ নিয়মকানুন হইতে উদ্ভূত। ফলে, রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলি তাঁরা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। বেয়নেটের রণনীতির দ্বারা জীবনধারণের মূল সমস্যাগুলির মীমাংসা করা যায় না। অন্তত দেশের শান্তির সময়ে সেনাপতিদের হাতে শাসনভার তুলিয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে চোর তাড়াইতে গিয়া ডাকাতকে ডাকিয়া আনা। হিট্‌লারের জার্মানীতে, মুসোলিনীর ইতালীতে এবং তোজোর জাপানে সামরিক কিম্বা আধা-সামরিক শাসনের শেষ ফল দাঁড়াইয়াছিল জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক জগতে যে উত্তেজনা-কর দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, বর্তমানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেকটা সেই ধরণের দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। যদিও বর্তমান মুহূর্তে আর একটি মহাযুদ্ধের আতঙ্কিত সম্ভাবনা আসন্ন নয়, তথাপি রাজনৈতিক শাসনের বদলে এভাবে দেশে দেশে সামরিক শাসক ও সমরনেতাদের আবির্ভাব জনসাধারণের পক্ষে যেমন কল্যাণকর নয়, তেমনি ভবিষ্যতের পক্ষেও ইহা নিরাপত্তাব্যঞ্জক নয়। কারণ, এই সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে আরও জটীলতা ও ঘূর্ণিপাক সৃষ্টির যেমন সম্ভাবনা, তেমনি আন্তর্জাতিক বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা। এ জন্যই যাঁরা প্রকৃত গণতন্ত্র চাহেন, যাঁরা জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি চাহেন এবং যাঁরা সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তি, স্বাধীনতা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁরা কখনও রাষ্ট্রশাসনে মিলিটারির আগমনকে স্বাগত জানাইতে পারেন না।

* * *

চারি বছর পর ১৯৬২ সালে পাকিস্থানে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ্ কিছুটা শিথিল হইল 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক বিচিত্র সংবিধান জারির দ্বারা। কিন্তু কার্য্যতঃ ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান এবং তাঁর দলবলই পাকিস্থানের আসল ক্ষমতার নিয়ামক রহিয়া গেলেন। পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক জীবন সেখানে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সর্ব্বপ্রকার

প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেখানে নিষিদ্ধ—যদিও পূর্ব্ব পাকিস্থানের ছাত্র ও যুবকগণ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আশ্চর্য্য দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল।

১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ সাল—এই দশ বছর কিম্বা পাকিস্থানে মিলিটারি শাসন পুরাপুরি কায়েম হইয়া বসিবার আগে পর্যন্ত পাকিস্থান কি প্রকার পররাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করিয়াছে? নীচে সেই পররাষ্ট্রনীতির মর্ম্ম দেওয়া গেল:

পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতি

ইতিহাস ও কূটনীতিতে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা বলেন যে, কোনও দেশের পররাষ্ট্রনীতির বিচারে সেই দেশের ভৌগোলিক সংস্থানের কথা সর্বাগ্রে ভাবিতে হইবে। কারণ, পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রথম লক্ষ্য হইতেছে নিরাপত্তা কিম্বা আপন রাষ্ট্রের নির্বিঘ্নতা বিধান। যদি এই প্রাথমিক মানদণ্ড দিয়া পাকিস্থানকে বিচার করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, আরম্ভেই বা গোড়াতেই উহার গলদ রহিয়াছে। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানের বিচারে পাকিস্থান এমন একটি রাজ্য যার প্রধানতম প্রতিবেশীর সঙ্গেই তার কোন সদ্ভাব নাই। সদ্ভাব দূরের কথা, বরং নানা অজুহাতে পাকিস্থান এই প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে। পাকিস্থানের এই নিকটতম এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিবেশী হইতেছে ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষের অঙ্গ কাটিয়া মুস্লিম-প্রধান পাকিস্থানকে জন্ম দিতে হইয়াছে। ধাত্রীবিদ্যা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'সিজারিয়ান্ অপারেশন' বলে, পাকিস্থানও তেমনি মাতৃদেহের অস্ত্রোপচারের দ্বারা বৃটিশ শল্য চিকিৎসকের কৃপায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত সে ভারতবর্ষের প্রতি কাশ্মীর নিয়া 'রণং দেহি' চ্যালেঞ্জ সুরু করিয়াছে। আধুনিক কালের ইতিহাসে এমন দৃশ্য নিশ্চয়ই অভিনব। যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও ধর্মান্ধতা মধ্যযুগীয় সমাজবিন্যাসের অনিবার্য পরিণতি, তারই সমষ্টিগত প্রতিফলিত রূপ পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশমান। পাকিস্থানের ভিতরের ও বাহিরের সঙ্কট এত পরিষ্কার যে, কোন রাজনৈতিক দল এবং কোন নেতাই সেখানে হালে পানি পাইতেছেন না। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও জাতিগত বিচারে পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ এক—উহার সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ কৃত্রিম ও অবৈজ্ঞানিক। ফলে, অখণ্ড সমাজদেহের বলপূর্বক ভাঙন এক বিচিত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে এবং যাঁরা স্বার্থবুদ্ধি-

পরায়ণ, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল তাঁরা পাকিস্থানের সমস্ত দুঃখ ও দুর্গতির জন্য ভারতবর্ষের দিকে, হিন্দু-সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া তাঁরা নিজেরা রেহাই পাইতে চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব হইতে পাকিস্থানের জন্ম, সেই বিরূপতা ও অশ্রদ্ধাই পাকিস্থানী শাসকবর্গকে সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক চিন্তাধারা ও কার্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। অন্যথা ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা যে, ভৌগোলিক বিচারে পাকিস্থানের প্রাথমিক নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে দূরবর্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপরে নয়—নিকটবর্তী ভারতবর্ষের উপর এবং এই ভারতবর্ষ পাকিস্থানের তুলনায় প্রায় সমস্ত দিক দিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী। সুতরাং পাকিস্থানের উচিত ছিল গোড়া হইতেই ভারত-বর্ষের প্রতি বন্ধুতার হাত বাড়ানো। অথচ বন্ধুতার বদলে পাকিস্থান হাত বাড়াইয়া দিল কাশ্মীর দখলের জন্য! অর্থাৎ বিসমিল্লায় গলদ।

যে কোন রাষ্ট্রের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য চাই প্রতি-বেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা।* এমন যে বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্র তারও নবজন্মের পর দেখা গেল যে, বিপ্লবী লেনিন প্রথমেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুতা ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য আগ্রহশীল। এজন্য পর পর কতকগুলি অনাক্রমণ চুক্তি, এমন কি দূরবর্তী আফগানিস্থান ও পারস্যের সঙ্গে পর্যন্ত নতুন সৌভ্রাত্রমূলক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানের বিচারে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু নবজাত পাকিস্থান উল্টা পথ ধরিল। কেবল ভারতবর্ষের বিরোধিতাই নয়, আফগানিস্থানের সঙ্গেও পাকিস্থানের নিদারুণ ঝগড়া বাধিল—পাখ্‌তুনিস্থানের দাবী পাক্ কর্তাদিগকে বে-সামাল করিয়া তুলিল। পাকিস্থানের অন্যতম প্রতিবেশী রাজ্য ইরাণ। ডাঃ মোসাদ্দেকের আমলে ইরাণ দুঃসাহসিক সার্বভৌম অধিকারের দিকে যাত্রা করিয়াছিল—এ্যাংলো-ইরাণীয়ান্ পেট্রোল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার হুকুমের দ্বারা। ইরাণে প্রগতিশীল মতবাদ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। সেই সময় ভারতবর্ষে ইরাণের প্রতি প্রচুর সহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্থানের শাসকবর্গ প্রতিবেশী ইরাণের সেই দুঃসাহসিক অভিযানে কোন সাহায্য দেন নাই, কোন সহানুভূতি দেখান নাই। আজ যখন ইরাণ ইঙ্গ-মার্কিণ জোটের করতলগত, তখন পাকিস্থানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ সাহিদ সোহরাওয়ার্দি

* ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রীয় নীতিও এই দিক হইতে তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। —লেখক

ইরাণের সঙ্গে দোস্তি করিতেছেন। পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা আর এক দৃষ্টান্ত।

কিন্তু ভৌগোলিক বিচারে পাকিস্থান কেবল ভারতবর্ষের সংলগ্ন নয়, মধ্য-প্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক সীমানাও ওখান হইতেই স্বরু। এখানে পাকিস্থান বলিতে আমরা পশ্চিম পাকিস্থানই বুঝাইতেছি। কারণ, কার্যত পূর্ব পাকিস্থান বা পূর্ব বাংলা আলাদা দেশ—একমাত্র ধর্মের মিল ছাড়া অন্য কোন মিল পূর্বাংশের সঙ্গে পশ্চিমাংশের নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও যেমন এক দেশ এবং এক জাতি নহে, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে এক ইসলাম ধর্মের যোগসূত্র সত্ত্বেও দুই অংশ কোনও প্রকারেই এক নহে। ভাষা, খাদ্য, পোষাক, সামাজিক আচরণ, সংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ব—যে কোন প্রশ্নের বিচারেই দুইয়ের মধ্যে গভীর অমিল। এই পশ্চিম পাকিস্থান পশ্চিম এশিয়ারই সীমান্তবর্তী। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র ইরাকের সঙ্গে ছাড়া পাকিস্থানের বিশেষ কোন সদ্ভাব নাই অন্যান্য আরবীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে। অথচ পাকিস্থান ঐসলামিক সংহতির জন্য কিম্বা প্যান-ইসলামের জন্য মাঝে মাঝে বুলি আওড়াইয়া থাকে। কিন্তু প্যান্-ইসলামের বুদ্বুদ বিশেষভাবে পাকিস্থান ও তুরস্কের জন্যই ফাটিয়া গিয়াছে। এবং পাকিস্থানী পররাষ্ট্রনীতির ইহাও এক অভিনব দৃশ্য। পররাষ্ট্রীয় নীতির ভৌগোলিক ভিত্তি যদি স্মরণ রাখিতে হয়, তবে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও পশ্চিম এশিয়া—চারিদিকের এই সুবৃহৎ প্রতিবেশী-বলয়ের সঙ্গে পাকিস্থানের সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষ কিম্বা সহানুভূতিশূন্য আচরণ উত্তর আফ্রিকার আরব জাতিগুলির দিকে পর্যন্ত প্রসারিত। কারণ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম জাতিগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর যে লড়াই চলিতেছে, সেই লড়াইয়ে পাকিস্থানের সমর্থন জানানো দূরের কথা, বরং ফ্রান্সের সঙ্গেই তার দোস্তি চলিতেছে। এখানে কিন্তু আর ঐসলামিক ঐক্যের কথা পাকিস্থানের মনে পড়ে না। মিশর, সৌদি আরব ও সিরিয়া—এই তিনটি প্রধান আরব রাষ্ট্রের সঙ্গেও পাকিস্থানের সম্পর্ক মোটেই শরিয়ৎসম্মত নয়, যদিও পাকিস্থানী সংবিধান নাকি শরিয়তি বিধিনিষেধের উপরেই দণ্ডায়মান। অর্থাৎ এই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্থানের দস্তরমত বিরোধ।

গত অক্টোবর-নভেম্বর (১৯৫৬) সুয়েজখাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করা উপলক্ষে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইস্রায়েল মিশরের উপর যে আক্রমণ চালাইয়াছিল,

সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষসহ এশিয়ার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়াচীনতো স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাইয়া এই আক্রমণ রোধ করিতে চাহিয়াছিল, এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বৃটেন ও ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে এক কড়া প্রতিবাদ লিপি পাঠাইয়া অত্যন্ত চড়া সুরে ধমক দিয়াছিলেন। সেই সময় তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় লাগে লাগে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মতৎপরতার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে দাবানল বিস্তার শেষ মুহূর্তে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের সেই নিদারুণ সঙ্কটের দিনেও পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্ট সক্রিয় হন নাই, তাঁদের পররাষ্ট্রীয় দপ্তর মিশরকে সমর্থনের জন্য অগ্রসর হয় নাই, বরং নানা ছুতায় বিরাগ ও ঔদাসিন্যই দেখাইয়াছে। অথচ পাকিস্থানের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ পাক সরকারের এই প্রকার পররাষ্ট্রীয় নীতির ঘোরতর বিরোধী। সুয়েজ খালের সঙ্কট উপলক্ষে ইংলণ্ডে যেমন ইডেনের নীতির (মিশর আক্রমণ) বিরুদ্ধে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা মারফৎ জনগণ প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, তেমনি পাকিস্থানের করাচীতে, চট্টগ্রামে, ঢাকায়, লাহোরে এবং অন্যান্য শহরে ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ পাক্ সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে দস্তুরমত বরবাদ্ করিয়াছেন। কেবল পাকিস্থানের অভ্যন্তরে নয়, মিশরে ও সিরিয়ায় এবং সৌদি আরবের রাজধানীতেও পাকিস্থানী নীতি অশ্রদ্ধা ও অপ্রীতি উদ্রেক করিয়াছে। সৌদী আরবের রাজার ভারতবর্ষে আগমন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সৌদী আরবে গমন উপলক্ষে পাকিস্থান যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, তা'তে মুস্লিম জগতে তার কোন সুনাম বৃদ্ধি হয় নাই। এমন কি, সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্রসচিব করাচী পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া পাকিস্থানী পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজেদের মতভেদ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অস্থিরতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আসনে কতবার রদবদল হইল তার হিসাব রাখাও কঠিন। সম্ভবত গত নয় বছরে লিয়াকৎ আলি খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, মহম্মদ আলী, চৌধুরি মহম্মদ আলি এবং সহিদ সোহরাওয়ার্দি——পর পর এই পাঁচজন প্রধান হইয়াছেন। লিয়াকৎ আলি অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক রহস্যময় কারণে নিহত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিই পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম ভিত্তি রচনা করিয়া যান এবং সেই ভিত্তি হইতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর একান্ত নির্ভরতা। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা যখন পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী ছিলেন, (তিনি নিজে সৈন্য বিভাগের লোক), তখন ১৯৪৯ সালের জুন-জুলাই মাসে তিনি গিয়াছিলেন আমেরিকায় এবং ১৯৫০ সালের মে মাসে লিয়াকৎ আলীও ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন। তাঁরা উভয়েই পর পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাকিস্থানকে অনেক পরে সেই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে আমেরিকা ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক সাহায্য চুক্তির যে দলীল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা লইয়া ভারতবর্ষে অনেক আলোড়ন ঘটিয়া গিয়াছে। মার্কিণ সামরিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনবরত পাকিস্থানে যাতায়াত করিতেছেন এবং কাশ্মীরের উত্তর প্রান্ত গিলগিট (যাহা পাকিস্থানের দখলে) ও করাচী বন্দরে মার্কিণ সামরিক বাহু প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রভূত পরিমাণ মার্কিণ যুদ্ধাস্ত্র পাকিস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিপুল সামরিক সাহায্য পাকিস্থান বিনামূল্যেই পাইতেছে। পাকিস্থানী সেনাবাহিনী ও সামরিক সংগঠনে আজ মার্কিণ বন্ধুদের অবাধ আধিপত্য। এক কথায় পশ্চিম পাকিস্থান আজ আমেরিকার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত। পরলোকগত লিয়াকৎ আলী যে দাসখতের খসড়া করিয়া যান পরবর্তী কালের চারজন প্রধানমন্ত্রীর আমলে উহাতে পুরাপুরি দস্তখৎ দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এই পাচজন প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বোধ হয় খাজা নাজিমুদ্দিন একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিলেন। অর্থাৎ তিনি অখণ্ড বাঙ্গলা দেশের বৃটিশ শাসনযন্ত্রের অংশীদার থাকায় গোড়া হইতেই একটু বৃটিশ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বৃটিশ ভক্তিও পাকিস্থানে মার্কিণ প্রেমের নতুন বনিয়াদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে পারে নাই। অন্যান্য প্রধানমন্ত্রিগণ প্রায় সকলেই আমেরিকার ভক্ত। অবশ্য এই ভক্তির আসল কারণ তিনটি :

প্রথমত পাকিস্থানের অর্থনৈতিক দুর্বলতা। পূর্ব পাকিস্থান সম্পূর্ণরূপেই কৃষিজীবি, ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে নাই বলিলেও চলে। আর পশ্চিম পাকিস্থানও শ্রমশিল্পের রাজ্যে সবে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। অথচ কলকারখানা ও শ্রমশিল্প ছাড়া আধুনিক শক্তিমান রাষ্ট্র যেমন গড়িয়া তোলা যায় না, তেমনই জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানও বাড়ানো যায় না। এই দিক দিয়া একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পশ্চিমী জগতের আর কাহারও কাছ হইতে উপযুক্ত সহায়তা ও সহযোগিতা পাইবার আশা নাই—অন্তত পাকিস্থানী কর্ণধারদের ইহাই ধারণা। সুতরাং অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্পের কারণে পাকিস্থানকে আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা স্বভাবতই স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে। কারণ, সিন্দুকের চাবিকাটি যার হাতে তার সঙ্গে

রাজনৈতিক ভাব না রাখিলে চলে না। অতএব পাকিস্থান আমেরিকার মুঠিতে গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত এই পরিণাম অনিবার্য। কেননা, পাকিস্থানের সামাজিক সংগঠনে সাধারণ মানুষের স্থান নাই। শতকরা ৮০ জন গরীব চাষীর দেশে মুষ্টিমেয় ইংরেজী ও পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অভিজাত বুর্জোয়া দেশের শাসনক্ষমতা দখল করিয়া আছে। ইসলামের সাম্প্রদায়িক ধাপ্পা ইহাদের ক্ষমতার অন্যতম রহস্য এবং সরকারী শাসনযন্ত্র হইতে সংবাদপত্র, প্রচারযন্ত্র ইত্যাদি সমস্তই এই ইংরেজী-শিক্ষিত বুর্জোয়াদের দখলে। ইহাদের সঙ্গে স্বভাবতই হাত মিলাইয়াছে নতুন পুঁজিপতি ও মূলধনওয়ালা মুনাফাজীবীর দল। কলকারখানা ও ক্যাপিটালের দাবীতে এই শোষক শ্রেণী আমেরিকার শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্থানী গবর্ণমেণ্ট ও পাকস্থানী জনগণের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষের আসল কারণ এইখানে। এবং এই সংঘর্ষ যখনই মারাত্মক হইয়া উঠে, তখনই কাশ্মীর ও ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের জিগীর তুলিয়া আভ্যন্তরীণ সঙ্কট চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়।

পাকিস্থানের মার্কিণ ভক্তির দ্বিতীয় কারণটি ইহার জঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ কাশ্মীর ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নে (দেশ বিচ্ছেদ জনিত) ভারতবর্ষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতে হইবে, কিম্বা লড়িবার ভান দেখাইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ শক্তিশালী দেশ। অতএব নিজের দুর্বলতাকে গোপন করিবার জন্য পরের 'সিংহচর্ম গাত্রে ধারণ করিয়া' পাকিস্থান বিষম গর্জন করিতেছে। আর আমেরিকা দূর হইতে পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিতেছে।

আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিবার তৃতীয় কারণ হইতেছে কমিউনিজম ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধিতা। পাকিস্থানী শাসনকর্তারা সাম্যবাদকে যমের মত ভয় করেন এবং সাম্যবাদ সংক্রান্ত সমস্ত আন্দোলন, আলোচনা ও মত বিনিময় ইত্যাদি সেখানে নিষিদ্ধ। আমরা যাকে "প্রগতি" বলি সেই শব্দটির সেখানে শ্বাসরোধ করা হইয়াছে—একমাত্র পূর্ববঙ্গের তরুণ সম্প্রদায় বহু কষ্টে এই প্রগতির দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য পূর্ব বাঙ্গলার উপর পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকদের আক্রোশের সীমা নাই। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের বৃহত্তম জনমতের অধিনায়ক মৌলানা ভাসানী। তাঁকে নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট বলা যায় না। তিনি একজন উদারতাবাদী গণতন্ত্রী নেতা কিম্বা 'প্রোগ্রেসিভ লিবারেল'। কিন্তু এই উদারতাবাদী গণতন্ত্রই পাকিস্থানে কমিউনিজম নামে চিহ্নিত এবং মৌলানা ভাসানীকে "লাল মোল্লা" নাম দিয়া রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত করার ভয় দেখানো হইতেছে।

কারণ, তিনি পাকিস্থানের বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি ইত্যাদি কিম্বা এক কথায় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিজোটের নিকট পাকিস্থানের এভাবে আত্মবিক্রয়ের বিরোধী। তিনি ভারতবর্ষের মত নিরপেক্ষতা ও শান্তির নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন। সুতরাং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কাগমারি সম্মেলন (মৈমনসিংহ) উপলক্ষে ভাসানীর সঙ্গে পাকিস্থানী শাসনযন্ত্রের বৈরিতা সুরু হইয়াছে, যার পরিণাম অকল্যাণকর। আসলে সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিজম ভীতিই পাকিস্থানী গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের নিজেদের জনমতের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহৃদয়তা ও সহযোগিতা পাইতে হইলে পাকিস্থানকে সোভিয়েট বিরোধিতা করিতেই হইবে। কারণ, মূলগতভাবেই আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট কমিউনিজমের বিরোধী এবং যাঁরা রাশিয়া ও নয়া চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী আমেরিকা তাঁদের সুনজরে দেখেন না। এজন্য ভারতবর্ষের প্রতিও মার্কিণ শাসকমহল প্রসন্ন নহেন—যদিও ভারতের নিরপেক্ষতা নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা মুখে খুব বেশী প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু আমেরিকার দৃষ্টিতে সোভিয়েট কমিউনিজম সম্প্রসারণশীল, তাঁরা ইহাকে "লাল সাম্রাজ্যবাদ"রূপে অভিহিত করেন। বাল্টিক রাজ্য (১৯৪০ সালে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত হইয়াছে) এবং পূর্ব ইউরোপীয় রাজ্যগুলি ও এশিয়ার মঙ্গোলিয়া রাজ্যটি (চীনের প্রতিবেশী) আমেরিকার মতে এই "লাল সাম্রাজ্যবাদের" বলি। হিমালয় পর্বতের তিব্বত ও কাশ্মীরের প্রান্ত সীমানা পর্যন্ত এই "লাল আতঙ্ক" বিস্তার লাভ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় ধনতন্ত্র ও সভ্যতার পক্ষে ইহা অভিশাপ। সুতরাং যে কোন ভাবেই হউক, ইহাকে রোধ করিতে হইবে। এদিক দিয়া ভারতবর্ষের তুলনায় পাকিস্থান আমেরিকার নিকট অনেক বেশী সহায়ক। কারণ, পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমেরিকার খুব মিল আছে। এই পাকিস্থানী মনোভাবকে তারিফ করিয়া অনবরত মার্কিণ পত্রিকাসমূহে ও রাজনৈতিক মহলে প্রচারকার্য চলিতেছে। যেমন—১৯৫১ সালের ২৪শে জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ, সি, ম্যাকৃমি বলিয়াছিলেন :

"They (the people of Pakistan) are strongly oriented toward the west, particularly the United States.···

The Government of Pakistan has taken active measures to repress internal communist activity. While Pakistan has

recognised the Communist Chinese Government, it is dearly aware of the aggressive aims of Communism and seeks the friendship of the United States and the non-communist countries."

আর 'নিউইয়র্ক টাইমস' ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে লিখিলেন :

"In contrast to India's aloofness from the struggle between Communism and democracy, Pakistan has been almost aggressive in her moral commitment to the western powers."

গত পাঁচ বছরে পাকিস্থানের প্রতি আমেরিকার এই মনোভাব মোটেই হ্রাস পায় নাই, বরং আন্তর্জাতিক নানা সংঘাত উপলক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে পাক-মার্কিণ সামরিক সাহায্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তির, (যাহা সিয়াটো চুক্তি নামে পরিচিত এবং যাহার আসল উদ্দেশ্য কমিউনিজম প্রতিরোধ। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি সহ ৬টি রাষ্ট্র এই চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ) অন্যতম অংশীদার হইতেছে পাকিস্থান। অপর দিকে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বৃটেন, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্থানের মধ্যে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানী পররাষ্ট্র নীতি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের সামরিক বন্ধনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। পাক্ অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তর ও পশ্চিম দিকটা রণনৈতিক কারণে গুরুত্বব্যঞ্জক। কারণ, চীন, রাশিয়া ও আফগানিস্থানের সীমানা এখানে মিশিয়াছে। পাকিস্থান আমেরিকার হাতের মুঠিতে থাকিলে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হইতে মার্কিণ রণনীতি রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমেরিকা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মহাচীনের বিরুদ্ধে চারিদিকে যে সামরিক বলয় গড়িয়া তুলিয়াছে, পাকিস্থান হইতেছে সেই বলয়ের একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থি। এমন কি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদে পাকিস্থানকে আমেরিকা ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ এশিয়ায় ঠাণ্ডা লড়াই সৃষ্টিতেও কাজে লাগাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সেই আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। যদিও পাকিস্থান নয়াচীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের বিখ্যাত বান্দুং সম্মেলনে সে সহযোগী হইয়াছিল, তথাপি এই ঘটনাগুলিকে বলা যায় পাকিস্থানী নীতির ব্যতিক্রম। অর্থাৎ পাকিস্থানী পররাষ্ট্র নীতির প্রতিক্রিয়াশীল দিকটা ইহার দ্বারা আদৌ পরিবর্তিত হয় নাই। এমন কি বর্তমান পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ সহিদ সোহরাওয়ার্দির নয়াচীন পরিদর্শনের দ্বারাও কোন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় নাই। উহা ছিল মিঃ সোহরাওয়ার্দির ব্যক্তিগত

মর্যাদা লাভের একটা কৌশল মাত্র, কিম্বা বিক্ষুব্ধ পাক জনমতের নিকট কিছুটা প্রগতির বিজ্ঞাপন প্রচার মাত্র। নয়াচীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সাম্প্রতিক পাকিস্থান ভ্রমণ (ঢাকা শহর সহ) বিশেষ কোন নতুন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্তত পাকিস্থানের নীতিতে ও আচরণে তেমন কোন প্রমাণ নাই।

পাকিস্থানী পররাষ্ট্রীয় নীতির গোড়াতেই মারাত্মক গলদ রহিয়াছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বন্ধুত্ব হারাইয়া কিম্বা সদ্ভাব নষ্ট করিয়া পাকিস্থান হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী মার্কিণ সাহায্যের ভরসায় আছে। একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা দস্তুরমত তাজ্জব ব্যাপার। অথচ জনসাধারণ এই তাজ্জব ব্যাপার সমর্থন করে না। সুতরাং মূলগত বিচারে পাকিস্থানী পররাষ্ট্র নীতি একটা পরগাছার মত, যাহা বিদেশী পশ্চিমী বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া আছে।. অর্থাৎ ইহা পাকিস্থানের মাটির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, অবাস্তব এবং কৃত্রিম। জনগণের প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন পররাষ্ট্রীয় নীতি যে কোন দিন পাকিস্থানে সঙ্কট সৃষ্টি করিতে পারে। পূর্ববঙ্গে ইহা স্পষ্টভাবেই সুরু হইয়াছে। অবশ্য পাকিস্থানে সঙ্কট কিছু নতুন কথা নয়। এতদিনে উহা গা-সহা হইয়া গিয়াছে। তবে, এভাবে আর কতকাল চলিবে?

—ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

পাকিস্থান সৃষ্টির দশ বছর কাল বা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্থানী পররাষ্ট্রীয় নীতির চেহারা ও সারমর্ম উপরে দেওয়া গেল। পাকিস্থানে সামরিক শাসনের আমলেও এই পররাষ্ট্রীয় নীতি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোটামুটি একই ছিল। কিন্তু ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালে এই পররাষ্ট্রীয় নীতির দিক পরিবর্তিত হইতে লাগিল। প্রধানতঃ কাশ্মীর এবং চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়াই পাক্ পররাষ্ট্রনীতি নূতন চমক সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ও সিকিউরিটি কাউন্সিলে পুনরায় কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করিয়া পাকিস্থান আশা করিয়াছিল যে, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিবর্গের পুরাপুরি সমর্থনে কাশ্মীরকে হাতের মুঠায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু পাকিস্থানের সেই অভিসন্ধি পূর্ণ হয় নাই। ফলে, অভিমান-ক্ষুব্ধ পাকিস্থান (বিশেষভাবে সংবাদপত্রগুলি) বলিতে লাগিল যে, আমেরিকা এবং সেণ্টো (মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা) ও সীয়াটোর (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা) অন্তর্ভূক্ত হইয়া তার কি লাভ হইল? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাকিস্থান প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৯৬২ সালের জুন মাসে ন্যাশন্যাল এসেম্বলীতে পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী পাকিস্থানের

পররাষ্ট্র নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, পাকিস্থানের ভৌগোলিক অবস্থাটা পররাষ্ট্রীয় নীতির বিচারের সময় স্মরণে রাখিতে হইবে। কারণ, পাকিস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ১ হাজার মাইলের ব্যবধান রহিয়াছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের জন্য। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থা বিরোধ ও বিসম্বাদে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হইয়া পাকিস্থানকে সেণ্টো ও সীয়াটোর সামরিক জোটে যোগ দিতে হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে "এই সমস্ত চুক্তির জন্য আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নই।" অর্থাৎ এই সমস্ত সামরিক চুক্তি সত্ত্বেও পাকিস্থান কেন পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্যে সমগ্র কাশ্মীর গ্রাস করিতে পারিল না, ইহাই তার অভিমানের মূল কারণ।

এদিকে ১৯৬১-৬২ সালে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেওয়ায় পাকিস্থান ও তার 'বৃহত্তম প্রতিবেশী' চীন পারস্পরিক নূতন সখ্যতার দ্বারা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। পাক্ অধিকৃত কাশ্মীরের যে অংশ চীনের সিন্‌কিয়াং প্রদেশের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই সীমানা সঠিকভাবে নির্দেশ এবং জরীপের দ্বারা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্থান ও চীন একমত হইল। ভারতবর্ষ এই নীতিবিগর্হিত এবং বে-আইনী কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে (১৯৬২, জুন) চীন সরকার অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় জবাব দেন এবং ভারতকে "জঙ্গী জাতীয়তাবাদের" দায়ে অভিযুক্ত করিয়া ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরের উপর চীন কখনও ভারতের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লয় নাই এবং চীন ও পাকিস্থানের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত আলোচনায় এভাবে "হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ভারতের নাই।"

ভারত বিরোধীতাকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্থানের পররাষ্ট্র নীতি নয়াচীনের মিত্রতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। নেপালের সঙ্গেও একই কারণে বন্ধুতা ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিতেছে এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সঙ্গেও মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছে। অর্থাৎ একমাত্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সঙ্গে বৈরিতা ছাড়া ১৯৬২ সালে পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পূর্বেকার তুলনা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির সুযোগ পাইয়াছে। ভারতের বিরুদ্ধে আক্রোশ মিটাইবার জন্য পাকিস্থানের সংবাদপত্র ও বে-সরকারী অভিমত চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের দুর্দিনে কার্যতঃ চীনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ ভারতবর্ষকে যখন আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র সাহায্য দিল, তখন পাকিস্থান উহার প্রতিবাদ করিল। এমন কি, পাকিস্থানের আকাশপথ দিয়া কোন অস্ত্রবাহী বিমানকে ভারতবর্ষের দিকে যাইতে দেওয়া

হইবে না, এমন কথা পর্যন্ত ঘোষণা করিল। চীন-ভারত যুদ্ধের বিপদে পাকিস্থান যেন কাশ্মীর নিয়া ভারতবর্ষের উপর কোন চাপ না দেয়, ইঙ্গ-মার্কিণ মহলের এই অনুরোধও পাকিস্থানে স্বীকৃতি পায় নাই। কেবল তাহাই নহে। পাকিস্থানের সংবাদপত্র ও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা (যেমন, খাজা নাজিমুদ্দীন) এই সুযোগে কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে সীমান্তে নূতন সৈন্য সমাবেশের জন্য পর্যন্ত পরামর্শ দিলেন।

মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাক্-ভারত সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈরিতার মধ্যে আবর্তিত হইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানের যে সমস্ত সীমানা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশিয়াছে সেগুলির উপর এবং কাশ্মীর সীমানায় পাকিস্থান ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বার বার হানাদারি ঘটাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান হইতে মাইনরিটি হিন্দু-দিগকে সুপরিকল্পিতভাবে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং হইতেছে। চীন-ভারত সংগ্রামের দিনেও পাকিস্থান তার ভারত-বিরোধীতার নীতি ত্যাগ করে নাই। তবে, নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এক ব্যক্তিগত পত্রের জবাবে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান পরিস্থিতির 'বিপদ' ও 'গুরুত্ব' স্বীকার করিয়াছেন।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক

প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের পক্ষেই প্রতিবেশী রাজ্যের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন। পাকিস্থানের বেলা যদি একথা সত্য হইয়া থাকে, তবে, ভারতবর্ষের বেলাও তাহাই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর এখনও ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সমস্ত প্রতিবেশীর সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সুস্থ হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষ একটি অতি বৃহৎ দেশ এবং তার সীমান্ত হাজার হাজার মাইল ব্যাপী। আর এই সমস্ত সীমান্তে যে সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্য রহিয়াছে সেগুলির সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক অতি পুরাতন—এমন কি, হাজার হাজার বছরের। কিন্তু আধুনিক কালে এই সম্পর্ক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রণনৈতিক ইত্যাদি বহু কারণে জটিল। অর্থাৎ প্রাচীনকালের মত সহজ নয়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, তিব্বত, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্থান, পাকিস্থান ইত্যাদি যে সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্য ভারত সীমান্তের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, ভারতীয় পররাষ্ট্রীয় নীতি সেগুলির সহিত সৌহার্দ্য সৃষ্টির বা বজায় রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে সন্দেহ নাই। তথাপি এই সম্পর্ক সর্বত্র সহজ, স্বচ্ছন্দ ও মধুর নয়। যেমন সিংহল ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতিক সম্পর্ক মোটামুটি বন্ধুতাপূর্ণ

হইয়া থাকিলেও "প্রবাসী ভারতীয়দের" প্রশ্নে এই সম্পর্ক মাঝে মাঝে অত্যন্ত ঘোলাটে হইয়া থাকে। চীনের সঙ্গে সীমান্ত প্রশ্ন এবং তিব্বতের বিষয় লইয়া গত তিন বছর যাবৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অতি তিক্ত ও তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। চীন হাজার হাজার বছরের বন্ধু প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও আজ প্রভূত অসদ্ভাব চলিতেছে। আর পাকিস্থানের সঙ্গে কাশ্মীর হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত নানা বিষয় লইয়া বিরোধের অন্ত নাই। একমাত্র প্রতিবেশী আফগানিস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সুস্থ। কিন্তু বাকী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে এই সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। নিঃসন্দেহে এই অবস্থা উদ্বেগজনক।

প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের এই প্রশ্নটি কেবল চীন ও পাকিস্তানের দিক হইতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎকণ্ঠাজনক নহে, সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া নেপালের সঙ্গেও এই সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই আমরা দাবী করতে পারি যে, ইহার জন্য ভারতবর্ষ দায়ী নহে। নেপালের বর্তমান রাজ-শাসন এবং সেই শাসনের পারিষদবর্গই ভারত নেপাল সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী। নেপাল একটি বৃহৎ দেশ নহে, উহা হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি নিভৃত রাজ্যের মত, যার জনসংখ্যা এক কোটির অনেক কম। নেপাল লম্বায় যেখানে দীর্ঘতম সেখানে ৫৫০ মাইল এবং সবচেয়ে চওড়া জায়গার বিস্তৃতি ১৫০ মাইল। ইহার উত্তরে তিব্বত, পূবে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিহার ও উত্তর প্রদেশ। নেপালের আয়তন ৫৪ হাজার ৩ শত ৬২ বর্গমাইল এবং ১৯৫৮ সালে উহার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ লক্ষ। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু ভারত সীমান্ত হইতে মাত্র ৭৫ মাইল। রাজধানীতে প্রায় ২ লক্ষ লোকের বাস। যদিও নেপালীরা সাধারণতঃ গোর্খা নামে পরিচিত; রাজপরিবার কিন্তু হিন্দুরাজপুত। আদিম অধিবাসীদের উৎপত্তি মঙ্গোলিয়ান জাতি হইতে হইলেও পরবর্তীকালে হিন্দুরক্ত প্রভুত পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে। নেপালের অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড়ে জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং নানা ধরণের পাহাড়িয়া জাতি ও উপজাতির সেখানে বাস। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্ভারের কোন ঐশ্বর্য সেখানে নাই। অধিকাংশ প্রজা কৃষিজীবী কিম্বা ভূমির উপর নির্ভরশীল এবং গরীব, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একমাত্র রাজধানী কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় আধুনিক জীবনের কিছুটা পরিচয় আছে। নেপালের রাজাই প্রজাদের বাবা-মার তুল্য এবং পাহাড়িয়াদের কাছে তিনি বিষ্ণুর অবতারের মতন। কিন্তু ১৯৫১ সালের আগে একাদিক্রেমে ১০০ বছর

(১৮৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সাল) ধরিয়া রাণাবংশ নেপালের রাজার নামে একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছেন। রাজা কার্যতঃ সিংহাসনে শালগ্রাম শিলার মত ছিলেন—অর্থাৎ সম্ভ্রম ছিল, কিন্তু শক্তি ছিল না। এমন কি, রাণাদের হাতে তিনি প্রজাদের মতই অসহায় ছিলেন। রাণারা ছিলেন একচ্ছত্র শাসন ও শোষণের মালিক। বড় বড় জমিদারির মারফৎ তাঁরা যেমন বিলাস ও ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছেন, তেমনি প্রজাদের রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যতদিন বৃটিশ শাসন ছিল, ততদিন লাট-বড়লাটেরা নেপালের এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পোষণ ও প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং নেপাল কার্যতঃ বৃটিশ রাজের আশ্রিত ছিল। নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে বৃটেনের এই আশ্রিত-বাৎসল্যের আসল কারণ ছিল চীন সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যে বৃটেন ও অন্যান্য বিদেশীয় শক্তি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় প্রায় সারা পৃথিবীতেই ওলটপালট ঘটিয়া গিয়াছে এবং সাম্রাজ্য ও সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ের দুর্গম গিরি অরণ্য ভেদ কবিয়া এই নতুন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের দাবী নেপালেও প্রবেশ করে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে যে সমস্ত নেপালী নেতা অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং নেপালী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতবর্ষে শিক্ষিত। কারণ, সারা নেপালে আধুনিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫০ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে নেপালে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভুমিকম্প ঘটিয়া গেল। ভারতবর্ষের প্রেরণায়, ভারতের সহযোগিতায় নেপালের "জাতীয় নেতৃবৃন্দ" নেপালের প্রতাপান্বিত রাণাশাহীর বিরুদ্ধে প্রবল গণ-অভ্যুত্থান সংগঠন করেন। রাণারা অবশ্য এই বিদ্রোহের নেতাদের ধরিয়া ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার স্বাক্ষর ছাড়া ফাঁসি হইতে পারে না। অতএব পরলোকগত রাজা ত্রিভুবনের উপর প্রবল চাপ পড়িয়াছিল এই মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর দানের জন্য। কিন্তু ঘটনার বিচিত্র গতিতে রাজা ত্রিভুবন স্বয়ং বন্দী-দশায় পড়িয়াছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন (সঙ্গে বালকপুত্র যুবরাজ মহেন্দ্রও ছিল) এবং সেখান হইতে নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের আশ্রয়লাভ করেন। এদিকে নেপালে জাতীয় অভ্যুত্থানের ফলে রাণাশাহীর পতন ঘটে এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতারা শক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ নেপালে প্রজা-বিদ্রোহের ফলে রাজার মুক্তি ঘটিল এবং সেই রাজা আবার মুক্তি পাইলেন ভারতবর্ষের সহযোগিতা ও সদিচ্ছায়। এই বিচিত্র ইতিহাস নিঃসন্দেহ স্মরণীয়।

রাজা ত্রিভুবনের সিংহাসনে প্রত্যাবর্তনের ফলে নেপালে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রত্যাশা জাগ্রত হয়। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে যাহাকে "নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র" বলা হয়, সেই "পার্লামেণ্টীয় রাজশাসনের" প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৫১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা ত্রিভূবন অকালে মারা যান ১৯৫৫ সালে এবং তাঁর তরুণ পুত্র রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। গোড়াতে রাজা মহেন্দ্র যথেষ্ট তরুণ মনের এবং উদারতা ও গণতন্ত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী নেপালের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জেনারেল ইলেকশান বা সাধাবণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে এবং যথারীতি পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। আমরা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবেশী রাজ্যের এই গণতান্ত্রিক অভিযানকে সানন্দে স্বাগত জানাইলাম। কিন্তু নেপালীদের অদৃষ্ট বোধ হয় মন্দ। রাজা মহেন্দ্র হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র নেপালের উপযোগী নয় এবং মন্ত্রীবর্গ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ "স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, অপচয় ও অপশাসনের" দ্বারা নেপালের "সর্বনাশ" করিতেছে। এই আকস্মিক অভিযোগ আনিয়া তিনি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে নেপালেব পার্লামেণ্টারি শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইলেন, মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করিলেন (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি. পি. কৈরালা এখনও জেলে পচিতেছেন) এবং নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতনে রাজতন্ত্রকে কলুষিত করিয়া তুলিলেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজার বদলে তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। স্বভাবতঃই এই প্রকার অত্যাচার ও অনাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য নেপালেব নেতারা আত্মগোপন করিলেন এবং অনেকে পলাইয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুবর্ণ শমসের ও ভরত শমসেরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হইল এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। সম্ভবতঃ ধরা পড়িলে তাঁদের অদৃষ্টে মৃত্যুদণ্ড জুটিবে। অর্থাৎ বিগত একশত বছরের রাণাশাহী যে পথ ধরিয়াছিল, এই "রাজাশাহীর" আমলে শাসনতন্ত্র পুনরায় সেই অত্যাচারের পথ ধরিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাজা মহেন্দ্র অত্যাচারী চরিত্রের লোক নহেন। আসলে তাঁর চারদিকে একদল দুষ্টগ্রহ দেখা দিয়াছে, যাঁদের মধ্যে সেরা হইতেছেন ডাঃ তুলসী গিরি। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত দাম্ভিক, দূরাকাঙ্ক্ষী এবং চক্রান্তবাজ। ইনি কৈরালা মন্ত্রিসভায় ছিলেন। কিন্তু বি. পি. কৈরালার জনপ্রিয়তা এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সাফল্যে তুলসী গিরি, ভরত শমসের এবং নেপালী জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও অনেক ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। ভরত শমসের গোর্খা

পরিষদের নেতা এবং এবং এই পরিষদ হইতেছে রাণাদের প্রতিষ্ঠান। পর্দার আড়ালে তুলসী গিরি ও ভরত শমসের বি. পি. কৈরালার বিরুদ্ধে রাজা মহেন্দ্রের কান ভাঙ্গাইতে থাকেন এবং অন্যদিকে আবার রাজার বিরুদ্ধে কৈরালার মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্থষ্টি করিতে থাকেন। ফলে, সিংহাসন ও মন্ত্রিসভার মধ্যে দুর ব্যবধান এবং অসন্তোষ ও বিক্ষোভের স্থষ্টি হইতে থাকে। ইহারই পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত কৈরালা মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ঘটে এবং তুলসী গিরি রাজার প্রিয়পাত্ররূপে নূতন "রাজকীয় মন্ত্রিসভার" প্রধানের পদ লাভ করেন। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে ভরত শমসের ক্ষমতা লাভ হইতে বঞ্চিত হন এবং তিনি মনের তুঃখে ইউরোপে ঘুরিয়া বেড়ান। তারপর ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, স্বাধীনভাবে তাঁর নেপালে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ। স্নতরাং তিনি "ভালোমানুষ" সাজিবার চেষ্টা করিলেন। গোর্খা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং নেপালী কংগ্রেসের সহিত একত্রে কাজ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। অন্যদিকে নেপালের অন্যতম রাজনৈতিক দল কমিউনিষ্ট পার্টিও বুদ্ধিমত্তা ও স্নবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কৈরালা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যখন গিরি, ভরত শমসের প্রভৃতি চক্রান্তবাজরা দল পাকাইতে এবং রাজা মহেন্দ্রকে উত্তেজিত করিতে থাকেন, তখন নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি বিপন্ন কৈরালা মন্ত্রিসভাকে কোন সমর্থন দেন নাই, বরং মন্ত্রিসভায় বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছেন। পাছে রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে গেলে চীন চটিয়া যায় (রাজা মহেন্দ্র পিকিং পরিদর্শনের দ্বারা নেপাল-চীন মৈত্রী, সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা এবং কাঠমাণ্ডু-লাসা সড়ক তৈয়ারির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন) এই মনোভাব নেপালী কমিউনিষ্টদের একাংশকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কমিউনিষ্টদের এক্ষণে সেই ভুল ভাঙিয়াছে। কারণ, তাঁরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজা মহেন্দ্র একাধিক তুষ্টলোকের পাল্লায় পড়িয়াছেন এবং নেপালকে এই তুষ্ট গ্রহের কবল হইতে উদ্ধার করা দরকার। কারণ,আভ্যন্তরীণ শাসনে যদি গণতন্ত্র ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত না হয়, তবে, পার্টি হিসাবে কমিউনিষ্টদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। বর্তমান রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে নেপালের সচেতন জনগণের মধ্যে যে বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, তার রাজনৈতিক গুরুত্বকেও নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না এবং অস্বীকার করিলে কমিউনিষ্ট পার্টির মূল্যও থাকে না। স্নতরাং নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি এক্ষণে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৈরালার নেপালী জাতীয় কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এভাবে নেপালের

অভ্যন্তরের একটি নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিণামে এক ভয়ানক রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটিবে কিম্বা রাজা মহেন্দ্র দুষ্ট রাহুমুক্ত হইয়া পুনরায় শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের পথ ধরিবেন, তাহা বলা শক্ত। তবে, একথা সত্য যে, নেপালের অবস্থা ভয়াবহ।

কিন্তু ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নেপাল হইতে ক্রমাগত কেন কুৎসাপূর্ণ প্রচার কার্য চলিতেছে? কেন এই মিথ্যা চালানো হইতেছে যে, ভারতবর্ষ নেপালকে গ্রাস করিতে চাহে, নেপালের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে নেপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও হামলা সংগঠিত হইতেছে, ভারতবর্ষ নেপাল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিতেছে, বিদ্রোহীদিগকে ভারত অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতেছে এবং ভারতের ইচ্ছামত শাসন নেপালের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিতেছে?—এই ধরণের অজস্র মিথ্যা প্রচার করিয়া ভারত ও নেপালের সম্পর্ক একেবারে বিষাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। এমন কি, চীন-ভারত ও পাকিস্থান-ভারত বিরোধের সুযোগ নিয়া নেপালের একদল রাজনীতিক চীন ও পাকিস্থানকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার আসল রহস্য কি? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, নেপালের রাণাশাহী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক ছিল ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসন। সুতরাং ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদ ঘটিলে উহার গতিপথে নেপালেও প্রতি-ক্রিয়াশীলতার অবসান ঘটিবে এবং নূতন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আসিবে। কারণ, নেপাল ও ভারতের সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল হইতেই অচ্ছেদ্য। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৫০-৫১ সালে নেপালেও রাজা ত্রিভূবন ও প্রজাপুঞ্জ রাণাশাহীর কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং ভারতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত একত্রে নেপালেও নূতন পার্লামেণ্টারি শাসনের দাবী দেখা দেয়। রাজা ত্রিভূবন বিচক্ষণতার সহিত সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিভূবনের অকালমৃত্যু ঘটিল এবং যুবক রাজা মহেন্দ্রও গোড়ার দিকে সুস্থনীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠী রাজনীতি, উপদলীয় কলহ এবং কৈরালা মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত একশ্রেণীর নেতা (যাঁদের মধ্যে ডাঃ তুলসী গিরি প্রধান) ক্ষমতা লাভের আশায় এই মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিলেন। তাঁরা দেখিলেন যে, গণতন্ত্রবাদী ভারতবর্ষের সঙ্গে নেপালের মৈত্রী যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে, কৈরালা মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো সহজ হইবে না। সুতরাং ভারত-নেপাল মৈত্রী বিনষ্ট করিবার জন্য এঁরা পরিকল্পনা-পূর্বক অগ্রসর হইলেন এবং ভারতের সদিচ্ছা, আর্থিক ও টেকনিক্যাল সাহায্য

(যার পরিমাণ আদৌ সামান্য নহে) ইত্যাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া অনবরত এই প্রচার কার্য করিতেছেন যে, ভারতবর্ষ নেপালকে গ্রাস করিতে চাহে। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ফলে, রাজা মহেন্দ্রকে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬২, নয়া-দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিতে হইয়াছিল। সরকারী পর্যায়ে ও উচ্চপর্যায়ে এই সাক্ষাৎ ও আলোচনা চলিয়াছিল পাঁচদিন ধরিয়া। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র যেন কতকটা অনিচ্ছায় এবং বাধ্য হইয়াই নয়াদিল্লীতে আসিয়াছিলেন। কারণ, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, রাজা মহেন্দ্রের দিল্লীতে আসিবার পূর্ব মুহূর্তে কাঠমাণ্ডু হইতে "মন্ত্রিসভার" পক্ষ হইতে নাম দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক অভিযোগপত্র ও কুৎসাপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। এমন কি, এই অভিযোগপত্র নয়াদিল্লীতে পর্যন্ত বিতরিত হয়। দুই দেশের মধ্যে উচ্চতম পর্যায়ে আলোচনার ঠিক সন্ধিক্ষণে এমন কার্য যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কত গভীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার প্রভূত সংযম ও স্থিরবুদ্ধির সঙ্গে রাজা মহেন্দ্রের প্রতি অতি সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সৌজন্যপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা ভারত সরকার নেপাল সম্পর্কে তাঁদের সুস্থনীতির কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। নেপালের সার্বভৌম স্বাধীনতার প্রতি নিশ্চয়ই মর্যাদা দেখানো হইবে এবং ভারতের পক্ষ হইতে নেপালের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না। নেপালের বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটে, তবে, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ইহাতে উস্কানি দিবে না এবং অস্ত্রও সরবরাহ করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে নেপালের পলাতক রাজনৈতিক নেতারা অবশ্যই আশ্রয় পাইতে পারেন (ইহা আন্তর্জাতিক আইনসম্মত) এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও করিতে পারেন—এই অধিকার অস্বীকার করা যায় না। যদিও লাসা-কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ সরকারী-ভাবে নেপালকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, তথাপি এই সড়ক সম্পর্কে ভারত-বর্ষের সন্দেহ থাকিয়াই যাইবে। যদিও এই সড়কের কোন সামরিক গুরুত্ব নাই বলিয়া রাজা মহেন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন এবং উহার একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থ-নৈতিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তথাপি একথা সত্য যে, চীন ও ভারতের বিরোধের মীমাংসা এবং তিব্বত সম্পর্কে নূতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত (যাহার সম্ভাবনা খুবই কম) লাসা-কাঠমাণ্ডু সড়ক ভারতের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে উপেক্ষণীয়

নহে। এমন কি, ভারত-নেপালের বাণিজ্যও এই সড়ক ধরিয়া তিব্বত পর্যন্ত চোরাই চালান ও চোরাকারবারের পথ খুলিয়া দিতে পারে। এই সমস্ত আপত্তি এবং আশঙ্কা সত্ত্বেও নেপালের প্রতি ভারতবর্ষ বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাবই পোষণ করে।

নয়াদিল্লীতে রাজা মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পাঁচদিন ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর যে যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে, উহার মধ্যে আশার বা নৈরাশ্যের কোন নূতন কথা নাই। অবশ্য আমরা এমন কথাও বলিতেছি না যে, এই সাক্ষাৎ নিতান্তই মামুলি বা মূল্যহীন। বরং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও আলোচনার দ্বারা রাজা মহেন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং হয়তো এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, নেপালের রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের যুগপৎ আত্মরক্ষা করিতে হইলে পাকিস্থান বা চীনের চেয়ে ভারতবর্ষের বন্ধুতাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং মূল্যবান। বর্তমান চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রতিবেশী নেপালের বন্ধুতা যে অপরিহার্য, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

এপ্রিল, ১৯৬২।

* *

*

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত নেপালের রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র উপরে দেওয়া হইল, তার কোন উন্নতিতো ঘটেই নাই, ববং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস হইতে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের জন্য সেই অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। নেপাল ও ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক অপরিহার্য, একথা স্মরণ করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫৯ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নেপালের প্রতিরক্ষা ও আমাদের প্রতিরক্ষা একই—'The defence of Nepalis is the defence of India,'' এবং নেপালের উপর আক্রমণ ভারতের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে নেপাল সরকার খুসী হইতে পারেন নাই। বরং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কৈরালা জবাব দিয়াছিলেন যে, নেপালের আত্মরক্ষা একমাত্র নেপাল সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চেন-ঈ যখন বলিলেন যে, নেপাল যদি কখনও বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে, চীনের জনগণ সর্ব্বদাই নেপালের পাশে দাঁড়াইবে, তখন কাঠমাণ্ডুতে রাজা মহেন্দ্রের পারিষদ-মহলে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। অথচ নেপালকে কেহই আক্রমণ করিতে

যাইতেছে না। সুতরাং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর গায়ে পড়িয়া এই বিবৃতি দেওয়ার অর্থ হইতেছে নেপালকে ভারতবর্ষ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন করা এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরও সন্দেহ সৃষ্টি করা। চীন প্রতিনিয়ত নেপাল, ভূটান ও পাকিস্থানের মন বিষাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি মতলববাজ রাজনীতিক ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা ও সম্পদ আহরণের চেষ্টায় আছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬২) রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নেপালের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীঋষিকেশ শাহা নয়াদিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রাপ্ত নেপালের নেতাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কারের জন্য শ্রীনেহরুর সম্মতি আদায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মবিরোধী এমন প্রস্তাব স্বভাবতঃই শ্রীনেহরু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে, শ্রীঋষিকেশ শাহা কাঠমাণ্ডুতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই রাজা কর্তৃক পদচ্যুত হন। ইহার পর দশহরা পর্ব উপলক্ষে রাজা মহেন্দ্র নেপালীদের উদ্দেশ্যে যে বাণী দেন, তা'তে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষ রাজা মহেন্দ্রের এই প্রকার 'রক্তচক্ষুতে' বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। এক্ষণে কাঠমাণ্ডুতে তুলসি গিরি ও অন্যান্য কুচক্রীদের অবাধ রাজত্ব চলিতেছে এবং গায়ে পড়িয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ ও অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হইতেছে। কিন্তু নেপালের অভ্যন্তরে প্রজাপুঞ্জের নিদারুণ অসন্তোষ, স্থানে স্থানে বিদ্রোহ, সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার চলিতেছে।

নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি, যাঁরা কৈরালা মন্ত্রিসভার আমলে নিষ্ক্রিয় ও অসহযোগী ছিলেন, এতদিনে তাঁদের মোহনিদ্রা ভাঙিয়াছে এবং রাজকীয় অত্যাচারে ও গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিতে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁরা এক্ষণে প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা চিন্তা করিতেছেন। নেপালের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীতুলসিলাল অমাত্য গত সেপ্টেম্বর (১৯৬২) মাসের এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন:

'Any opposition is ruthlessly suppressed as anti-national. King Mahendra has begun a reign of terror. Confiscation of property, emergency laws, imprisonment for indefinite period without any charge or trial, public flogging, drowning people in water, indiscriminate killing, cutting of one's hands, killing persons like goats and exhibiting the head of the

victim at the top of a bamboo pole (at Gulmi) and many other henious forms of oppression and torture are being practiced by king Mahendra to suppress people's opposition to his rule'.

(নিউ এজ, নয়াদিল্লী, ২৮-১০-৬২)

এই বিবৃতি অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, বীভৎস ও বর্বর মধ্যযুগীয় অত্যাচারের কবলে পড়িয়াছে নেপাল এবং এই নিষ্ঠুর রাজতন্ত্রের স্বার্থপর দালালেরা একদিকে চীনের সঙ্গে সখ্যতা ও অন্যদিকে ভারতবর্ষের সঙ্গে বৈরিতা সৃষ্টি করিয়া হিমালয় সীমানায় নতুন বিপদ্ ডাকিয়া আনিতেছে। আর কমিউনিষ্ট চীন এই নেপালকে 'রক্ষার' প্রতিশ্রুতি দিতেছে। রাজনীতি বিচিত্র শয্যাসঙ্গী ডাকিয়া আনে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘরের কাছে চীন-ভারত সংগ্রামের বিপদে নেপাল কি নিজকে সত্যই নিঃশঙ্ক মনে করে ?

অবশ্য নেপালের রাজা মহেন্দ্র শেষ পর্যন্ত এক বিবৃতি দ্বারা 'দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ে' 'বাছুর'রূপী নেপালের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছেন !

ষষ্ঠ অধ্যায়

এশিয়ার ভবিষ্যৎ

[চীন-ভারত সীমান্ত সংগ্রাম সুরু হইবার আগে এই অধ্যায় লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং আগেকার অবস্থা স্মরণে রাখিয়া ইহার বিচার করিতে হইবে। চীন-ভারত সংগ্রামের ফলে পরিবর্ত্তিত অবস্থা উপসংহারের অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।]

কিন্তু এশিয়া কি ? অর্থাৎ এশিয়া বলিতে আমরা কোন্ কোন্ দেশ বুঝিয়া থাকি ? সাধারণতঃ 'এশিয়া' বলিলে একজন ভারতবাসীর চোখে যে চিত্রটি ভাসিয়া উঠে, তার মধ্যে আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং জাপান, চীন, সিংহল, নেপাল, পকিস্থান, ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও ইরাণ। আমাদের মানসলোকের এই চিত্রটি অবশ্য আমরা গড়িয়া তুলি নাই, এই চিত্ররচনার মূল প্রেরণা আসিয়াছে সদ্য অতীত ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য-শাসন হইতে। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব গোলার্ধে বৃটেনের যে সুবিশাল জমিদারি ও উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে 'এশিয়া' বলিতে উপরোক্ত দেশগুলিকেই বুঝাইত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের ও প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। সুতরাং 'এশিয়া' বলিতে আমেরিকানরা বুঝিত চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং জাপান। আর্থাৎ ভৌগোলিক এশিয়া ও রাজনৈতিক এশিয়ার সামগ্রিক চেহারা এক ছিল না। কারণ, এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্র আরও বৃহৎ, আরও দূর বিস্তৃত। সোভিয়েট সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রসমূহ (একমাত্র মিশর বাদে)—এমন কি, তুরস্ক ও সাইপ্রাস দ্বীপ পর্যন্ত। কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ যে বিরাট ভূভাগে বাস করে, তার মধ্যে নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং ভাষা, ধর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও সামাজিক আচার আচরণ ইত্যাদির দিক হইতে এত অজস্র প্রকারের বৈষম্য ও বিভেদ রহিয়াছে যে, একজন আরবের সঙ্গে একজন জাপানীর কিংবা একজন সাইবেরিয়ানের সঙ্গে একজন ভারতবাসীর বিন্দুমাত্র মিল নাই—যদিও ইহারা সকলেই ভৌগোলিক এশিয়ার অন্তর্গত। সুতরাং 'এশিয়ান' বা 'এশীয়' বলিলে ভৌগোলিক দিক হইতে পরিচয়টা যত সহজে বুঝা যায়, অন্য দিক হইতে তত সহজ নহে। অথচ পৃথিবীর, সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম এবং প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশ

এশিয়া মহাদেশ হইতেই উদ্ভূত। তথাপি এশিয়ার মধ্যে জাতিগত বা রাষ্ট্রগতভাবে সেই ঐক্য কখনও আসে নাই, 'এশীয়' শব্দটি বলিলে যে ভৌগলিক ঐক্য আমরা অনুভব করি। সনাতন কাল হইতেই এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া বিরোধ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ইত্যাদি লাগিয়া ছিল। এই সেদিনও হাল আমলে জাপান পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে হাম্‌লা করিয়াছিল। সুতরাং মূলগতভাবে কোন 'এশীয় ঐক্য' গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই সমস্ত বৈষম্য ও বিরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা কবলিত যে এশিয়া মহাদেশ, তার অন্তরাত্মার মধ্যে, তার অনুভূতির মধ্যে একটি ঐক্যবোধ ছিল। সেই ঐক্যবোধ আসিয়াছিল একই সাম্রাজ্যবাদীয় শাসনের লাঞ্ছনা ও অসম্মান হইতে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ইউরোপীয় বনাম এশীয়—এই শব্দ দুইটির অর্থ একেবারে পরিষ্কার ছিল। যেমন, ১৯৫৪ সালের বান্দুং সম্মেলনে সর্ব্বপ্রথম এশিয়ার (এবং আফ্রিকারও) বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্যবোধ ও নৈকট্যবোধ দেখা গেল। কারণ, উহার মূল ভিত্তি ছিল উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা।

এখানে এশিয়া বলিতে আমরা দৈনন্দিন সংবাদপত্রের প্রচলিত ধারণাকেই (এবং যে ধারণার মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ বৃটেন ও আমেরিকা) বুঝাইতেছি। অর্থাৎ ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, চীন ও জাপান কিংবা ইহাদের কিছু কিছু প্রতিবেশী রাজ্য। কিন্তু সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়া এই আলোচ্য চিত্রের অন্তর্গত নহে।

এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একজন ইংরাজ পর্যবেক্ষক একটি বিখ্যাত বিলাতি সাপ্তাহিক পত্রে* গোড়াতেই এই বলিয়া তাঁর প্রবন্ধ সুরু করিয়াছেন :

'Two-thirds of world's population live on the Asian Continent east of the Persian Gulf. Only a small percentage of them have an income of over £25 a year. Their numbers are increasing at the rate of over two percent a year ; their food supplies by one per cent or less. These simple arithmetical facts indicate the magnitude of Asia's dilemma.'

অর্থাৎ পারস্য উপসাগরের পূর্ব্ব দিকে এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর জনসংখার দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে। এই বিরাট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রতম অংশের

* 'নিউ ষ্টেট্‌সম্যান,' ২৫শে মে, ১৯৬২—লেখক পল্‌ জন্‌সন্‌, বিষয়—"এশিয়ার আগামী দশক"।

মাত্র বার্ষিক আয় মাথা পিছু ২৫ পাউণ্ড কিংবা ৩৩০ টাকার বেশী। অথচ এই জনসংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাইতেছে শতকরা দুয়ের বেশী হারে। অপর দিকে খাদ্যের উৎপাদন হইতেছে শতকরা এক, কিংবা এক ভাগেরও কম হারে। সুতরাং একমাত্র এই সহজ গাণিতিক তথ্যের দ্বারাই এশিয়ার সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F. A. O.) ডিরেক্টার-জেনারেল শ্রীবি, আর, সেন এক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, মানুষের লিখিত ইতিহাসের সময়কালের মধ্যে আজিকার মত পৃথিবীতে আর কখনও এত ক্ষুধার্ত্ত মানুষ দেখা যায় নাই। পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন হইতে ১৫ জন কিংবা ৩০ কোটি হইতে ৫০ কোটি মানুষ একেবারে উপবাসে আছে। আর পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কিংবা ১০০ কোটি হইতে ১৫০ কোটি পর্য্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগিতেছে। যে ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই শতকের শেষভাগে যদি বর্ত্তমানের অনটনের সীমানাও বজায় রাখিতে হয়, তা'হলেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে হইবে এবং বহু অনুন্নত অঞ্চলে এই উৎপাদন অন্ততঃ তিন গুণ বাড়াইতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলেও খাদ্যশস্য যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যাইবে না। বিশেষ-ভাবে এশিয়া মহাদেশের পক্ষে ইহা সত্য। সুতরাং সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর ও সঙ্কটজনক। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা স্মরণে রাখিলে এই সঙ্কটের চেহারা আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। কারণ, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যত লোক আছে, এই শতাব্দী শেষ হওয়ার সময় একমাত্র এশিয়া মহাদেশেই তত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ এশিয়াতে লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে তিন শত কোটিরও অনেক বেশী!

খাদ্যের উৎপাদন যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হারের মাত্র অর্ধেক হয়, তবে স্বভাবতঃই সঙ্কটের চেহারাটা তীব্র ও গভীর হইতে বাধ্য। তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, এশিয়ার বৃহত্তম দেশ মহাচীন কঠোর কমিউনিষ্ট শাসন এবং পরিকল্পনার পদ্ধতি সত্ত্বেও সম্প্রতি তিন বছর নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটে পড়িয়াছিল প্রধানতঃ একদিকে অনাবৃষ্টি ও অন্যদিকে প্লাবনের জন্য, আর এক-দিকে প্রত্যাশিত শস্য উৎপাদনের অভাবের জন্য। হংকংয়ে হাজার হাজার চীনার আশ্রয় প্রার্থনা এমন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া হংকংয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় উহাদিগকে সীমান্ত পার করিয়া দিয়াছেন এবং

চীনাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বাহির হইতে চীনে খাদ্যশস্যের অজস্র পার্শেল গিয়াছে। এই খাদ্যসঙ্কট কেবল চীনে নহে, ভারতবর্ষেও এই সঙ্কট এবং প্রতি বছর ভারতকে কয়েক লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিতে হয়। ইন্দোনেশিয়া এক কালে খাদ্যশস্যের বাড়তি দেশ (surplus area) ছিল, কিন্তু সেই ইন্দোনেশিয়াতে সব চেয়ে বেশী খাদ্য বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। ব্রহ্মদেশও 'পরাধীনতার যুগে' খাদ্যের প্রাচুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতার আমলে সেই সুখের দিন আর নাই। এমন কি জাপানকে পর্যন্ত বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। 'জাপানী প্রথায় ধানের চাষ' এই যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেও জাপান স্বাবলম্বী নহে। শ্রমশিল্পে যেমন, তেমনি কৃষিতেও জাপান এশিয়ার মধ্যে অগ্রগামী বটে, কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট নহে। জাপান সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ মাত্র এবং অনেকটা ইংলণ্ডের মত বাহিরের আমদানির উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু এশিয়ার প্রায় সর্বত্র উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্যের যে কেবল অভাব, তাই নয়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় দাম অন্ততঃ ৬-৭ গুণ (যেমন, ভারতবর্ষে, সিংহলে, ইন্দোনেশিয়ায় ইত্যাদিতে) বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল খাদ্যশস্যই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি অপরিহার্য বস্তুর দাম 'স্বাধীন এশিয়ায়' অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে যেমন কৃষিনির্ভর গ্রাম্য অর্থনীতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমশিল্পের অর্থনীতিও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে, মূল্যবৃদ্ধি শহরে ও মফঃস্বলে প্রায় সমান। বরং কোন কোন বস্তু গ্রাম্য অঞ্চলে অধিকতর ব্যয়বহুল। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়ার বহু দেশ দ্রুত উন্নতি লাভের আশায় আবার প্ল্যানিং বা পরিকল্পিত অর্থনীতির আশ্রয় লইয়াছে, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ছাড়া এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই এই দারিদ্র্য ও রিক্ততার চেহারা উদ্বেগজনক।

অধ্যাপক রঘুবীর চক্রবর্তী এশিয়া সম্পর্কে 'যুগান্তরে' (১৫. ১০. ৬২.) একটি সুলিখিত প্রবন্ধে কতকগুলি মূল্যবান সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাতত্ত্ব স্মরণে রাখিলেই এশিয়ার সামগ্রিক অবস্থা মোটামুটি বুঝা যাইবে ঃ—

"অনগ্রসর কৃষি-ব্যবস্থার জন্যই আজও এশিয়ার অধিকাংশ মানুষ অনাহারে ও অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই ৫ কোটি মানুষ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসেব, পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত। যেখানে প্রত্যেকটি এশিয়াবাসীর অন্ততঃ

২৫০০ পরিমাণ ক্যালোরী শক্তিযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন সেখানে ভারতবাসী পায় মাত্র ১৭৫০, সিংহলবাসী ১৯০০ এবং জাপানীরা ২১০০। ১৯৫৯ সালে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রতিদিন ৯৩ গ্রাম প্রোটিন পুষ্টি পেয়েছে সেখানে ভারতবাসীরা ও সিংহলবাসীরা পেয়েছে যথাক্রমে ৫১ ও ৪৬ গ্রাম। এশিয়া-বাসীদের ভগ্নস্বাস্থ্য ও ব্যাধিপ্রবণতা ও সীমিত আয়ুর আসল কারণ এখানেই পাওয়া যাবে। এখানকার শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার ও উৎপাদক ক্ষমতার অভাব এবং অর্থনৈতিক প্রগতির অন্তরায়ের কারণও এখানে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি দেশের অধিবাসী আজ জীবনের সর্বনিম্ন মান থেকে বঞ্চিত। সুতরাং এশিয়ার রাজনীতিতে খাদ্য উৎপাদনের প্রভাব খুব সহজেই বুঝা যায়। যে ধরণের সরকার খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা যত শীঘ্র সমাধান করতে পারবে সেই ধরণের সরকারের সাফল্য ও প্রসার অব্যাহত হতে বাধ্য।

"সমগ্র এশিয়া (জাপান বাদে) অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রত্যেকটি দেশ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আবদ্ধ। মহাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সমগ্র পুরুষ শ্রমশক্তির ভারতবর্ষে শতকরা ৭৪ ভাগ ও শ্যামদেশে ৮৪ ভাগ এই কাজে নিযুক্ত। এমন কি জাপানের মত দেশেও এক-তৃতীয়াংশের বেশী পুরুষ ও ৫০ ভাগ নারী-শ্রমিক কৃষিজীবী। সেখানে এই কাজে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১৫ ভাগ, বেলজিয়ামে ১৪ ভাগ, ফ্রান্সে ২৮ ভাগ ও সুইডেনে ২৫ ভাগ লোক নিযুক্ত। এশিয়ার সমগ্র জন-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৭-৫৯ সালের মধ্যে সমগ্র জাতীয় উৎপাদনে শিল্প থেকে শতকরা ১০ ভাগের কম পাওয়া যায় কাম্বোডিয়া, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ায়, ১০ থেকে ২০ ভাগ পাওয়া যায় বর্মা, ফরমোসা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও শ্যামদেশ। একমাত্র নতুন চীন ও জাপানে শিল্পের অবদান শতকরা ২০ ভাগ অতিক্রম করে। একমাত্র জাপান ছাড়া প্রত্যেকটি দেশ শুধু মাত্র প্রাথমিক দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ করে ও খাদ্যশস্যের সাথে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করা হয় এবং জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে চাষীদের আবুহাওয়ার উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হয়। সম্প্রতি অনাবৃষ্টি চীন ও বর্মায় খাদ্য শস্য উৎপাদন ব্যহত করেছে। আকাশের উপর এই পরিমাণ নির্ভরশীলতাই এশিয়াবাসীর কাছে ভাগ্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। যাই হোক, এশিয়ার

রাজনীতি আবহাওয়া এবং কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। জমির সমস্যা, কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের মতামত এই রাজনীতির মূল সংগঠক।

"একমাত্র জাপান ছাড়া শিক্ষা সমস্যা প্রত্যেকটি দেশের অন্যতম সমস্যা। ইউনেস্কোর একটি হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর যত ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ২৩.৫ ভাগ আমেরিকায়, ১৫.৫ ভাগ ইউরোপে, ১৩.১ ভাগ দক্ষিণ আমেরিকায় এবং মাত্র ১০.৩ ভাগ এশিয়ায় আছে। এই সংস্থার পক্ষ থেকে মিঃ ফ্রেডিয়ার মধ্যপ্রাচ্য ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ ছাড়া এশিয়ার ১৫টি রাষ্ট্রে শিক্ষা সমস্যা অনুসন্ধান করে বলেছেন যে, এখানে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু অন্ধকারের কবলে পড়ে আছে। শতকরা ৫০ ভাগ শিশুর শিক্ষার সম্ভাবনা নেই; আফগানিস্থান, লাওস ও নেপালে এই সংখ্যা শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। একমাত্র জাপানে সার্বিক শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অর্ধ শতাব্দীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফিলিপাইনে বর্তমানে শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৫ জন। ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব অনুসারে সিংহল, ফরমোসা, মালয়, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে ১৮ থেকে ২৫ ভাগ লোক (সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে) স্কুলে যাচ্ছে। সেখানে বর্মা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্থানে স্কুলযাত্রী হচ্ছে সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ। সরকারী কাজে ও শিক্ষিত পেশায় নিযুক্ত জনসাধারণের সংখ্যা যেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২৯ ভাগ (১৯৫০), বৃটেনে ১৯ ভাগ (১৯৫৯) ও জাপানে ১৫ ভাগ (১৯৫০) সেখানে ভারতবর্ষে মাত্র ২ ভাগ (১৯৫১)। এশিয়ায় শিক্ষার ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের অভাব জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে…।"

সুতরাং এশিয়ায় সমাজ-জীবনের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের মূল উৎস এখানে —দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে অনগ্রসরতা। আধুনিক পশ্চিমী জীবনযাত্রার বিবেচনায় এশিয়ার অনগ্রসরতা সর্বব্যাপক। নিঃসন্দেহে ইহার মূল কারণ গত দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং এশিয়ার নিজস্ব সৃজনশীল শক্তির নিষ্ক্রিয়তা। ধর্মের বিকৃতি, লোকাচার, জাতি, শ্রেণী ও বর্ণভেদের বৈষম্য, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং অন্ধবিশ্বাস ও রক্ষণশীলতা যুগের পর যুগ ধরিয়া এশিয়ার জনসমাজের এক সুবৃহৎ অংশকে এবং উহার চরিত্র, শক্তি ও মেরুদণ্ডকে খর্ব ও কলুষিত করিয়াছে। যেখানে মানুষের সৃজনশীল শক্তি অবরুদ্ধ, সেখানে সমাজজীবনও গতিশীল হইতে

পারে না। এই মানসিক জড়তার অন্যতম কারণ ছিল আধুনিক শিক্ষা এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব। গত তিন চারি শত বছর ধরিয়া ইউরোপে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আবিষ্কার ও নব নব অভিযানের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে এশিয়া পিছনে পড়িতে স্বরু করিয়াছে। আধুনিক কালে একমাত্র জাপান ছাড়া এশিয়ার আর কোথাও উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, কারিগরি ও যন্ত্রবিদ্যার প্রসার এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে হাতেকলমে পাঞ্জা লড়িবার মত দুঃসাহস দেখা যায় নাই। জাপানের পর চীনে কিছু কিছু শক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ক্রমাগত বৈদেশিক ও গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত ও লণ্ডভণ্ড সমাজজীবনের দ্বারা চীন বার বার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই দুঃসহ অবস্থা হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্যই চীন শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবের পথ এবং মার্ক্সীয় সমাজ ও জীবনদর্শন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহা আবার নতুন বিপত্তি ঘটাইয়াছে।

এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিকাংশ চিন্তাশীল পর্য্যবেক্ষক একমত যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনটি দেশ এই মহাদেশের ভাগ্য নির্ণয় করিবে। এই তিনটি দেশ হইতেছে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান। ইহার মধ্যে প্রথমটি মিশ্র-অর্থনীতির (Mixed Economy), অর্দ্ধ-সমাজতন্ত্র ও অর্দ্ধ-বুর্জোয়াতন্ত্রের এক বিচিত্র মিলন এবং পশ্চিমী পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতির ইহা অনুরক্ত। দ্বিতীয়টি পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক ; সাম্যবাদী কিম্বা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র, যেখানে পার্টির ডিক্টেটরশিপ এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বাত্মক রূপ প্রতিষ্ঠিত। আর তৃতীয়টি হইতেছে পুরাপুরি ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র, যেখানে রাজা আছেন, আর আছেন প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর বংশধরগণ এবং শক্তিশালী ধনিক ও বণিক গোষ্ঠী, যাঁরা রাজনীতির চেয়ে বাণিজ্যনীতি ও রণনীতিই ভালো বুঝেন !

এশিয়া মহাদেশের এই তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের তিন প্রকার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেহারার মধ্যে কোন্‌টা শেষ পর্য্যন্ত অপর সকলকে ছাপাইয়া উঠিবে এবং এশিয়ার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তৃত করিবে, আগামী দিনের ইতিহাসের পক্ষে নিশ্চয়ই তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন প্রকার রাষ্ট্র আবার তিন প্রকার ভাবধারাকে বহন করিতেছে বৃহত্তর পৃথিবীতে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। যথা—(১) জাতীয়তা ও জোট নিরপেক্ষতা (২) পশ্চিমী শক্তির বিরোধিতা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপ্রবণতা এবং (৩) পশ্চিমী শক্তির সহিত সহযোগিতা ও সাম্যবাদের বিরোধিতা।

একথা সত্য যে, মহাযুদ্ধের আবর্ত্তে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক বিরোধিতার আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীন এশিয়ার জন্মলাভ এক ধরণের বিপ্লব ঘটাইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারতীয় বিপ্লবের কথা শুনি। কিন্তু যে অর্থে তাঁরা ভারতীয় বিপ্লব নিয়া গর্ব্ব বোধ করেন, সেই অর্থে ইহা নতুন এশীয় বিপ্লবও বটে। কিন্তু এই বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকৃত ও সীমাবদ্ধ। বিকৃত এজন্য যে, বৈপ্লবিক আদর্শের নির্ম্মল, সুস্থ ও সুন্দর রূপ কোথাও বাস্তবে বিকশিত হইতে পারে নাই এবং সীমাবদ্ধ এজন্য যে, একমাত্র শিক্ষিত বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ছাড়া এই বিপ্লব সমাজের অন্য কোন স্তরে কল্যাণের শক্তি নিয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই—যদিও আলোড়ন ও বিক্ষোভ আনিয়াছে যথেষ্ট। তথাপি, একথা সত্য যে, এই বিপ্লব এশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে জিজ্ঞাসা ও সংশয় জাগাইয়াছে এবং 'অদৃষ্টের বন্ধন'কে অস্বীকার করিয়া জনগণ অর্থনৈতিক বন্ধনের কারণ সম্পর্কে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে সত্যসত্যই একটি পুরাপুরি বিপ্লব ঘটিতে পারিত। 'ভারত-পথিক' রামমোহন রায়ের নবযুগ সৃষ্টির চেষ্টার কাল হইতে ১৯৪২ সালের আগষ্ট-বিদ্রোহ কিংবা ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের সমাবেশ এবং যুবজনচিত্তে বিস্ফোরক শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা পরিপূর্ণ বিপ্লবের রূপ ধরিতে পারিত। কিন্তু ইতিহাসের দুইটি প্রধান ব্যক্তি তাঁদের 'অপরাজেয় নেতৃত্বের' দ্বারা ইহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম ব্যক্তি হইতেছেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রথম ব্যক্তি ১৯৪৬ সালের ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় 'ভায়োলেন্সের' বা হিংসার গন্ধ পাইলেন এবং পার্টিশানের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইবে জানিয়াও 'জনগণের 'প্রাণের রাজা' তাহা রোধ করিলেন না (অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি পার্টিশানের বিরোধী ছিলেন) এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ঘোরতর মুস্লিম প্রতিক্রিয়াশীলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। আর বৃটিশ শক্তির সঙ্গে আপোষ-রফা পূর্ব্বক একটি নতুন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্থানের জন্ম দিলেন। এদিকে খণ্ডিত ভারতের 'প্রাণের রাজা' শ্রীজওহরলাল নেহরু জনগণের সঙ্গে মার্চ্চ না করিয়া এবং পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া ভারতের উচ্চতর বুর্জ্জোয়া শ্রেণী ও নূতন ধনিককূলের সঙ্গে আপোষরফা করিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' আদর্শের কথাও প্রচারিত হইল।

গান্ধীনেতৃত্ব ও নেহরুনেতৃত্ব ভারতবর্ষকে পূর্ণতর বিপ্লবের পথ হইতে সরাইয়া দিয়াছে—রক্তপাত, অশ্রু, এমন কি প্রয়োজনমত সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ভিতর দিয়া জনগণকে পুনর্জন্ম লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ধর্ম্মবাতিকতা ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীএবং জিন্নার প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অ-মানবিক মনোভাব হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের পক্ষেই বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছে। ইহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ আজ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান, কেহই আপন মেরুদণ্ডের শক্তিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।)

অবশ্য পাকিস্থান পশ্চিমী পক্ষ, আর ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ। কিন্তু একজনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং অন্যজনের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। পাঁচশালা প্ল্যানিংয়ের মারফৎ ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনের জন্য যত কোটি কোটি টাকাই (স্বদেশের ও বিদেশের) ঢালা হউক না কেন, আমলাতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতির জটিলতার দ্বারা উহা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লাগানো যাইতেছে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় আয় বণ্টন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আয়কর-দাতাদের বিবরণ বিশ্লেষণের পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, ভারতের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একভাগ লোক বে-সরকারী যৌথ লগ্নীর শতকরা ৭৫ ভাগের মালিক। এই শ্রেণীর মধ্যেও সম্পদের মালিকানায় বিরাট প্রভেদ রহিয়াছে। কমিটির মতে এই ৪৫ কোটি লোকের দেশে মাত্র ১৪ হাজার পরিবার (houses) বে-সরকারী লগ্নী কারবারের অর্দ্ধেকেরও বেশী দখল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ বিত্তবান "প্রিভিলেজড্" শ্রেণী। ইহাদের মধ্যেও মাত্র ১ শতাংশ দেশের সম্পদের মোটা অংশ করায়ত্ত রাখিয়াছে। (স্টেটস্‌ম্যান ২৪ অক্টোবর, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য)।

তারপর পরিকল্পনা কমিশনের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় পরিবারসমূহের শতকরা ৬০ ভাগের মাসিক আয় একশত টাকা অপেক্ষাও কম। পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে সমীক্ষা চালাইলেন, তাতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু সংখ্যক পরিবারের আয় মাসিক বিশ টাকার মতো। উপজাতীয় অথবা ভূমিহীন চাষীরাই বিশেষভাবে এই পর্যায়ে পড়ে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীমন নারায়ণ বলিয়াছেন যে, সকল পরিবারের মাসিক আয় কমপক্ষে একশত টাকা করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এজন্য আরও পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

প্রয়োজন হইতে পারে, অর্থাৎ আরও পঁচিশ বৎসর লাগিতে পারে। শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব প্রভৃতির মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, গত কয়েক বছর স্বাধীন ভারতবর্ষে ধনীরা আরও ধনী এবং গরীবেরা আরও গরীব হইয়াছে। আর কংগ্রেস ক্রমশঃ ধনিকদের কবলে গিয়া পড়িতেছে। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যাপক দুর্নীতি, অপশাসন, শোষণ ও আদর্শের গোঁজামিলের দ্বারা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবন বিষদুষ্ট। ইহার সঙ্গে জুটিয়াছে কাশ্মীর ও পাকিস্থানের বিরোধ এবং চীন কর্তৃক হিমালয় সীমান্তের যুদ্ধ।

পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে এই দুই বৃহৎ বিরোধের দ্বারা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবনে প্রচুর আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির উপর আঘাত পড়িয়াছে। ১৯৬২ সালের 'এশিয়ান গেমস' উপলক্ষে জাকার্তায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশীয়দের তীব্র বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, আন্দোলন এবং অসভ্য ও অসৎ আচরণ (সেপ্টেম্বর মাসে) ইহার অন্যতম প্রমাণ। যদিও ইন্দোনেশীয়দের এই আচরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অন্যায় হইয়াছিল, তথাপি 'বন্ধু স্থকর্ণের' দেশ যখন 'অকৃত্রিম সুহৃদ নেহরু'র দেশের বিরুদ্ধে হঠাৎ এমন ক্ষেপিয়া যাইতে পারে, তখন বুঝিতে হইবে ভারতীয় পরারাষ্ট্রনীতির পরিচালনার ভিতর প্রচুর গলদ ঢুকিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও গভীর ছিল, যেমন ছিল চীন ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে। কিন্তু ইদানীং এই সম্পর্কের স্রোত ভাঁটার টানে নামিয়া গিয়াছে।*

ভারতবর্ষের বৈদেশিক সম্পর্কের এই অবস্থার সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ উদ্বেগজনক মনে হইবে। ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অভাব, ভাষাগত অতি তীব্র ও তিক্ত মতভেদ, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিক মনোভাবের বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় শাসনে ও পরিচালনে 'হিন্দীওয়ালা'দের একাধিপত্য, আসাম, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব, সরকারী চাকুরিতে

* ইন্দোনেশিয়ার এই আকস্মিক ক্রোধের কারণ ছিল এই যে, মিঃ সোন্ধি নামে 'এশিয়ান গেমস্'-এর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে, ফরমোজা ও ইস্রায়েলকে বাদ দিয়া 'এশিয়ান গেমসে'-র ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আর যদি ফরমোজা ও ইস্রায়েলকে বাদ দেওয়া হয়, তবে 'এশিয়ানগেমস্'-এর নামও বদলাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু মিঃ সোন্ধির উক্তি বা কার্যকলাপের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনই যোগ ছিল না। এমন কি, এশিয়ান গেমস্'-এর সঙ্গেও ভারত গভর্ণমেন্টের কোন সরকারী সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিস্ময়কর। —লেখক।

পক্ষপাতিত্ব, উচ্চ শিক্ষার মানের অবনতি ও শিক্ষার অনগ্রসরতা (এখনও ভারতবর্ষে শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর), অপরিসীম আর্থিক বৈষম্য ও সম্পদ শোষণ, (যেমন বাংলা দেশে অ-বাঙালী কর্তৃক একচেটিয়া আর্থিক দখল) বেকার ও জীবিকার সমস্যা, বাসস্থানের অপ্রাচুর্য, জমির ও ভূমির বণ্টন সমস্যা, উৎপাদন ব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির চাপ, ট্রান্সপোর্ট বা যানবাহনের অভাব, শহুরে জনতার অসম্ভব বৃদ্ধি, গুণ্ডামী, অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডের বৃদ্ধি (১৯৬১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ বছর ভারতবর্ষে খুনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ১১ হাজার। উহার আগে ভারতবর্ষে বার্ষিক খুনের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার।) এবং যৌন দুর্নীতি ও ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি। ভারতীয় সমাজ-জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত যে আভ্যন্তরীণ রেখাচিত্রের মর্ম্ম এখানে দেওয়া গেল, ইহা অবশ্য একমাত্র ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। এশিয়ার নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত অধিকাংশ দেশেরই চেহারা মোটামুটি এক ধরণের।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে যেমন পূর্ণতর বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহা নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গিয়াছে অদূরদর্শী নেতৃত্ব ও ইংরাজদের কারসাজির জন্য (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তানের উদ্ভব ও কাশ্মীর সৃষ্টির মূলে ইংরাজ লাট-বেলাট ও অফিসারদের গোপন হাত ছিল) তেমনি এশিয়া মহাদেশের উন্নতির একটি সম্ভাবনা ও সুযোগের ক্ষেত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের জন্য। ১৯৫৪ সালে তিব্বত উপলক্ষে চীন ও ভারত কর্তৃক পঞ্চশীলের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর এশিয়ার আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল এবং তার সঙ্গে বান্দুং সম্মেলন (১৯৫৫) একত্র হইয়া এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে নতুন আশায় ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্তই ইদানীং নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের বিদ্রোহ এবং চীন কর্তৃক সেই বিদ্রোহ দমন ও তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তারপর সীমানা লইয়া একে একে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সঙ্গে বিরোধ, আর চীনা নাগরিকদের প্রশ্নে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ঝগড়া—এই সমস্ত ঘটনায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন চীনের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘটিয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে নয়া চীনের অগ্রগতিও মন্দীভূত হইয়াছে—'The Great Leap Forward' বা 'সম্মুখের দিকে উল্লম্ফন' (?) বা উৎপাদনের বিদ্যুৎ গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কৃষির উৎপাদনের

বিস্ময়ের কথা আর শুনা যায় না এবং 'Village Commune'এর হাঁকডাকও বন্ধ। চৈনিক বিপ্লবের উন্নতি ও অগ্রগতির যে বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কার্য চলিতেছিল, ভারতবর্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে বটেই, অধিকন্তু চীনের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে সীমানা লইয়া অনাবশ্যক সংঘর্ষ এবং পঞ্চশীলের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটানো, আর চীনের আভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবনের অনুজ্জ্বল চিত্র। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা (বর্তমানে ৭১ কোটি) ও সেই অনুপাতে কৃষি ও শ্রমশিল্পের উৎপাদনের অনুপযুক্ততা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মতাদর্শগত বিরোধ চৈনিক বিপ্লবের প্রতি এশিয়ার উৎসাহ ও ঔৎসুক্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

জাপানের দৃষ্টান্ত বাহ্যতঃ উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংস হইতে জাপান যেভাবে সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের ও গ্রাম্যজীবনের যে বিস্ময়কর পুনর্জন্ম ঘটিয়াছে, এশিয়াতে তাহা অত্যন্ত চমকপ্রদ, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, কমিউনিষ্ট চীনের প্লাবন হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে রক্ষা করিবার জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে অপরিমিত সাহায্য দিয়া তার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিয়াছে—যেমন করা হইয়াছে পশ্চিম জার্মানীকে। বিশেষতঃ কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকায় জাপানকে আমেরিকার প্রধান সামরিক শিবিররূপে দাঁড় করাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জাপানের উপরের তলায় যতটা আর্থিক জৌলুষ আসিয়াছে, তার নীচু তলা সেই পরিমাণে স্বচ্ছল নহে। সেখানে দারিদ্র্য আছে, বেকারিও আছে। এই আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য জাপানে আজও গভীর এবং যুদ্ধের পূর্বেকার 'জাইবাৎসু' গোষ্ঠী নতুন আকারে ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনিক পরিবার জাপানের সমগ্র অর্থ-নৈতিক জীবনের উপর পুনরায় একাধিপত্য খাটাইতেছে। এই লক্ষণটা ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। বিশেষতঃ তার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে যদি সমতা না থাকে, তবে জাপানের এই বাহ্যিক ঐশ্বর্য আগামীদিনে উজ্জ্বল থাকিবে কিনা, সন্দেহজনক। কারণ, বৃটেনের মত জাপানকেও তার প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের তিন-চতুর্থাংশ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়, এমন কি খাদ্য পর্যন্ত (মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাপানের প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ খাদ্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু এখন ৪০ ভাগ পর্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।) কিন্তু আমদানি বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। সুতরাং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির দ্বারাই এই বৈদেশিক মুদ্রাঅর্জন

করিতে হইবে। এখানেই পৃথিবীর অন্যান্য শিরোন্নত রাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সংঘাতের সম্ভাবনা আছে। যদিও জাপানের রপ্তানি বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যায় এশিয়াতে, এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকা এবং এক-পঞ্চমাংশ ইউরোপে, তথাপি একদিকে ইউরোপীয় কমন মার্কেট সৃষ্টি এবং অন্য দিকে সোসিয়েলিষ্ট শিবিরের (চীন ও রাশিয়ার) সুবৃহৎ বাজার হইতে জাপানের বিচ্ছিন্নতা জাপানী বাণিজ্যের ও সম্পদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করিয়া রাখিতেছে। এশিয়া এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কমিউনিষ্ট চীনের উৎপন্ন দ্রব্য জাপানী পণ্যের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জাপানের রাজনীতি পুরাপুরি দক্ষিণপন্থী এবং সরকারী পার্টি জাপ্‌ পার্লামেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য ভোগ করিতেছে। অবশ্য ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে জাপানী সরকারের যথেষ্ট বিরোধীতা আছে। কিন্তু সেই বিরোধিতা আমাদের দেশের কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী দলগুলির মত দুর্বল। অপর পক্ষে জাপানে মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ফ্যাসিষ্ট সঙ্ঘগুলি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং ইহাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ হইবে। এই উগ্র দক্ষিণপন্থীরা সম্রাটকে ঈশ্বর এবং জাপানকে এশিয়ার অধীশ্বর বলিয়া মনে করে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডই ইহাদের মতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সব চেয়ে বড় উপায়। গত ত্রিশ দশকে এমন প্রচুর হত্যাকাণ্ড জাপানে ঘটিয়া গিয়াছে এবং মাত্র দুই বছর আগে, ১৯৬০ সালে ১৭ বছরের এক জাপানী যুবক প্রকাশ্য জনসভায় জাপানের সোসিয়েলিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেলকে ছোরা মারিয়া খুন করিয়াছিল। অতীতে ফ্যাসিষ্ট জাপান সাম্রাজ্যবাদ ও রণনীতির হাত ধরিযা এশিয়াখণ্ডে প্রচুর বিভ্রাট বাধাইয়াছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ এশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে আধুনিক জাপান সহায়ক কিংবা প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিবে, তাহা বলা কঠিন।

এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, সিংহল, নেপাল, ফিলিপাইন, ভিয়েৎনাম বা কোরিয়া ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশ। সুতরাং এই দেশগুলি যদি ভবিশ্যতে শক্তিশালীও হয়, তথাপি এশিয়া মহাদেশের ভাগ্য নির্ণয়ের মত প্রভাব কখনও বিস্তার করিতে পারিবে না। কিন্তু চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের পর দুইটি বৃহত্তম মুস্লিম রাষ্ট্র পাকিস্থান (আয়তন ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ৯ কোটি) ও ইন্দোনেশিয়া (আয়তন ৭,৩৫,৮৬৫ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১০ কোটি) নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাকিস্থান চারি বছর ধরিয়া ফিল্ড-মার্শাল আয়ুব খাঁর মিলিটারি শাসনে থাকিবার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' মৌলিক

প্রহসন দেখাইতেছে। আর ইন্দোনেশিয়াও হালে পাণি না পাইয়া 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' কেরামতি দেখাইতেছে। তবে, পাকিস্থানের মত ইন্দোনেশিয়া কোন সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই এবং কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী আন্দোলনকে দমন ও নিষিদ্ধ করে নাই। তবে, গোড়ার দিকে (১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর) ইন্দোনেশীয় কমিউনিষ্ট পার্টি স্থকর্ণের জাতীয়বাদী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই কমিউনিষ্ট পার্টিই প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণের সব চেয়ে বড় সমর্থক। (প্রকাশ যে, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্টগণ চীনেরও পক্ষপাতী এবং এশিয়ান গেমস্ উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে হট্টগোলের স্থষ্টি হইয়াছিল, তা'তে তাদেরও হাত ছিল।) গত কয়েক বছর ইন্দোনেশিয়া প্রভূত পরিমাণ সাহায্য পাইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ হইতে। এই সাহায্যের ফলে জাকার্তায় একটি বৃহত্তম ষ্টেডিয়াম এবং ৩০০ বেডের হাসপাতাল তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এমন কি, পশ্চিম ইরিয়ানের সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হইলেও এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইবে না। একদিকে যেমন বসন্ত কলেরার মত মহামারী রোগ, অন্যদিকে তেমনি কালোবাজারী ও মুনাফাশিকার। একটি ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও আর্থিক দিক হইতে ইন্দোনেশিয়া প্রায় দেউলিয়া হইবার জো হইয়াছিল। চাউলের দাম সরকারী নিয়ন্ত্রণ মূল্য অপেক্ষা জাকার্তায় ১০ বা ২০ গুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা রুপিয়ার সরকারী বিনিময় হার প্রতি পাউণ্ডে ১২৫ রুপিয়া বটে, কিন্তু কালোবাজারে উহার দাম ১ পাউণ্ডে ১ হাজার! মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনধারণের খরচ অসম্ভব রকমের বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাগজে-পত্রে ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের রূপ যেমন শক্তিশালী দেখা যায়, আসলে তাহা আদৌ নয়। এই শক্তি ছড়াইয়া আছে সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং টিন, রবার ইত্যাদি দেশের কাঁচামাল রপ্তানীর কাজ কারবারে পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসারদের কারসাজি রহিয়াছে। এখান হইতে কালোবাজারের মুনাফা তারা অর্জন করে। ইন্দোনেশিয়ার সমাজ-অভ্যন্তরে দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও যথেষ্ট। তারপর সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বাহক গোঁড়া মুস্লিম মাসজুমি পার্টিও কম উৎপাত ঘটায় নাই। প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণকে হত্যা করার জন্য বার বার চেষ্টা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে উহা প্রত্যেক বার ব্যর্থ হইয়াছে। অপর পক্ষে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি (পি কে আই) যথেষ্ট শক্তিশালী। উহার সদস্য সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশী, অর্থাৎ

কমিউনিষ্ট শিবিরের বাইরে এই সংখ্যাটি অন্যতম বৃহত্তম সংখ্যার পরিচায়ক। তারপর ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনও কম শক্তিশালী নহে এবং কোন কোন পর্য্যবেক্ষকের (আমেরিকান্) অভিমত এই যে, যদি ইন্দোনেশিয়ায় কোন বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে, এই সমস্ত সংগঠন কমিউনিষ্ট পার্টির দিকেই ঝুঁকিবে।*

পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের দেশে এত পরিচিত যে, উহার পুনরুল্লেখ প্রায় নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে কেবল হাজার মাইলের দীর্ঘ ব্যবধানই নয়, এই ব্যবধান ভাষায়, খাদ্যে, পোষাকে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও সামাজিক আচরণে। এক মাত্র 'মুস্লিম' শব্দটি ছাড়া আর কোন সাদৃশ্য দুই অংশের মধ্যে নাই। ইহার সঙ্গে দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যাপক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তো আছেই। পূর্ব পাকিস্থান পশ্চিমের উপনিবেশরূপে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। তারা স্বাতন্ত্র্য চায় এবং সত্যকার গণতন্ত্র চায়। এখানেই আয়ুবী গণতন্ত্রের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং পাকিস্থানে সংঘাত ও রক্তপাত ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কিন্তু এশিয়ার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় এবং সেই অধ্যায় হইতেছে এশিয়ার উপর সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রভাব, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘাত এবং জোট-নিরপেক্ষ কূটনীতির ভবিষ্যৎ।

একথা নিঃসন্দেহ যে, এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের পিছনে সোভিয়েট বিপ্লব প্রভূত প্রেরণা জোগাইয়াছে। কারণ, এই বিপ্লব সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও শোষণের কেবল বিরোধী নয়, এই বিপ্লব হাতেকলমে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। সোভিয়েট বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই স্বয়ং লেনিন হইতে শুরু করিয়া ইহার অন্যান্য অধিনায়কগণ চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন ও পদানত দেশের মুক্তির উপর জোর দিয়াছেন। গোড়া হইতেই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এশিয়া মহাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্র করিবার জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সোভিয়েট বিপ্লব বার বার ঔপনিবেশিক দেশগুলির নিকট আহ্বান জানাইয়াছে। এই বিপ্লবের সর্বাত্মক আবেদন এবং জীবন ও সমাজ গঠনের নতুন উদাত্ত বাণী বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের, তথা এশিয়া

* মার্কিন ত্রৈমাসিক 'Foreign Affairs', জুলাই, ১৯৬২।

মহাদেশের তরুণ বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদিগকে বিশেষভাবে গত ত্রিশ দশক হইতে প্রভূত প্রেরণা জোগাইয়াছে। ভারতবর্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রমাণ, যিনি অভিজাত বংশে জন্মলাভ করিয়াও এই বিপ্লবের অন্তর্নিহিত মানবিক ও সাংস্কৃতিক দিককে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তারপর সোভিয়েট বিপ্লবের প্রেরণায় নতুন সাহিত্য ও নতুন চিন্তা যেমন এশিয়ার সমাজমানসে দেখা দিয়াছে, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনও গড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি নহে, অন্যান্য বামপন্থীরাও মার্কসীয় মতবাদের প্রচারে ও প্রসারে সহায়তা করিতেছেন। এশিয়ার সমাজ-জীবনের একটা বৃহৎ অংশে এই বৈপ্লবিক আবহাওয়া ও চিন্তা নিঃসন্দেহে পশ্চিমীদের নিকট ভয়ের বস্তু। কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বৈপ্লবিক 'বিদ্যুৎ শক্তির' 'Power House'-এর মত। সুতরাং পশ্চিমীদের ক্রোধ, আক্রোশ ও বিদ্বেষ মস্কোর ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ও পরাধীনতার মূলোৎপাটন করিয়া যাঁরা এক নতুন সাম্যের সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন এবং সেজন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন-আমেরিকাকে উৎসাহ দেন, তাঁদের উপর পশ্চিমীরা খড়্গহস্ত হইবেন না কেন? এবং এশিয়ার অনেক বুদ্ধিজীবী যখন একথা স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে বার্লিনে হিটলারী শক্তির পতন না হইলে এত শীঘ্র এশিয়ার বন্ধনমুক্তি ঘটিত না, তখন পশ্চিমের শক্তিবর্গের পক্ষে এশিয়ার নবীন বুদ্ধিজীবিদিগকেও বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, এই বুদ্ধিজীবীগণ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কৌশলে ও 'মুক্ত দুনিয়ার' বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হইতেছেন না।

সুতরাং এশিয়াখণ্ডেও ঠাণ্ডা লড়াই স্বাভাবিক এবং কমিউনিষ্ট অগ্রগতির যে ভীতি হইতে ঠাণ্ডা লড়য়ের উৎপত্তি, সেই ভীতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে নয়াচীনের আত্মপ্রসারের জন্য। আগেকার জাতীয়তাবাদী চীনের মত বর্তমান কমিউনিষ্ট চীন আদৌ দুর্বল নহে, বরং যে-উপমহাদেশে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ বাস করে এবং যার অধুনাতম জনসংখ্যা ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ (ওয়াশিংটনের পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী), সেই দেশের সংহতি ও শক্তিসঞ্চয় নিঃসন্দেহে ভয়ের বস্তু বৈকি! এই ভীতির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট চীনের চারিদিকে 'এশিয়ার প্রাচীর' গড়িয়া তুলিতেছে কিম্বা তুলিয়াছে। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া যেমন জোট-নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অধিকতর নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে

এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশেষভাবে ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়াকে আর্থিক ও কারিগরি এবং অন্যান্য প্রকার সাহায্য দিতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য (ইরাণ, সৌদী আরব) হইতে সুরু করিয়া থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস, ফরমোজা, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান পর্যন্ত এক সামরিক বলয় সৃষ্টি করিয়া এগুলিকে 'আত্মরক্ষার ঘাঁটির' মত ব্যবহার করিতেছে এবং সমস্ত দেশে দরাজ হাতে টাকা ঢালিতেছে ও সামরিক সাহায্য দিতেছে। এশিয়ার যে সমস্ত দেশ ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট পতাকা-তলে আসিয়াছে সেগুলির সীমানা ছাড়াইয়া যাহাতে কমিউনিজম্ আরও অনুপ্রবেশ করিতে না পারে, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সতর্ক। এই সতর্কতা হইতেই 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যৌথ প্রতিরক্ষার চুক্তি' সংস্থা কিম্বা ইংরাজীতে যাকে South-East Asia Collective Defence Treaty Organisation কিম্বা সংক্ষেপে 'SEATO' (সীয়াটো) বলে, তার উৎপত্তি। ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে ৮টি রাষ্ট্র মিলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'যৌথ আত্মরক্ষা ও পারস্পরিক সাহায্যে'র জন্য যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহাই সংক্ষেপে 'সীয়াটো' নামে পরিচিত। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি হইতেছে অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই চুক্তি-স্বাক্ষরকারীদের সদর-দপ্তর ব্যাঙ্ককে প্রতিষ্ঠিত। যদিও 'সম্ভাব্য আক্রমণ' হইতে যৌথ আত্মরক্ষা ও পারস্পরিক সাহায্যদানের জন্য ৮টি রাষ্ট্র মিলিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন, তথাপি ইহার আসল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিস্তারে বাধা দান, কমিউনিষ্ট অন্তর্ঘাতি কার্যকলাপ নিরোধ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর কোন রাষ্ট্র যা'তে কমিউনিষ্টদের খপ্পরে না পড়িতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যেও অনুরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইযাছিল ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রথমতঃ তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে। পরে এই চুক্তির অংশীদার হন বৃটেন, পাকিস্তান ও ইরাণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার কোন কোন কমিটির পুরাপুরি সদস্য এবং ১৯৫৯ সালে তুরস্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আত্মরক্ষার চুক্তি হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকে বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার পর ইরাক বাগদাদ বা মধ্য প্রাচ্য চুক্তি সংস্থা হইতে সরিয়া পড়ে। তখন ১৯৫৯ সালের ২১শে আগষ্ট ইহার পরিবর্তিত নাম দাঁড়াইল Central Treaty Organisation কিম্বা সংক্ষেপে

CENTO বা বাঙ্গলায় সেণ্টো। পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সর্বত্র সম্ভাব্য কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন সশস্ত্র প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এজন্য এশিয়ার ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-চক্রগুলিকে (চিয়াং কাইশেক, নগো দিয়েম, সীংম্যান রী প্রভৃতির ফ্যাসিষ্ট শাসন স্মরণীয়) মার্কিন উদারতাবাদী গণতন্ত্রীদের প্রতিবাদ সত্বেও ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ট্রুম্যান-আইসেনহাওয়ার-কেনেডির প্রশাসন নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দিয়া আসিতেছে। সেণ্টো ও সিয়াটো সামরিক চুক্তি হইতে সুরু করিয়া জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা পর্যন্ত সমস্ত সন্ধিপত্রের উদ্দেশ্যই হইতেছে কমিউনিজম্ নিরোধ। কারণ, পশ্চিমী জগতে বহু লোকের ধারণা এই যে, এশিয়া (এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকাও) যদি 'কমিউনিষ্টদের খপ্পরে' পড়িয়া যায়, তাহলে ইউরো-মার্কিন শক্তিবর্গের সর্বনাশ হইবে। যেমন, একজন তীক্ষ্ণধী ইংরাজ লেখক ও গ্রন্থকার প্রভৃত বিশ্লেষণপূর্ণ একটি বইতে বলিতেছেন:

"Asia is only one of the battlefields of a word conflict in which the West is fighting for its life. If Asia—and Africa 'go Communist', the chances of survival for these elements of Western life, *reasonable* freedom and a *reasonable* individual stake in one's own destiny, are small. If the present non-Western, non-Communist world can be preserved from subversion or avert attack at least long enough for it to begin to tackle the major economic problems which beset it, there is still a chance that by persuasion and by example the fundamental ideas—the *moral* basis, in fact—of what is called democracy will be tried. If Communist tyranny is once imposed upon the traditional societies of the underdeveloped countries of the world, even that small hope will be shattered."*

অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী সংঘাতের মধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে লড়াই করিতেছে, এশিয়া তারই অন্যতম সংগ্রাম-ভূমি। যদি এশিয়া (এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকা) কমিউনিষ্ট বনিয়া যায়, তবে, পশ্চিমী জীবনের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতা ও নিজের ভাগ্য গড়িয়া তোলার জন্য প্রত্যেকের যে যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ আছে, সেই উপাদানগুলিও আর টিকিয়া

* 'Asia in the Balance'—by Michael Edwardes, Penguin Books

থাকিবে না। বর্তমান অ-কমিউনিষ্ট এবং অ-পশ্চিমী জগৎকে যদি তার বৃহৎ অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে লড়িবার জন্য কমিউনিষ্ট আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া যথেষ্ট দীর্ঘ সময় দিতে পারা যায়, তবে এখনও সেখানে গণতন্ত্রের মৌলিক চিন্তা ও নৈতিক ভিত্তির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিমী জগতের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা এশিয়ার (এবং আফ্রিকার) রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ লইয়া খুব উদ্বিগ্ন। এশিয়াতে পশ্চিমী পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার উপর দণ্ডায়মান বর্তমান গণতন্ত্র বা 'ডেমোক্রাসি'কে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, আবার কি ভাবেই বা পশ্চাদ্‌বর্তী দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি অতিদ্রুত দূর করা যায়, এই উভয় প্রকার সমস্যার সঙ্কটে তাঁরা বিচলিত।

এজন্য আর একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক বলিতেছেন যে, এই পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ('সিস্টেম্') এশিয়াতে আশ্রয় পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহা সাময়িক। কোথাও সেই ব্যবস্থাগুলি শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। কিন্তু আগামী দশকের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা, যখন সত্যিকার উপনিবেশোত্তর যুগের (Post-Colonial era) সুরু হইবে এবং এশিয়ার বৃহত্তম অংশ একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা মানিয়া লইবে। এজন্য কি উপায় খোলা আছে? লেখক বলিতেছেন :—"The Choice is threefold. Asians can opt for Communism and absorption by Eastern Bloc. They can accept capitalist penetration, and develop primitive free enterprise societies, under the protection of Western regional defence pacts. Or they can create independent socialist economies within a political frame-work of non-alignment. It is desirable that Asia should choose the third course, and transform itself into an economically viable *Cordon sanitire* between the two blocs ; I have no doubt, too, that this is the choice most Asians would wish to make themselves. But it is, tragically, the most difficult one, the least likely, in present conditions, to create the self-sustaining, steady economic advance which Asia needs."*

অর্থাৎ সংক্ষেপে—এশিয়ার সামনে তিনটি রাস্তা খোলা আছে : (১) এশিয়া কমিউনিজম গ্রহণ করিতে পারে এবং পূর্ব শিবিরের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে

* ১৯৬২, ২৫শে মে তারিখে নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান, (লণ্ডন) সাপ্তাহিক পত্রে পল জনসন লিখিত এশিয়া সংক্রান্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পারে। (২) পশ্চিমী জগতের সঙ্গে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার চুক্তির দ্বারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যমে স্বাধীন অর্থনৈতিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে কিংবা (৩) জোটনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে পারে। এশিয়ার পক্ষে অবশ্য এই তৃতীয় পন্থাই বাঞ্ছনীয় এবং অধিকাংশ এশীয় রাষ্ট্রও এই ব্যবস্থাই গ্রহণীয় মনে করিতেছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান অবস্থায় ইহা একান্তরূপেই কঠিন, যদিও এশিয়ার পক্ষে ইহা একান্তভাবেই প্রয়োজন ছিল।

অতঃপর এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ততঃ একটি বিষয়ে মিঃ পল জনসন নিশ্চিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়াকে আর কিছুতেই কমিউনিজমের পথে যাইতে দিবে না :

·there is no likelilhood, for the immediate future, that Asian will opt for Communism *or indeed will be permitted to do so.* The most important political fact in Asia is the physical presence of US military power, and Mr. Kenedy is now in process of drawing a firm line against further communist encroachment. The US commitment to maintain a non-communist Vietnam is now absolute, underined by the spectacular increase in American forces there ; to this has now een added a direct military commitment in Thailand. Washington has accepted the neutralization of Laos. But even here (and in Combodia) any attempt to overthrow the existing settlement will invoke direct US intervention. Leaving India aside, only three Asian countries—Indonesia, Burma and Ceylon—now stand outside the Western system of military guarantees ; and all contain powerful elements who would demand (and receive) American assitance in the event of a communist coup."*

অর্থাৎ অবিলম্বেই ভবিষ্যৎ এশিয়ার কমিউনিজম বরণ করিয়া লওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে তেমন কাজ তাকে করিতেই দেওয়া হইবে না। কারণ, বর্তমান এশিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সত্য এই যে, আমেরিকা তার সামরিক শক্তি লইয়া সশরীরে উপস্থিত এবং আর যাহাতে কমিউনিষ্ট অন্যায় প্রবেশ ঘটিতে না পারে তার জন্য মিঃ কেনেডি দৃঢ়তার সহিত একটি লাইন টানিয়া দিতেছেন। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামকে

* পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৭৫২

অ-কমিউনিষ্ট রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, থাইল্যাণ্ডকেও এজন্য সামরিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে রাখা হইয়াছে, লাওসের নিরপেক্ষতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং লাওস ও কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপ করা হইলে আমেরিকা সামরিক শক্তি লইয়া আগাইয়া আসিবে। ভারতবর্ষকে বাদ দিলে আর মাত্র তিনটি রাজ্য পশ্চিমী সামরিক গ্যারেন্টির বাইরে থাকিবে, যথা—সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া। অথচ এই সমস্ত দেশের মধ্যে বেশ শক্তিশালী গোষ্ঠীসমূহ আছে, যারা আকস্মিক কোন কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমেরিকার সাহায্য চাহিবে এবং সেই সাহায্য তারা পাইবে।

এই সমস্ত উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে পাঠকবর্গ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, এশিয়াকে কিংবা অ-কমিউনিষ্ট এশিয়ার বাকী অংশকে (যার মধ্যে ভারতবর্ষ,-ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি যাবতীয় রাজ্য পড়িতেছে) পশ্চিমী শিবিরের দলে ভিড়াইবার জন্য ভবিষ্যতে প্রভূত চেষ্টা হইবে। ফলে, এশিয়াতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘাত সৃষ্টির একান্ত সম্ভাবনা এবং সেই লড়াইয়ের এক প্রান্তে থাকিবে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ এবং অন্য প্রান্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির। অর্থাৎ এশিয়ার দেশগুলি তাদের বর্তমান জীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া যদি দ্রুত উন্নতি লাভের জন্য কোন গতিশীল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও পন্থাকে গ্রহণ করিতে চাহে, তবে উহাকে বাধা দেওয়া হইবে এবং সেই বাধা আসিবার সম্ভাবনা পশ্চিমী মার্কিন সামরিক শক্তির কাছ হইতে।

পশ্চিমী লেখকদের বক্তব্য হইতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এশিয়াকে কি এভাবে বাধা দিয়া রাখা সম্ভব? অবশ্য একথা সত্য যে, বর্তমান এশিয়াতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের প্রচণ্ড সংঘাত সুরু হইয়াছে এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী যখন বলেন যে, পশ্চিমী জগতের লোকেরা আগে অর্থনৈতিক অধিকার পাইয়াছে, তারপর রাজনৈতিক অধিকার; কিন্তু ভারতবর্ষে ও এশিয়াতে ঘটিয়াছে উল্টা—অর্থ-নৈতিক অধিকারের আগেই রাজনৈতিক অধিকার আসিয়া গিয়াছে—তখন নেহরুজী নিশ্চয়ই বর্তমান ইতিহাসের একটি তিক্ত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।

একদিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতি (এবং অভাবনীয় উন্নতি) আর অন্যদিকে বৈষয়িক অধোগতি—এই দুইয়ের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড ফাঁক রহিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে কি ভাবে এবং কতদিনে? এই প্রশ্নের জবাবের উপরেই এশিয়ার

ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জাপানের দৃষ্টান্ত নতুন এশিয়ার খুব কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, জাপান ভৌগোলিক হিসাবে একটি প্রধান এশীয় রাজ্য হইলেও মূল-এশিয়ার ভূখণ্ড হইতে সে অনেক দূরে—মাঝখানে সমূদ্রের ব্যবধান। দ্বিতীয়তঃ তার দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থনীতি, রাজনীতি ও রণনীতি সমস্তই একান্তরূপে পশ্চিমী ছাঁচে ঢালা। তৃতীয়তঃ জাপান নিজেই এশিয়ার বুকে অনেক হামলাবাজি করিয়াছে এবং ঔপনিবেশিক অত্যাচারের কলঙ্ক অর্জন করিয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্রের আশীর্বাদপুষ্ট বর্তমান জাপান প্রাচীন এশিয়া মহাদেশের নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভূখণ্ডে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং বাকী রহিল নয়াচীন ও ভারতবর্ষ (কিংবা কিছুটা পরিমাণে ইন্দোনেশিয়া)। একদিকে নয়াচীনের ভবিষ্যৎ ও অন্যদিকে ভারতবর্ষের পরিণতি—এই দুইয়ের মোট ফলই এশিয়ার ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কারণ, একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, একমাত্র ভারত ও চীনের সম্মিলিত জনসংখ্যাই সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। কিন্তু চীনের সামরিক ও সম্প্রসারণশীল মনোভাব, তার জাতীয় দাম্ভিকতা (যাহা মার্কস্ইজমের একান্ত বিরোধী) এবং ভারতের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ—এই সমস্ত ঘটনা একত্র বিচার করিলে মনে হয় যে. চীন এশিয়ার একটি সুবৃহৎ অংশে দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিবে। সেই অবস্থায় গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ পরিণতির উপরেই এশিয়ার ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে, নিতান্ত অহিংসার পথে কি এশিয়ার ভাগ্য ভবিষ্যৎ রূপ গ্রহণ করিবে?—খুব সম্ভব না। কারণ, গত দুই শত বছর ধরিয়া এশিয়ার অভ্যন্তরে এত গলদ ও আবর্জনা ঢুকিয়াছে যে, এই 'আস্তাবল' সহজে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাফ করা যাইবে না। অন্ততঃ খাদ্য হইতে সুরু করিয়া ভাষা পর্যন্ত যে অজস্র প্রকারের দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক জগতে যে প্রচণ্ড সংঘাত চলিতেছে, তার পটভূমিকায় এশিয়ার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না।

এই সম্পর্কে আর একজন পশ্চিমী লেখক বলিতেছেন :

"The revolutionary situation in Asia is most acute, because of the greater gap between social and scientific progress. Great changes—brought on by the tremendous

effort needed to bridge this gap—will take place. It is difficult to say what will determine these changes, but whatever it is, the changes will not be peaceful. The revolution will be bloody, convulsive, full of suffering and pain."*

অর্থাৎ এশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অত্যন্ত তীব্র। কারণ, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও সামাজিক প্রগতির মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁকের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভূত উদ্যমের দ্বারা এই ফাঁক পূরণের প্রয়োজন হইবে এবং অতি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি কিসের দ্বারা নির্ণীত হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে, যাহার দ্বারাই নির্ণীত হউক না কেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে এই পরিবর্তন ঘটবে না, একথা নিশ্চিত। এই বিপ্লব হইবে রক্তাক্ত, প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত এবং দুর্ভোগ ও বেদনায় পরিপূর্ণ।

নিঃসন্দেহে এই ভবিষ্যদ্বাণী ভীতিপ্রদ। কিন্তু যুগান্তকারী ঐতিহাসিক বিপ্লব কোন শান্তিপূর্ণ বিতার্কিক সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এশিয়ার বর্তমান অসমাপ্ত বিপ্লবের সুরু হইয়াছিল সংঘর্ষে ও রক্তপাতে (গান্ধীজীর অহিংসা সত্ত্বেও)। সুতরাং সেই বিপ্লব সমাপ্তি ও পূর্ণতার যখন পথ ধরিবে, তখন আর একবার অশ্রু ও রক্তপাতের নিশ্চিত সম্ভাবনা। অন্ততঃ ফুলের মালা ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা এশিয়ার সর্বত্র সেই বিপ্লবকে বরণ করা হইবে না। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সংঘাতের সম্ভাবনা আছে।

* 'Asia in the Balance'—by Michael Edwardes

উপসংহার

ইতিহাসের ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণ

চীনের ভারত আক্রমণের দ্বারা আমরা ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছি। যাহা ছিল অভাবনীয় তাহাই একান্ত বাস্তব রুদ্র মূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই আক্রমণের ফলে সারা এশিয়ার ইতিহাস নতুন মোড় লইতে পারে। গভীরতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সূত্রগুলির বিবেচনায় ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়ার যুদ্ধের চেয়েও চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই যুদ্ধ অধিকতর বিপজ্জনক এবং ইহার ফলাফল বহু দূরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ, কোরিয়ার যুদ্ধে ইস্যুগুলি (মূল-প্রশ্নগুলি) জটিল ছিল না। মোটামুটি সেই যুদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট বনাম কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সংগ্রাম। যদিও সেই যুদ্ধ ইউনাইটেড নেশন্সের নামে ও তাঁদের সিদ্ধান্তে পরিচালিত হইতেছিল, তথাপি আসলে দক্ষিণ-কোরিয়ার পক্ষ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সেই যুদ্ধের সর্বপ্রধান কর্ণধার ছিল। অর্থাৎ কোরিয়া-যুদ্ধের রাজ-নৈতিক চেহারাটা পরিষ্কার ছিল এবং মোটামুটি এশিয়া-আফ্রিকার জনমত (অবশ্য সেদিন আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য ছিল) সেই যুদ্ধের বিরোধী ছিল। কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধ অনেক বেশী জটিল এবং ইহার সঙ্গে জড়িত ইস্যুগুলি বহু দূরপ্রসারী পরিণাম লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, প্রথমেই এই যুদ্ধের কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে, যেমন—

১। এই যুদ্ধ কমিউনিস্ট বনাম অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং এই অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্র (অর্থাৎ ভারতবর্ষ, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মত সরকার-বিরোধী পার্টি এবং যেখানে সর্বপ্রথম নির্বাচনের মারফৎ একটি কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা পর্যন্ত গঠিত হইয়াছিল) পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা নীতিতে বিশ্বাসী।

২। এই যুদ্ধ পঞ্চশীলের স্বাক্ষরকারী দুই 'মিত্র' রাষ্ট্রের যুদ্ধ।

৩। এই যুদ্ধ বিশ্বশান্তি সংসদের দুইটি প্রধান 'শান্তিবাদী' সদস্যের মধ্যে যুদ্ধ। (অবশ্য এই সদস্যপদ সম্পূর্ণরূপে বে-সরকারী স্তরে।)

৪। এই যুদ্ধ কমিউনিস্ট বনাম কমিউনিস্টদের যুদ্ধ। অর্থাৎ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি 'সরকারীভাবে' সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা কমিউনিস্ট-চীনকে ভারত-আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন এবং কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রায় সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভাবনীয়। ফলে, এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে গৃহযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে।

৫। এই যুদ্ধ এশীয় বনাম এশীয়বাসীদের যুদ্ধ—যাহা ছিল পরলোকগত মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের বহু-বিতর্কিত নীতি। কোরিয়া যুদ্ধে ডালেসের এই নীতির বিরুদ্ধেই কমিউনিস্ট চীন হাতে-কলমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আজ সেই নয়াচীনই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া ডালেসের 'এশীয় নীতিকে' পূর্ণ মর্যাদা দিল!

ইহার চেয়ে ইতিহাসের চরম বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে?

উপরে চীন-ভারত যুদ্ধের যে প্রধান পাঁচটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল, সেগুলির সঙ্গে জড়িত 'ইস্যু' বা মূল-প্রশ্নগুলি লইয়া একটি প্রকাণ্ড পুস্তক লেখা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাসের ইহা একটি অনন্যসাধারণ এবং বিস্ময়কর ও হতবুদ্ধিকর ঘটনা।

একথা সত্য যে, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সহ ভারত সরকার, নেহরু-সমর্থক জাতীয় কংগ্রেসের বৃহত্তম গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট সহ প্রায় সমস্ত বামপন্থী দল চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণে বিহ্বল ও হতবাক্ হইয়াছেন। কারণ, পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণভাবে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীগণ একথা ভাবিতে পারেন নাই যে; ভারতবর্ষের সঙ্গে যারা পঞ্চশীলের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল এবং মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তিতে যারা আন্তর্জাতিকতার নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত, তারা পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের মত সীমানার প্রশ্নে একেবারে ভারতবর্ষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। ফলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিবাদীরাও বোকা কিম্বা বেকুব বনিয়াছেন। এজন্যই এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল সমগ্র অবস্থা উপলব্ধি করিতে এবং প্রথম বিহ্বলতার ঘোর কাটাইয়া উঠিয়া চীনকে 'আক্রমণকারী' বা 'aggressor' বলিয়া ঘোষণা করিতে। সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এই মেজরিটি সমর্থিত ঘোষণাকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া স্বাগত জানাইয়াছেন এবং জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে বিরাট এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। এই আবেদনে সারা ভারতবর্ষ সাড়া দিয়াছে। তথাপি চীনা-পন্থী বলিয়া অভিহিত কমিউনিস্টদিগকে দেশদ্রোহিতা ও বিভীষণবৃত্তির সন্দেহে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইতেছে। যুদ্ধরত গভর্ণমেন্টের পক্ষে চীনাপন্থীদের বিরুদ্ধে এই দণ্ড প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই।

চীনাপন্থীরা তাঁদের বুদ্ধির দোষেই এবং অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামির ফলেই জব্দ হইতেছেন। এক কথায় তাঁরা নিজেরাই এজন্য দায়ী।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) হইতে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত এই মোট ৭২ দিন গিয়াছে চীন-ভারত সীমান্তের যুদ্ধ। গত ৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বা নেফা অঞ্চলের থাগলা গিরিশিরার দক্ষিণে ঢোলা পোস্টের ভারতীয় রক্ষীদের উপর চীনা সৈন্যদের আক্রমণ হইতে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। তারপর ২০শে অক্টোবর তারিখে প্রভূত সৈন্য ও অস্ত্রাদি সহ চীন পূর্ব ও পশ্চিম অংশে কিম্বা নেফা ও লাডাক অঞ্চলে যুগপৎ আক্রমণ চালায়। এবং ২০শে নভেম্বরের মধ্যে সীমান্তের প্রায় সমস্ত ভারতীয় ঘাঁটি প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা অতিক্রুত জয় করিয়া লয়। তেজপুর হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে তারা বমডিলা পর্যন্ত পৌঁছিয়া ২১শে নভেম্বর তারিখ অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে একতরফা যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করে। কিন্তু চীনাদের তরফ হইতে যুদ্ধবিরতি এবং ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখা' হইতে ২০ কিলোমিটার বা সাড়ে বারো মাইল পিছনে হটিয়া যাওয়ার কয়েকটি চাতুর্যপূর্ণ প্রস্তাব ভারতের নিকট পেশ করা হইয়া থাকিলেও, ভবিষ্যৎ এখনও ভয়াবহ রকমের অগ্নিগর্ভ। কারণ, চীনাদের ২১শে নভেম্বরের প্রস্তাবে যে সমস্ত সর্ত রহিয়াছে, সেগুলির পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতবর্ষ যেমন উহা গ্রহণ করিতে পারে না, তেমনি আমরা ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী লাইনে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য চীনের নিকট যে দাবী জানাইয়াছি, চীন সরকারও তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। সুতরাং পুনরায় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছে।*

যে যুদ্ধ এখন পর্যন্ত একমাত্র সীমান্ত অঞ্চলেই আবদ্ধ তার ফলেই যে পরিমাণ বিভ্রান্তি, বিহ্বলতা ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই যুদ্ধ যদি আরও বিস্তৃতভাবে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন এই জটিলতা কত দূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, আধুনিক ইতিহাসের ইহা একটি অভাবনীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রথম বলি (first casualty) হইতেছে কমিউনিস্টরা। এবং চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের

* অবশ্য ইতিমধ্যে এশিয়া আফ্রিকার ৬টি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—সিংহল, বর্মা, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানার পক্ষ হইতে কলম্বোতে এক সম্মেলন আহুত হইয়াছিল চীন ভারত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। তাঁদের আলোচনার ফলে যে কলম্বো প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের দাবীর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি। এজন্য প্রধান মন্ত্রী নেহরু উহা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চীন একমাত্র 'নীতিগত ভাবে' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। অতএব ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

চিরাচরিত সীমানাই (traditional boundary) ভগ্ন হয় নাই, ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে যে 'ঐতিহ্যগত' (traditional) সীমারেখা ছিল, তাহাও আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কথাটা শুনিতে নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত। কিন্তু গভীর-ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে আজ ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা আর মার্ক্সবাদের "ঐতিহ্যগত সীমানার" মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁরা 'বুর্জোয়া' ও 'ধনতন্ত্রবাদীদের' সঙ্গে হাত মিলাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং কমিউনিস্ট-চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। দৃশ্যটা কি খুব অভিনব এবং ইতিহাসের একটা বিভ্রান্তিকর অধ্যায় নয়?

কিন্তু এই অভিনবত্ব ও বিভ্রান্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী কমিউনিস্ট-চীন এবং তার দাম্ভিক নেতৃবৃন্দ। স্বদেশ আক্রান্ত হইলে তখন পার্টি, এমন কি 'ইডিও-লোজির' (রাজনৈতিক মতাদর্শ) উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। কারণ, তখন মাতৃ-ভূমিকে রক্ষা করা, আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ। কেবল জরুরী নয়—যে কোন পার্টির পক্ষেই ইহা অপরিহার্য। যদি আমার স্বদেশই রক্ষা না পায়, তবে, আমি পার্টি বা পার্টিগত রাজনীতি দিয়া কি করিব? আগে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং শত্রুকে স্বদেশ হইতে বিতাড়ন, তারপর পার্টি বা পার্টি-রাজনীতির স্থান। কারণ, কোন পার্টির পক্ষেই স্বদেশপ্রেমের চেয়ে অন্য কিছু বড় হইতে পারে না এবং এই স্বদেশকে রক্ষার জন্য পার্টি ও মতবাদ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে একত্রে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। সকলের সঙ্গে 'ইউনাইটেড্-ফ্রন্ট' গঠনের প্রয়োজন এই দুঃসময়ে। আক্রান্ত দেশকে রক্ষা করিতে যাঁরা পিছ-পা হইবেন, তাঁরা স্বভাবতই জনসাধারণের কাছে ধিক্কৃত হইবেন।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের ইতিহাস স্মরণে রাখিলে অনেকগুলি দ্বিধা ও সংশয় আমাদের দূর হইবে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি একতরফা ভঙ্গ করিয়া দুর্দান্ত হিটলারী বাহিনী যখন সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্তে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তখন কিন্তু সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ "স্বদেশ রক্ষার" মহৎ ব্রত পালনের জন্যই দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাযুদ্ধের গতিপথে তাঁরা কিন্তু মার্ক্সবাদ ও কমিউনিজমকে রক্ষা করার উপর জোর দেন নাই। নিছক "দেশপ্রেমের" উপর দাঁড়াইয়া সেই যুদ্ধ তাঁরা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা সেই যুদ্ধের নাম দিয়াছিলেন—"Great Patriotic War" বা স্বদেশরক্ষার মহান্ যুদ্ধ। আর মধ্যযুগের সমস্ত বীর যোদ্ধাকে (কমিউনিস্ট

পরিভাষায় যারা একদা অপাংক্তেয় ছিল) তাঁরা স্মরণ করিলেন জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিবার জন্য। অর্থাৎ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে তখন পার্টি ও পার্টি-রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিতে হইয়াছিল স্বদেশরক্ষার মহান্ যুদ্ধে দেশপ্রেমের বন্যা আনিবার জন্য।

কেবল তাহাই নহে। পাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ মতাদর্শ ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের জন্য মিত্রপক্ষের (বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি) মনে কোন সন্দেহ সঙ্কোচ বা অবিশ্বাস দেখা দেয়, এজন্য সোভিয়েট নায়ক মার্শাল স্ট্যালিন "কোমিণ্টার্ণ" বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সঙ্ঘ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া দেন। নিঃসন্দেহে ইহা দুঃসাহসের কার্য ছিল।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে হাত বাড়াইতে হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য। তিন বছর ধরিয়া কর্জ ও ইজারা চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকার কাছ হইতে লক্ষ লক্ষ নয়, অজস্র কোটি টাকার সাহায্য পাইয়াছিলেন—ট্যাঙ্ক, বোমারু-বিমান হইতে সুরু করিয়া জুতা ও খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত। 'মার্কিন গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' হইতে সেদিন অপরিমিত সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে। কিন্তু কই রাশিয়ার কমিউনিজম আর আমেরিকার ক্যাপিটালিজম তো এই সাহায্যের পথে দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইল না? সাম্যবাদী সোভিয়েট সরকার তো দুনিয়ার ধনতন্ত্রবাদীদের অধিনায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হইতে দরাজ হাতে সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের সঙ্কটে স্বদেশকে রক্ষার জন্য পার্টি ও পার্টি-রাজনীতির উর্ধ্বে না উঠিয়া উপায় নাই। কারণ, তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি এবং রাষ্ট্র না টিকিলে পার্টি টিকিবে কি ভাবে? দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের ইতিহাস হইতে আমরা কতকগুলি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি এবং বর্তমান চীন-ভারত সংঘর্ষের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারি যে, গত ২০শে অক্টোবর চীন কর্তৃক নেফা ও লাডাক উভয় রণাঙ্গনে যুগপৎ ব্যাপক আক্রমণ এবং ভারতের সীমানা পার হইয়া ভিতরের দিকে অগ্রগতির পর (যাহা নিঃসন্দেহে পররাজ্য-আক্রমণ) পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির উচিত ছিল সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীনের এই নগ্ন আক্রমণের প্রতিবাদে স্বদেশরক্ষার জন্য মহৎ সঙ্কল্প ঘোষণা করা। বিশেষতঃ সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যত্র যে সমস্ত কমিউনিস্ট ইতস্ততঃ করিয়াছেন,

সরল ভাবে যাঁরা এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে দাঁড়ান নাই, তাঁরা মূলগত ভাবেই ভ্রান্ত। কারণ, তাঁরা চীনকেও বোঝেন নাই, স্বদেশকেও চিনেন নাই।

যদি বর্তমান কমিউনিস্ট চীনকে বিচারের জন্য কোন আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা সম্ভব হইত, তবে, চীনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উত্থাপন করিতে পারা যাইত ঃ

১। পররাজ্য-আক্রমণ ও পররাজ্য-গ্রাস।

২। আন্তর্জাতিক আইন ও আচরণবিধি লঙ্ঘন।

৩। বন্ধুতার ছদ্মবেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

৪। বিশ্বাসভঙ্গ পূর্বক হঠাৎ আক্রমণ এবং

৫। চীন কর্তৃক ভারত-আক্রমণের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর আঘাত।

এই শেষোক্ত আঘাতের রাজনৈতিক জের পৃথিবীর সর্বত্র অনুভূত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ সহ সারা এশিয়া-আফ্রিকাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হইতেছে। এমন কি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শিবিরে এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের ভিত্তিতে পর্যন্ত আজ গভীর ফাটল ধরিয়াছে। ইতালী, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভকিয়া পূর্ব-জার্মানী প্রভৃতি অর্থাৎ ইউ-রোপের প্রায় সমস্ত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কমিউনিস্ট-চীনকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার নীতি ও মতের প্রতি সমর্থন জানাইতেছে। চীন-ভারত যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া এখনও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক, কারিগরি, ও সামরিক বিমান সংক্রান্ত সাহায্য দিতেছেন। আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, একমাত্র আল-বেনিয়া, উত্তর-কোরিয়া এবং উত্তর-ভিয়েৎনাম ছাড়া আর কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রই চীন-ভারত সংঘর্ষে চীনের প্রতি সমর্থন জানায় নাই। ইউরোপের সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি হইতেছে ইতালীয় পার্টি এবং তাঁরা প্রকাশ্য সম্মেলনে চীন কর্তৃক ভারত-আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন। এত দিন পরে চীনের প্রতিনিধিও প্রকাশ্য সম্মেলনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "কতকগুলি ব্যাপারে" অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতভেদ আছে।

এদিকে এশিয়া-আফ্রিকা ও আরব রাজ্যগুলিতে, এমন কি লাতিন-আমেরিকাতেও বিশেষ কোন দেশ চীনের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। বরং অধিকাংশ দেশ হইতেই চীনের এই হঠকারিতা ও ভারতের মত শান্তিপ্রিয়

রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য নিন্দা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, সারা পশ্চিমী জগৎ ভারতবর্ষের পক্ষে এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁরা সমস্ত প্রকার সামরিক সাহায্য দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য চীন যেন 'একঘরে' হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন এমন হইল? ইতিপূর্বে উত্থাপিত পাঁচটি অভিযোগের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে কেন পৃথিবীর অধিকাংশ জনমত চীনের বিরুদ্ধে গিয়াছে। কারণ, চীন ভারতবর্ষের সরল বিশ্বাস ও বন্ধুতার সুযোগ লইয়া এই জঘন্য আক্রমণে অবতীর্ণ হইয়াছে।

গত দশ বছরের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৫০-৫১ সালে চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর হইতে পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা অনুসৃত হইয়াছে। তিব্বত দখলের সময় ভারতবর্ষ চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল বটে, কিন্তু নানা কারণে সেই প্রতিবাদ জোরালো ছিল না। তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার তখন হইতে নষ্ট হইতে থাকে। তিব্বতের যে সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য ছিল, তার প্রমাণ এই যে, চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর ১৯৫১ সালের ২৩শে মে তারিখ ১৭ দফা সর্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র দলাই লামার গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চীন সরকারের স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। আইনতঃ তিব্বতের যদি পৃথক সত্তা ও স্বাধিকার না থাকিয়া থাকে, তবে, চীন সরকারকে এভাবে চুক্তিপত্র (এবং তাহাও সর্ত সম্বলিত) স্বাক্ষর করিতে হইবে কেন? ভারতবর্ষের কোন কেন্দ্রীয় সরকারকে কি তার কোন অঙ্গরাজ্য শাসনের জন্য সেই রাজ্যের প্রধান শাসকের সঙ্গে এই ধরণের আইনগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হয়? সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯৫৯ সালে তিব্বতে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং দলাই লামাকে কেন্দ্র করিয়া তিব্বতের যে শাসকমণ্ডলী (খাম্পা উপজাতীয়গণ যে বিদ্রোহের প্রধান বাহক ছিল) তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়াছিলেন, তার মূল কারণ চীন কর্তৃক বলপূর্বক তিব্বতের উপর দখলদারি বিস্তার এবং তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য লোপ।

১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তিব্বতের উপর ভারতবর্ষের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ উপলক্ষে যে পঞ্চশীলের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং যাহা সেদিনের এশিয়া মহাদেশে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল, এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, সেই চুক্তি-স্বাক্ষর ছিল চীনাদের সর্ব্বাপেক্ষা চতুরতাপূর্ণ কূটনৈতিক চাল। কারণ, আগে তিব্বত দখল, পরে তিব্বত সম্পর্কে ভারতের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করাইবার চুক্তিতে

স্বাক্ষর এবং তারপর ১৯৫৯ সালে বিদ্রোহ দমনের নাম করিয়া সম্পূর্ণভাবে তিব্বতকে গ্রাস এবং তারপর ভারতের হিমালয়-সীমান্তে ৫০ হাজার বর্গমাইল ভূমি দাবী করিয়া নূতন নূতন মানচিত্র তৈয়ার করা এবং সর্বশেষ ভারত-আক্রমণ —এই সমস্তই পর পর পরিকল্পনাবদ্ধ একটি সাজানো চক্রান্তের মত মনে হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষ অত্যন্ত সরলভাবে ও অকপটচিত্তে চীনের সঙ্গে বন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়াছিল এবং পঞ্চশীলের মহৎ আদর্শকে স্বীকার করিয়া লইয়া "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" ধ্বনিতে দুই দেশের আকাশ মুখরিত করিয়াছিল। আজ উহা কত অসত্য এবং কত হাস্যকর বলিয়া মনে হইতেছে!

আজ মনে হইতেছে আমরা অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুরা একটু বেশী আদর্শবাদী এবং অতিরিক্ত সরল বিশ্বাসী। অতীতেও ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈদেশিক আগন্তুকেরা ভারতীয়দের আতিথ্য, সরল বিশ্বাস ও আদর্শবাদের সুযোগ লইয়া শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। চীনের বেলাও আমাদের সেই মারাত্মক সরল বিশ্বাসের ভুল প্রমাণিত হইল—যে ভুলের মাশুল দিতে হইল নেফায় ও লাডাকে। ভারতবর্ষের সহিত বন্ধুতার আবরণে চীন ১৯৫৪ সালের পর হইতে তিব্বত অঞ্চলে সামরিক প্রস্তুতি সুরু করিয়াছিল। ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রচুর শ্রমশক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটাইয়া আকসাই-চীন নামক যে সামরিক সড়কটি তৈয়ার করা হইয়াছে (এবং যাহা অধুনা খ্যাতি লাভ করিয়ছে) তাহা সিন্‌কিয়াংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। তিব্বতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকেও সামরিক পরিবহনের উপযোগী কয়েকটি সড়ক তৈয়ারির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদিকে নেপাল-তিব্বত বা কাঠমাণ্ডু ও লাসার মধ্যে সড়ক তৈয়ারির উদ্যম চলিতেছে। আগে এই সমস্ত সংবাদকে হয় আমরা তেমন বিশ্বাস করি নাই, কিম্বা ওগুলির তেমন কোন গুরুত্ব দিই নাই। কিন্তু তিব্বত চীনের পদানত হইবার পর ভারতবর্ষের যে বিপদ দেখা দিবে, সেই সম্পর্কে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে পরলোকগত রাজনৈতিক দার্শনিক এম, এন, রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ চীন ও তিব্বতের দিক হইতে বিপদে পড়িবে এবং নেহরু তাঁর নিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা রক্ষা পাইবেন কিনা সন্দেহ। বর্তমান লেখক ১৯৫৭ সালের জুন মাসে যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন নিউইয়র্কে সর্দার জে, জে, সিংয়ের গৃহে একটি ডিনার-পার্টিতে বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক মিঃ লুই ফিসার (সেদিনের পার্টিতে কয়েকজন খ্যাতনামা আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন) তিব্বতে চীনের সামরিক প্রস্তুতি

সম্পর্কে ভারতবর্ষ কোন খবর রাখে কিঁনা, সেকথা লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই সামরিক প্রস্তুতির সম্ভাব্য লক্ষ্য ভারতবর্ষ। বলা বাহুল্য যে, এই সংবাদের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি নাই—যদিও চমকিত হইয়াছিলাম। এবং 'যুগান্তরে'র সহকর্মীদের নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখও করিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত সরল বিশ্বাস ও মানবিক আদর্শবাদের দ্বারা অভিভূত ছিলাম। কারণ, আমরা পৃথিবীতে একটি নূতন যুগ ও নূতন সভ্যতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—যে যুগে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা পরাধীনতা, শোষণ ও যুদ্ধের অবসান হইবে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সমান অধিকাব, ন্যায়বিচার, সাম্য এবং মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহু ভারতবাসীর চিত্তে এই সরল বিশ্বাস ও স্বপ্ন ছিল। আজ কমিউনিস্ট চীন সেই আদর্শ, বিশ্বাস ও স্বপ্নের উপর অত্যন্ত কর্কশ হাতুড়ির আঘাত হানিয়াছে। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে আমাদেব প্রধানমন্ত্রীর উদার ও প্রগতিবাদের নীতি ও আদর্শের উপর পর্য্যন্ত চৌ এন-লাই নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়াছে। যে জওহরলাল নেহরু চীনের জন্য গত ত্রিশ দশক হইতে এত কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, গত কয়েক বছর যাবৎ সেই উদারপ্রাণ মহৎ আদর্শে বিশ্বাসী এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যোদ্ধাকে "আমেরিকার দালাল" বলিয়া কুৎসিৎ গালাগালি দেওয়া হইতেছে। গত তিন বছর ধবিয়া পিকিংয়ের "পিপ্‌লস্‌ ডেইলী" এবং পিকিং রেডিও এই প্রকার কুৎসিৎ ও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারকার্য করিতেছে।

কমিউনিস্ট চীনের এই মানসিক অধঃপতন ও আক্রমণাত্মক আঘাত ভারতবর্ষ ও এশিয়ার সমাজ মনস্তত্ত্বে ওলট-পালট ঘটাইয়া দিয়াছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শ আজ কোণঠাসা হইয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বাত্মক অভিযানে প্রগতিশীলতা চাপা পড়িয়াছে এবং জনগণের নিকট যারা ছিল অবাঞ্ছিত হঠাৎ তারা দেশপ্রেমেব মুখোস পরিয়া সভাক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য স্বরু করিয়া দিয়াছে। পণ্ডিত নেহরুর জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বাতিল করিবার জন্য সভায় ও সংবাদপত্রে চীৎকার স্বরু হইয়াছে। ঘড়ির কাঁটা এভাবে পিছনে ঘুরিবার 'স্বর্ণ সুযোগ' সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে সাম্যবাদী চীন! ইতিহাসের ইহা এক মর্মান্তিক বিদ্রূপ। এবং এই বিদ্রূপ সর্বাত্মক যুদ্ধের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। কারণ, দৈহিক মৃত্যুর চেয়েও মানসিক মৃত্যু সময় সময় অধিকতর ভয়াবহ। সুতরাং ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে এবং কাঁটাও ঘুরিতেছে—রক্তের দিকে, অশ্রুর দিকে, অন্ধকারের দিকে।

২১শে নভেম্বর তারিখ চীন অকস্মাৎ এককভাবে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

দিয়াছে, তার সর্তগুলি গোলকধাঁধাঁয় পূর্ণ এবং কূটবুদ্ধির ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। ছলনায় ও চাতুর্যনীতিতে চীন যে কত ওস্তাদ, তাহা বার বার প্রমাণিত হইতেছে। বর্তমান আকারে চীনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সীমান্ত সম্পর্কে যদি কোন সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না ঘটে, তবে, আবার আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ ঘটিবে (যদি কোন তৃতীয় পক্ষ ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ না করেন) এবং তার পরিণতিতে ক্রমশঃ ব্যাপক ও সর্বাত্মক যুদ্ধে ভারতবর্ষ জড়াইয়া পড়িতে পারে। এমন কি তৃতীয়-মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। কারণ, লর্ড রাসেলের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ (অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও চীনের সম্মিলিত জন-সংখ্যা) যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে বাকী মানুষেরা নিশ্চয়ই উদাসীন থাকিতে পারিবে না। এবং এক দিক হইতে আমেরিকা ও অন্য দিক হইতে সোভিয়েট রাশিয়াও পারমাণবিক হাতিয়ার লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিবে। অবশ্য ইহা হইতেছে পৃথিবীর ও মনুষ্য জাতির চরম পরিণতির কথা। কিন্তু শুনিয়াছি মাওসে-তুং নাকি এটম্ বোমাকেও ভয় করেন না। কারণ, তাঁর মতে চীনের ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে যদি ২০ কোটিও বাঁচিয়া থাকে (পার-মাণবিক যুদ্ধের পর) তবে, এই জনসংখ্যাই নাকি সারা পৃথিবীর বিধ্বস্ত শ্মশানে কমিউনিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট!

আমরা এতটা বীরপুরুষ নই। সারা পৃথিবীর ধ্বংসের বিনিময়ে আমরা কমিউনিজম কেন, কোন 'ইজম'ই চাই না। কিন্তু বর্তমান চীনের মানসিকতা বুঝিবার পক্ষে এই সমস্ত মন্তব্য স্মরণীয়। তবে, ইতিহাসের একটা শিক্ষার দিক এই যে, বর্বরতা কিছুকালের জন্য জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত সভ্যতারই বিজয়কেতন উড়িয়া থাকে। যে পক্ষে ন্যায়ধর্ম, সেই পক্ষ জয়ী হইবেই—এই বিশ্বাস লইয়া আমাদের দেশের জনগণের উচিত শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে আমরা এশিয়ার ইতিহাসের এক [illegible]ত্মক সন্ধিক্ষণে পৌছিয়াছি এবং এই সন্ধিক্ষণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে গভীর ওলট-পালট ঘটাইয়া দিতে পারে।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৬২